অস্তি ভাগীরথী তীরে

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

স্বর্গীয় পিতৃদেব সত্যরঞ্জন গুপ্ত শর্মণের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থখানি পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল

অস্তি ভাগীরথী তীরে

॥ কথামুখ ॥

সুস্মিতা,

সুন্দর ঈষৎ হাস্যযুক্তা সত্যিই তোমার হাসিটি, সরু রক্তাভ চিক্কন ওষ্ঠ-প্রান্তের সুন্দর হাসিটি দেখছি আমার চোখের সামনে। কিন্তু তোমার ঐ অনিন্দ্যসুন্দর হাসি যা সত্যিই একদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল অথচ যে কথা কোনদিন কাউকে জানতে দিইনি, অতি সংগোপনে নিজের হৃদয়-নিভৃতে একান্ত আপনার করে রেখেছিলাম, সেই সুন্দর ঈষৎ হাস্যযুক্ত চিক্কন ওষ্ঠ যদি আজ তোমার ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠে! সে ক্ষতির বোঝা আমি বইবো কেমন করে বলতে পারো?

না, না—

কলমটা যেন হঠাৎ ঐখানে এসে থচ্ করে থেমে গেল বিভূতির হাতের।

অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা প্রচণ্ড একটা ঘৃণায়, নিজের উপরে নিজের একটা অপরিসীম ধিক্কারে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে দলে মুচড়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিভূতি।

শুধু আজকের রাতই নয়, এখানে আসা অবধি গত আট মাস ধরে রাতের পর রাত অমনি করে বিভূতি একটার পর একটা চিঠি লেখে, তার পর ঠিক অমনি করেই কয়েক ছত্র লিখে দলে মুচড়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবং যত রাত বাড়তে থাকে অসহ্য একটা বিষাক্ত যন্ত্রণায় যেন মাথার শিরা-গুলো দপ দপ করতে থাকে। মস্তিষ্কের সংখ্যাতীত স্নায়ু-কোষে বিষাক্ত সেই যন্ত্রণাটা ঢেউ তুলে তুলে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘরের খোলা কাচের জানালাপথে শীত-রাত্রের হিমকণাবাহী একটা হাওয়ার স্রোত বাইরের অন্ধকার-সমুদ্র সাঁতরে সাঁতরে ঘরটার মধ্যে আনাগোনা করতে থাকে।

আর একাকী কক্ষের মধ্যে বিভূতির সমস্ত অনুভূতিকে মন্থন করে বিনিদ্র রাত্রির মন্থর প্রহরগুলো তাকে যেন চারপাশ থেকে পিষে পিষে অস্থির উন্মাদ করে তুলতে থাকে। এবং একসময় উন্মাদ অস্থিরতার মধ্যেই রাত্রির শেষ প্রহর উত্তীর্ণ হয়।

ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায় ডাক্তার সান্যাল আসেন তাঁর নিত্য পরিক্রমায় বিভূতির ঘরে।

সেই এক প্রশ্ন, কেমন আছেন বিভূতিবাবু?

সারারাত্রির বিনিদ্র রক্তচক্ষু মেলে তাকায় বিভূতি ডাঃ সান্যালের দিকে। গুলি খাওয়া আহত একটা বাঘের মতই যেন নিষ্ঠুর একটা হিংস্রতায় বিভূতির মুখখানা থম থম করতে থাকে। মনে হয় এখুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাক্তার

সান্যালের টুঁটিটা টিপে ধরবে বিভূতি। কিন্তু ডাক্তার সান্যাল জানেন বিভূতি তা করবে না।

বিভূতিও তা করে না।

তার পর একসময় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের রৌদ্র-ঝলকিত আকাশটার দিকে তাকায় বিভূতি খোলা জানালাপথে। আরেকটা রাত্রি পার হয়ে নতুন দিন ঃ নতুন আলো ঃ নতুন সূর্য ঃ জবাকুসুম সংকাশ—

কিন্তু কি হবে বলে? ও তো বিশ্বাস করবে না তার কথা। কেউ বিশ্বাস করেনি—উনিও করবেন না।

অথচ বিভূতি তার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে অনুভব করে সেই নিষ্ঠুর সত্যকে। রায়বংশের রক্তের বিষ তারও দেহে সুনিশ্চিতভাবে সংক্রামিত হয়েছে।

রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়েনি মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই আছে, নইলে এমন করে ক্রমশ তার মধ্যে এমনি উন্মাদের সম্ভাবনাটা দেখা দিচ্ছে কি করে?

ধরতে পারেনি, কেউ ধরতে পারেনি। কলকাতার ডাক্তার নীলরতন সরকার, এখানকার ডাক্তার কর্নেল সেন, কেউ না।

রাঁচির মেণ্টাল এসাইলামের বিশেষজ্ঞ কর্নেল সেন। তাঁর এ্যাসিসটেণ্ট্ ডাক্তার সান্যাল চলে যাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক রাউণ্ডে আসেন।

আজও এলেন।

বাঃ, আজ তো আপনাকে বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে—

সুস্থ?

হ্যাঁ—

কিন্তু এগুলো দেখুন তো একবার চোখ দিয়ে—দুটো হাত প্রসারিত করে ধরে গভীর উত্তেজনায় বিভূতি কর্নেল সেনের চোখের সামনে। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন?

কই আজ তো তেমন কিছু—

অন্ধ! আপনি অন্ধ—

অন্ধ!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি বলছি আপনি অন্ধ। আমি দেখতে পারছি আর আপনি দেখতে পারছেন না! এই দেখুন, ভাল করে চেয়ে দেখুন, সর্বাঙ্গে আমার কি কুৎসিত দগদগে ঘা। আর রাত্রি হলেই পচা ঘাগুলো থেকে একরকম কুৎসিত সাদা সাদা পোকা বের হয়ে আমার সারা গায়ে কিলবিল করে হেঁটে বেড়াতে থাকে। Believe me! আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলছি না।

মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ কর্নেল সেন বিভূতির দিকে, তারপর ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই তো আজ আপনাকে খাওয়ার জন্য আর গায়ে লাগাবার জন্য ঔষধ দিয়ে

গেলাম। দেখবেন আজকের এই নতুন ঔষধে নিশ্চয়ই কালকের মধ্যেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন—কর্নেল সেন, স্নায়ুরোগের বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সান্ত্বনার সুরে কথাগুলো বললেন বিভূতিকে।

সত্যি, সত্যি বলছেন কর্নেল সেন? সব সেরে যাবে? সত্যিই আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠবো?

নিশ্চয়ই।

না, না—মিথ্যে আপনি আমাকে স্তোক দিচ্ছেন কর্নেল সেন, আমি জানি এ রোগ ইহজীবনে আর আমার ভাল হবার নয়। হতে পারে না, হতে পারে না—এ যে বংশানুক্রমিক ব্যাধি। Generation to generation এ রোগের বীজ রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে, আমি যে বইয়ে পড়েছি!

হলেই বা, উপযুক্ত চিকিৎসায় তা সেরেও যায় আর যাচ্ছেও।

না, না, আপনি সত্যি কথা বলছেন না। তাই যদি হবে তো এত চিকিৎসা আপনারা করলেন, কই কিছুই তো হলো না! গা-ভর্তি আমার পচা দগদগে ঘা, ক্রমশই চোখের দৃষ্টি আবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, হাত-পা আমার সব অবশ হয়ে আসছে—

ও কিছু না। ও আপনার মনের একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র।

ভ্রান্ত ধারণা! না, না—কর্নেল সেন, এ যে সুমন্তনারায়ণ, কন্দর্প-নারায়ণের ব্যাধি। কেউ—কেউ রেহাই পায় নি এ থেকে, জানি আমিও পাব না। জানেন না, আপনি জানেন না তাদের রক্ত যে আমার শরীরেও আছে—।

হবেন, নিশ্চয়ই আপনি আরোগ্য হবেন।

আরোগ্য হবে! দেখছেন, এই হাতের পাতাটা আর আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন। কি রকম লাল হয়ে ফুলে উঠেছে দেখছেন—

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে এবারে কর্নেল সেন বলেন, সুস্মিতা দেবী আপনার সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছেন বিভূতিবাবু, চলুন তাঁর সঙ্গে দেখা—

না না, কারও সঙ্গে আমি দেখা করতে পারবো না, কারও সঙ্গে না।

কেন দেখা করবেন না? চলুন—

বুঝতে পারছেন না কেন, এই সর্বাঙ্গে বিষাক্ত ঘা—কেউ এ অবস্থায় কারও সঙ্গে কি দেখা করতে পারে? না, না—কারও সঙ্গে আমি দেখা করতে পারব না। কারও সঙ্গে না।

ঘরের জানালার শিক শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে বিভূতি।

অফিসে সুস্মিতা বসে ছিল।

কর্নেল সেন এসে ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কি হলো কর্নেল সেন?

আই অ্যাম সরি মিস্ ব্যানার্জি, কিছুতেই তাঁকে আনা গেল না।

আমি কি একবার তার ঘরে যেতে পারি?

না মিস্ ব্যানার্জি, তাতে করে রোগীর একসাইটমেন্ট আরও বেড়ে যাবে।

ফলে হয়তো রোগীর ক্ষতি হতে পারে।

ওর কি তাহলে ভাল হবার আর কোন আশাই নেই কর্নেল সেন ?

চিকিৎসক আমরা, বুঝতেই তো পারছেন, আশা কখনও আমরা ছাড়ি না। তাছাড়া যে রোগের আতঙ্কে উনি সিঁটিয়ে আছেন সে রোগ ওঁর দেহে নেই তাও তো আপনি জানেন।

তবে এ রোগ হলো কেন ওর ? এই ধরনের বিকৃতি ?

এটা এক প্রকার হ্যালিউসিনেশন। রায়বংশের ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে সর্বদা সেইসব চিন্তা করে ওঁর দুর্বল মস্তিষ্কে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে। ভাল উনি হয়ে যাবেন একদিন—

কিন্তু দেখতে দেখতে দীর্ঘ আট মাস তো হয়ে গেল !

অনেক ক্ষেত্রে এ রোগ সারতে আরও দীর্ঘ সময় লাগে মিস্ ব্যানার্জি। এমন কি দু-তিন বছরও লেগে যায়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে নার্ভ ঠিক রেখে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর উপায়ই নেই।

এরপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো সুস্মিতা। তারপর এক সময় মৃদু কণ্ঠে বললে, দূর থেকে তাকে একটিবার দেখতে পারি কর্নেল সেন ?

আমার মনে হয় সে চেষ্টা আপনার না করাই বোধ হয় ভালো মিস্ ব্যানার্জি।

কেন ? একথা বলছেন কেন ?

আপনাকে তো বলেছি আগেই, ঐ রোগের hullucination ছাড়া otherwise বিভূতিবাবু absolutely normal—সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে পেলেও হয়তো—

বুঝেছি। তাহলে থাক।

আমি আপনার দুঃখটা বুঝতে পারছি মিস্ ব্যানার্জি, কিন্তু কি করবেন বলুন ! তাঁর এই hallucination develop করবার মূলে যেমন রায়বাড়ির ইতিহাসটা আছে, তেমনি আপনার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসাটাও আছে। উনি সত্যিই আপনাকে ভালবাসেন আর সেই জন্যই বিশেষ করে আপনার সম্পর্কে তাঁর এত আতঙ্ক।

অতঃপর বিদায় নেওয়া ছাড়া উপায় কি !

উঠতেই হলো সুস্মিতাকে। বললে, তাহলে আমি আসি কর্নেল সেন।

আসুন।

শ্লথ ক্লান্ত পদবিক্ষেপে রাঁচির পাগলা হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এলো সুস্মিতা গেট অতিক্রম করে।

মাসে একবার করে সুস্মিতা আসে আর সংবাদ নিয়ে যায়। এবং প্রতিবারেই সেই হতাশা ও সেই বেদনা সে সঙ্গে করে ফিরে যায় কলকাতায়। আজও তেমনি হতাশা ও বেদনা নিয়েই বের হয়ে এলো।

গেটের অনতিদূরে ট্যাক্সিটা রাস্তার ধারে ওর অপেক্ষায় তখনও দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সিতে উঠে বসল সুস্মিতা।

কোথায় যাব ? ড্রাইভার শুধায়।
স্টেশনেই চলো।

সেই রাত্রেই মধুড়ি জংশন থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে বসল সুস্মিতা। রাতের অন্ধকারে গর্জন করতে করতে একটানা ছুটে চলে লৌহদানবটা। ঘট্ ঘট্ ঘটাং, ঘট্ ঘট্ ঘটাং—একঘেয়ে শব্দ।

চলমান গাড়ির খোলা জানালাপথে বাইরের অন্ধকার প্রকৃতির দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকে সুস্মিতা একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে বিনিদ্র।

কে জানে বিভূতি আর কোন দিন সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা।

দেখতে দেখতে দীর্ঘ আটটা মাস কেটে গেল। আজও সেই একই অবস্থা।

সত্যিই কি এ রায়বাড়ির আদিপুরুষ সুমন্তনারায়ণের ব্যভিচারের ঋণ-শোধ! তাঁর কদাচার ও দুষ্কৃতির ঋণশোধ বিভূতিকেও করতে হচ্ছে—যেহেতু সুমন্তনারায়ণের রক্ত যতই ক্ষীণ হোক আজও ওর দেহে প্রবাহিত!

কিন্তু ডাক্তার তো স্পষ্টই বলছে, বিভূতির রক্তে প্রকৃতপক্ষে তেমন মারাত্মক কোন দোষই নেই। বার বার পরীক্ষা করেও গত আট মাসে কোন দোষ পাওয়া যায় নি। সেই প্রথম দিকে দোষ যা পেয়েছিল রক্ত পরীক্ষা করে, তাও আজ আর নেই।

রক্ত-পরীক্ষার ভাসরমান টেস্টে নাকি তিনের দশ পজেটিভ্ পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই রেজাল্ট জানবার পর থেকেই বিভূতির আজকের এই মানসিক ব্যাধিটা দেখা দিয়েছে।

অথচ আশ্চর্য, একমাত্র ঐ রোগের দুঃস্বপ্ন ব্যতীত সে নাকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, নরম্যাল। অতবড় একটা ব্রিলিয়েণ্ট ক্যারিয়ার সহসা আজ কি ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

ডাক্তার আশ্বাস দিলেও সুস্মিতা কেন যেন মনের মধ্যে কোথায়ও আশ্বাস পায় না। কেন যেন তার মন বলে, বিভূতি আর কোন দিনই ভালো হবে না। কোন দিনই না। সুস্মিতার দুই চক্ষুর কোল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভূতি আর ভালো হবে না—বিভূতি আর ভালো হবে না।

হঠাৎ নজরে পড়ে হাতেধরা লাল মলাটে বাঁধানো মোটা খাতাটা। অন্য-মনস্কের মতই একসময় চোখের সামনে বাঁধানো খাতাটার মলাটটা উল্টে প্রথম পৃষ্ঠায় তাকালো সুস্মিতা।

অভিশপ্ত রায়বাড়ি। বড় বড় অক্ষরে লেখা। তার পরই শুরু হয়েছে বিভূতির নিজের হাতের লেখায় সেই অভিশপ্ত রায়বাড়ির ইতিহাস।

কিন্তু শেষ হয়নি—

রায়বাড়ি। অভিশপ্ত রায়বাড়ির ইতিহাস। সুমন্তনারায়ণের ইতিবৃত্ত।

॥ ১ ॥

হার্মাদ

ফিরিঙ্গী কোথায় বহে কর্ণধার
রাত্রিদিন বহে যায় হায় হার্মাদের ভার।

॥ ১ ॥

বিভূতির যেটুকু মনে পড়ে তার জ্ঞান হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত—কিছু কিছু তার অস্পষ্ট আবছা আবছা হলেও কিছুটা আবার তার এত স্পষ্ট যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনের পাতায় তা বুঝি জ্বলজ্বল করবে। এবং শেষের দিকের অস্পষ্ট যা তার বেশিরভাগই শোনা ঐ সদু ঠাকরুন—সৌদামিনী দেবীর মুখেই, আর কিছুটা তাঁর শৈশবের টুকরো টুকরো স্মৃতি। বাদবাকী সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত এবং সদু ঠাকরুনেরও কিছুটা দেখা নিজের চোখে এবং অনেক কিছু শোনা শৈশবে তাঁদের কত্তামার মুখ থেকে।

কত্তামা, অতি বৃদ্ধা রাধারাণী দেবী নাকি বেঁচেছিলেন পঁচাশী বছর পর্যন্ত। থুরথুরে বুড়ী, দিনে-রাতে চোখে ঘুম নেই, রায়বাড়ির নীচের তলায় দক্ষিণের বড় ঘরটার মধ্যে বিরাট পালঙ্কটার উপরে বসে বসে আফিমের নেশায় ঝিমুতেন। সন্ধ্যার দিকে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই পালঙ্কের সামনে প্রদীপের আলোয় ঘিরে বসে গল্প শুনতো।

রাধারাণী বলতেন গল্প নয়, ঐ রায়বাড়িরই ইতিহাস।

সেই কাহিনীই আবার শোনা যেতো সৌদামিনী, সদু ঠাকরুনের মুখে।

জ্ঞান হবার পর থেকে বিভূতির স্পষ্ট যেটা মনে পড়ে, সেটা সেই অতীতের সুবিশাল রায়-ভবনের দশমাংশের একাংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। রায়েদের পূর্বপুরুষ সুমন্তনারায়ণ রায় নাকি ভাগীরথীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে তখনকার মুকশুদাবাদ অর্থাৎ কিনা রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন একদা।

সেটা বর্গীর হাঙ্গামার যুগ।

বিভূতির নিজের চোখে দেখা যেটুকু, সেটা অবিশ্যি সেই অতীতের সুমন্ত রায়েরই তৈরী রায়-ভবনের জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ শেষাংশ। চারিদিকে ভগ্ন জীর্ণ স্তূপ এবং তারই মধ্যে মধ্যে তখনো কয়েকটি পরিবার কোনমতে মাথা গুঁজে আছে।

সাক্ষাৎ সুমন্তনারায়ণ রায়ের কেউ নয় সত্যিকারের বলতে গেলে তারা। দৌহিত্রী সৌদামিনীর মেয়ের সন্তানদের বংশ আর সুমন্তনারায়ণের জ্ঞাতি

ভ্রাতার বংশধরেরা, যারা পরবর্তীকালে উঠে এসে ধনোপার্জন জুড়ে রাখিয়ে বসেছিল, সেই রাবণের গোষ্ঠী।

এবং তার মধ্যে সর্বাধিক পুরাতন ও জীর্ণ ভিতরের অংশটিতেই বিভূতিরা থাকতো বৃদ্ধা অথর্ব সৌদামিনীকে কেন্দ্র করে।

বাইরের চারিদিককার জীর্ণ স্তূপের চক্রব্যূহ ভেদ করে ভিতরের সেই প্রায়-ধসে-পড়া অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে অংশের মধ্যে বিভূতির প্রত্যহ যেতে আসতে যে কষ্ট হতো আজও তা স্পষ্ট মনে আছে।

রামলালের গদি থেকে ফিরে হালিশহরের বাসাবাড়ির ছোট অন্ধকার ঘরটার মধ্যে চৌকিটার উপর বসে সেইসব দিনের কথাই ভাবছিল বিভূতি। সামনের আমবাগানটায় অন্ধকার যেন চাপ চাপ হয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু' একটা জোনাকির আলো অন্ধকারে যেন আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে।

ভাদ্রের শেষ। কয়েকদিন থেকে কি অসহ্য গুমোটই না পড়েছে।

সদু ঠাকরুনের মুখেই বিভূতি শুনেছিল, প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে দুই পুরুষের মধ্যেই রায়েদের সব জৌলুস নাকি একটু একটু করে নিভে এসেছিল। দীর্ঘজীবীর বংশ নন রায়েরা। তবে দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন রায়বাড়ির বধূ ও তাঁর কন্যা। তাই তাঁদের চোখের উপর দিয়েই সৌভাগ্য-সূর্য ধীরে ধীরে যেন ভাগীরথী-বক্ষে অস্তমিত হচ্ছিল। এবং অবস্থাবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের একদা সেই বিরাট রায়-ভবনটিও একটু একটু করে যেমন ভাঙতে শুরু করে, তেমনি তার সঙ্গে কিছুটা অংশ অন্যের হাতে চলেও যেতে থাকে। আর ঐ সঙ্গে ক্রমশ আবার ভিড়ও যেন বাড়তে থাকে সেই ছোট ছোট অংশগুলিব মধ্যে।

ছোট ছোট অনেকগুলি পরিবার ক্রমশ ভগ্ন জীর্ণ অংশে অংশে নতুন করে যেন আবার বাসা বাঁধবার প্রয়াস পায়। এবং ফলে প্রয়োজনে সেই সব অংশে অংশে চলতে থাকে খানিকটা অদল-বদলও। আব সেই প্রয়োজনের তাগিদেই রাযেদের শেষ নিকটতম ওয়ারিশন বিভূতিরা চাবপাশ থেকে যেন কোণ-ঠাসা হয়ে পড়ে।

বেঁচে থাকা অবিশ্যি তাকে বলে না। বেঁচে থাকবার একটা অনন্যোপায়তা, বিকৃত পঙ্গু প্রচেষ্টা মাত্র।

ভুলতে কোনদিনই পারবে না বিভূতি জীবনের সেই ক্লেদাক্ত বিকৃত অধ্যায়টা। ইতিহাস—মানুষেরই বাঁচবার এক পঙ্গু ব্যর্থ কুৎসিত ইতিহাস।

কিশোর বয়সে একদিন দ্বিপ্রহরে উত্তরের ঘরে ভারী সেগুন কাঠের সিন্দুকটা হাতড়াতে হাতড়াতে বিভূতি একটি লাল জীর্ণ খাতা, খেরোর বাঁধানো খাতা, রুপার একটি সিন্দুর-কৌটায় একটি বাদশাহী মোহর ও একটা খুরপি পেয়েছিল। মোহরটা আজও বিভূতির কাছেই আছে।

কিন্তু খাতাটা খুলে জীর্ণ ঝুরঝুরে পাতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিভূতি। সুমন্তনারায়ণ রায়ের রোজনামচা। অর্থাৎ ডাইরি।

সে তাঁর এক অত্যাশ্চর্য ইতিহাস। অদ্ভুত এক শক্তিশালী পুরুষের ইতিহাস। মানুষেরই ইতিহাস।

মাঝামাঝি এসে সে ইতিহাস আর লেখা হয়নি। লেখক সেটা লিখে শেষ করে যাননি। কতবার ভেবেছে বিভূতি নিজে ইতিহাসের একজন ছাত্র হয়ে রায়বংশের ঐ অসম্পূর্ণ ইতিহাসটা—সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার সঙ্গে নিজের শৈশবের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী ও সৌদামিনী দেবীর মুখে শোনা কাহিনী একত্রে জুড়ে লিখে ফেলবে একদিন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। তবে এও সে জানে, লিখতে তাকে একদিন হবেই, সম্পূর্ণ তাকে একদিন করতে হবেই সেই ইতিহাসের শেষের মর্মন্তুদ অধ্যায়টা।

মর্মন্তুদ বৈকি!

ঘৃণিত যৌনব্যাধির শেষ অধ্যায়ে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে সৌদামিনীর কন্যা সর্বাণীর পুত্র অর্থাৎ সৌদামিনীর দৌহিত্র পঙ্গু সুরথ চৌধুরী বড় জীর্ণ তক্তা-পোশটার এক কোণে অন্ধকারে, জীর্ণ মলিন একটা শয্যার উপরে সর্বদা পড়ে আছেন।

জ্ঞান হওয়া অবধি বিভূতি জেনে এসেছে সে-ই তার বাপ।

ছোটবেলায় শুনে শুনে শেখা 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' শ্লোকটি মনে পড়লে বিভূতির কেমন যেন একটা হাসি পেত।

দুইটি ভাই বোন। বিভূতি বড় আর তার চাইতে আট বছরের ছোট একটি বোন। বোন মৃণালের দেহটা ছিল যেন একেবারে ননী দিয়ে গড়া। আর কি গায়ের রঙ! সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছিল ঃ তপ্তকাঞ্চনানিভ। ঠিক তাই।

কিন্তু কীটদষ্ট। সমস্ত দুপুরটা মৃণাল ধসে-পড়া রায়-ভবনের অন্যান্য জীর্ণ অংশে যারা সব বাসা বেঁধেছিল, তাদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতো আর ফাঁক বা সুযোগ পেলেই এটা ওটা চুরি করে পালাত।

তাই নিয়ে মধ্যে মধ্যে কি কুৎসিত চেঁচামেচি ও গালিগালাজই না তার মার সঙ্গে অন্যান্যদের চলতো।

বিভূতির মা, সুরথ চৌধুরীর স্ত্রী বসন্তমঞ্জরী।

মার গায়ের বর্ণটাও ছিল ঠিক একেবারে মৃণালের মতই। কিন্তু দেহটা ছিল জীর্ণ কঙ্কালসার, এবং পরিধানে থাকতো ততোধিক জীর্ণ মলিন রিপুকরা একটা লালপাড় শাড়ী। মধ্যে মধ্যে মেয়ে মৃণালের ব্যাপার নিয়ে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কুৎসিত ভাষায় চেঁচামেচি ও ঝগড়া করলেও অন্য সময় তাঁর বড় একটা সাড়াশব্দই পাওয়া যেতো না।

আর ছিলেন অশীতিপরা বৃদ্ধা সদু ঠাকরুন—সৌদামিনী দেবী। সুরথ চৌধুরীর মাতামহী। সৌদামিনী-কন্যা সর্বাণী একান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য রায়-বংশে জন্ম নিলেও তার স্বামীর কুৎসিত যৌনাচার ও মদ্যপান সহ্য করতে না পেরে সুরথের যখন মাত্র দেড় বৎসর বয়স তখন একদিন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ফলে সৌদামিনীকেই মানুষ করতে হয়েছিল দৌহিত্র সুরথকে।

তার পর [illegible]

কেঁপে উঠলো এবং সেই রাত্রেই [illegible]

ধসে পড়লো। অনেকেই সেই ধ্বংসস্তূপের তলায় [illegible]

সুরথ চৌধুরী, তার স্ত্রী ও মৃণালও। দু-চারজনের সঙ্গে [illegible]

গেল বিভূতি ও সদু ঠাকরুন।

এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল—তবু কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন বিভূতির চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। বরং মনে হয়েছিল বিভূতির, অক্টো-পাশের মত ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল একটা দুঃস্বপ্ন, এতদিন যেটা তার সর্বাঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল সেটা থেকে যেন সে মুক্তি পেল। সে যেন বেঁচে গেল।

কপালের একটা জায়গা কেটে গিয়েছিল, ডান কনুইটাতেও একটা চোট লেগেছিল। ভূকম্পন থামবার পর কোনমতে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে যখন বিভূতি বের হয়ে আসছে, একটা কুৎসিত কান্নার শব্দে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ভূকম্পন থেমে গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের উপর মধ্যরাত্রের চাঁদের আলো একটা ফ্যাকাশে পাণ্ডুর বিবর্ণতা যেন—শীতরাত্রির কুয়াশার সঙ্গে মেশামেশি হয়ে কি একটা ভৌতিক বিভীষিকায় থম থম করছে। আর তার ভিতর থেকে প্রেতের দীর্ঘশ্বাসের মত উঠছে সেই কুৎসিত কান্নার শব্দটা থেকে থেকে।

শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে রাধারাণীর সেই বিরাট কাষ্ঠের সিন্দুকটার একপাশে বসে বসে কাঁদতে দেখতে পেয়েছিল সদু ঠাকরুনকে।

সিন্দুকটার জন্যই বোধ হয় আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে গিয়েছিলেন সৌদামিনী।

দিন দুই আগে থাকতেই তাঁর মার সঙ্গে রাগারাগি করে উত্তরের ঘরটায় গিয়ে শুচ্ছিলেন সদু ঠাকরুন। নচেৎ তাঁর ঘরে থাকলে তাঁকেও জীবন্ত সমাধি নিতে হতো সুনিশ্চিত।

ঐ ঘটনার দিনপাঁচেক বাদে ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীতে সুস্মিতার সঙ্গে দেখা হবার পর সুস্মিতা বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করলো, এ কদিন তোমাকে দেখিনি যে বিভু!

হ্যাঁ, আসতে পারিনি। হালিশহরে শিফট করতে হলো—

হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে হালিশহরে গেলে যে?

জোড়া ভ্রূ ধনুকের মত বাঁকিয়ে এবং সরু চিকন ওষ্ঠ দুটি, ঈষৎ হাস্য-স্ফুরিত যেটা সর্বদাই মনে হতো বিভূতির, সেই ওষ্ঠ দুটি সামান্য কুঞ্চিত করে সুস্মিতা প্রশ্নটা করেছিল। ভুরভুর করে নাকে আসছিল সুস্মিতার সর্বাঙ্গ থেকে ইভনিং-ইন-প্যারিস সেই পরিচিত সুবাসটা।

ধনুকের মত বাঁকানো জোড়া ভ্রূ দুটো ও ঈষৎ হাস্যস্ফুরিত ওষ্ঠ দুটি প্রশ্ন করবার সময় যখন কুঁচকে যায়, ভারি ভাল লাগে সে সময় সুস্মিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে বিভূতির।

হ্যাঁ চলে গেলাম। সেদিনকার আর্থকোয়েকে বাস্তু-ভিটেটা ধসে গেল একেবারে—

চমকে প্রশ্ন করেছিল সুস্মিতা, বল কি! কোন এ্যাক্সিডেন্ট হয় নি তো?

হ্যাঁ। মৃদু সংক্ষিপ্ত জবাব।

কি?

বাবা, মা আর বোন মৃণাল—

তাঁরা—

কেউ বেঁচে নেই।

না? একটা আর্ত ক্ষীণ শব্দ বের হয়ে আসে সুস্মিতার কণ্ঠ থেকে।

কিন্তু পরক্ষণেই বিভূতির প্রশ্নে চমকে উঠেছিল। অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিল কয়েকটা মুহূর্ত বোবা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে বুঝি সুস্মিতা।

তোমার রায়চৌধুরীর হিস্ট্রির নোটটা দু'দিনের জন্য আমাকে দিতে পারো সুস্মিতা?

নোট!

হ্যাঁ। একবার দেখে নেবো।...

হালিশহরে থাকতেন বিভূতির এক দূরসম্পর্কীয় মামা অবনী মুখার্জী, তাঁরই আশ্রয়ে গিয়ে বিভূতি উঠেছিল সদু ঠাকরুনকে নিয়ে।

অবনী মুখুজ্যে কলকাতার এ্যাণ্ডারসন মার্কেণ্টাইল ফার্মের বড়বাবু। বিভূতি তখনো দু'তিনটে টিউশনি ক'রে ফিফ্থ ইয়ারে পড়ছে শুনে বললেন, আর পড়াশুনা করে কি হবে, বড় সাহেবকে বলছি, আমাদের অফিসেই ঢুকে পড়।

বিভূতির প্রতি অবনীর ঈদৃশ দরদের পশ্চাতে ছিল অবিশ্যি তাঁর স্ত্রী নয়নতারার প্ররোচনা। দেখতে শুনতে রাজপুত্রের মত চেহারা, লেখাপড়াতেও ভাল ছেলে; বড় মেয়ে সুষমার বয়স ষোল পেরিয়ে সতেরোতে পড়লো; অতএব ঐ বিভূতির সঙ্গে যদি মেয়েটার বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যায় তো এক প্রকার নিখরচাতেই ব্যাপারটা মিটে যেতে পারে।

নয়নতারাই বলেছিলেন স্বামীকে, সুমির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমার সাহেবকে বলে একটা চাকরি দিয়ে দাও।

অবনী দেখলেন স্ত্রীর যুক্তিটা মন্দ নয়।

কিন্তু বিভূতি হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না। সে যেমন টিউশনি চালিয়ে ফিফ্থ ইয়ারের ক্লাস চালাচ্ছিল তেমনি চালিয়ে যেতে লাগলো।

পশ্চাৎ দিক থেকে স্ত্রীর অবিরাম তাগিদে অবনী কিন্তু হাল ছাড়লেন না, প্রায়ই বলতে লাগলেন, কি ঠিক করলে বিভূতি?

পূর্বের মতই বিভূতি হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না, কেবল মৃদু হাসে।

এবং স্ত্রী নয়নতারা যখন আবার স্বামীকে তাগিদ দেন, কি হলো—একেবারে যে হাল ছেড়ে বসে আছো নিশ্চিন্ত হয়ে!

অবনী বলেন, না—না—হাল ছাড়বো কেন? কিন্তু ও তো কোন সাড়াশব্দ করে না, কেবল হাসে—কি করি বল তো?

রেগে নয়নতারা জবাব দেন, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে হাসো, আমার হয়েছে মরণ!

॥ ২ ॥

সেই শীতের মধ্যরাত্রিতে ভূকম্পনের ধ্বংসের স্মৃতিটাও বিভূতির মন থেকে একটু একটু করে বোধ হয় মুছে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন দীর্ঘ এক বৎসর পরে আবার নতুন করে মনের পাতায় ভেসে উঠলো বিভূতির স্মৃতিটা, যখন ব্যবসার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর বরপুত্র, নন্দন আয়রন ওয়ার্কসের বড়কর্তা স্বয়ং রামলাল দাশ তাকে পর পর তিনটে জরুরী চিঠি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ডেকে আনলেন তাঁর হাটখোলার অফিসে।

প্রথম দু'বারের চিঠিতে বিভূতি সাড়া দেয়নি বা সাড়া দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। কিন্তু তৃতীয়বার চিঠি পাবার পর একটু বিস্মিত হয়েই গিয়ে হাজির হলো রামলালের অফিসে। এবং সে বিস্ময়টা তার আরো বৃদ্ধি পেল যখন রামলাল তাকে প্রচুর সমাদরে সামনের একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, রায়েদের ভগ্ন প্রাসাদ ও জমিতে বিভূতির যে অংশটা আছে সেটা তিনি উচিত মূল্যেই কিনে নিতে চান। রায়েদের ভগ্ন প্রাসাদে তার অংশটা, মানে ভূকম্পে বিধ্বস্ত সেই স্তূপের খানিকটা অংশ!

আপনার অংশের জন্য, বুঝলেন বিভূতিবাবু, আমি পাঁচ হাজার দেবো। বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে কথাটা বললেন রামলাল দাশ।

আবলুস কাঠের মত কালো দীর্ঘ দেহ। থলথলে চর্বি-বহুল, চকচকে। মাথার সম্মুখভাগে বিস্তীর্ণ একখানি টাক। কপালে ও নাসিকায় তিলক কাটা। গলায় জোড়া তুলসীর কণ্ঠি।

দুলে দুলে দুটি চক্ষু বুজে কথা বলা রামলালের একটা অভ্যাস।

টাকার অঙ্কের পরিমাণটা শুনে কয়েকটা মুহূর্ত যেন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিভূতি রামলালের মুখের দিকে।

রায়েদের ধ্বংসস্তূপের সেও একজন শরিক। অর্থাৎ ষোল শরিকের এক শরিক। এবং তার সে শরিকানার মূলে হচ্ছেন অশীতিপর বৃদ্ধা সদু ঠাকরুন—সৌদামিনী দেবী।

আর পরের শরিকদের কথা বিভূতি জানতো না, তবে রায়-বংশের লুপ্তপ্রায় অতীত ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলোর শেষ সাক্ষী যদি কেউ থেকে থাকে তো ঐ সৌদামিনী দেবীই। সদু ঠাকরুন।

রায়বাড়ির কন্যার দিক দিয়ে হলেও রায়েদের রক্তের ক্ষীণতম শেষ ধারাটি আজও ঐ হৈমবতী-কন্যা সৌদামিনীর দেহ-ধমনীতেই প্রবাহিত।

বিভূতির সত্যিকারের দাবি তো অত্যন্ত ক্ষীণ। কন্যাপক্ষের মিশ্র রক্তধারার ক্ষীণতম দাবী মাত্র। তথাপি সৌদামিনীর একান্ত আপনার জন বিভূতিই তো। কারণ সৌদামিনী যে হৈমবতীরই আত্মজা—অর্থাৎ স্বয়ং সুমন্তনারায়ণের দৌহিত্রী।

নন্দন আয়রন ওয়ার্কসের কর্তা রামলাল দাশ সুচতুর ব্যবসায়ী।

কথাটা সেদিন রাত্রে রামলালের গদি থেকে ফিরে এসে সৌদামিনীকে বলতে তিনি বললেন, রামলাল দাশই বটে। নমশূদ্র কানাইয়ের বেটা আজ রামলাল দাশ হয়েছে!

তারপর বিভূতি সদু ঠাকরুনের মুখেই শোনে, আজকের বিরাট ধনী লৌহ-ব্যবসায়ী নন্দন আয়রন ওয়ার্কসের মালিক রামলাল তাঁর পদবীতে 'দাশ' শব্দের লেজুড়টি জুড়ে নিয়ে, কাঞ্চনমূল্যে আভিজাত্যের শীর্ষশ্রেণীতে উঠে বসলেও, তাঁর প্রপিতামহ রঘুনাথ বা রোঘো ছিল ঐ রায়েদেরই লেঠেল পাইক। তস্যপুত্র কালীচরণ বা কেলে এবং তস্যপুত্র কানাইয়ের বেটা রামলাল। এবং জাতিতে চণ্ডাল, নমশূদ্র। অন্তত দশ হাত তফাৎ থেকে মাটির দিকে তাকিয়ে ছাড়া রায়-কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবার অধিকার বা সাহস পায়নি কোন দিন যাদের পূর্বপুরুষ।

সম্পর্কটা ছিল প্রভু-ভৃত্যের। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রতম চণ্ডালের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যই ছিল।

কাঞ্চনমূল্যের প্রভাবে নিত্য পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় বুঝি আজ সবই সম্ভব। ব্রাহ্মণ্যধর্মের কবরে আজ তাই বুদ্ধিজীবী শূদ্রের নতুন অঙ্কুরোদ্গম।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—

নইলে পূর্বতন তিন পুরুষ ধরে ঘোর শাক্তের বংশধর রামলাল আজ বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় নিয়ে পরম বৈষ্ণব হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কি! কিম্ আশ্চর্যম্!

বিভূতি সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলো।

সৌদামিনী শুনতে লাগলেন।

অভ্যর্থনারই বা কি ঘটা!

বসুন, বসুন বিভূতিবাবু। বসতে আজ্ঞা হোক আজ্ঞে। কি সৌভাগ্য!

চারিদিকে কর্মচারীরা, লোকজন গমগম করছে। বিরাট কারবার।

কোন প্রকার কিন্তু বা দ্বিধা না করে রামলাল সরাসরিই প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছিলো। প্রতি কথার মধ্যে এবং প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গিতে বৈষ্ণবী বিনয়ের সে কি অদ্ভুত নম্রতা!

বুঝলেন বিভূতিবাবু, মা-লক্ষ্মীর কৃপায় আজ যৎসামান্য খুদকুঁড়ো যা-ই সঞ্চয় করে থাকি না কেন, এ কথাটা তো ভুলতে পারবো না যে, এর মূলে রয়েছে সেই রায়-কত্তাদেরই আশীর্বাদ। এ কথা ভুললে যে সাতপুরুষকে নরকস্থ হতে হবে, ঐ রায়-কত্তাদেরই স্নেহের ছায়ায় ও দাক্ষিণ্যেই না আজ দু মুঠো খেয়ে পরে আছি। তাই বুঝলেন কিনা, যখন শুনলাম ফিরিঙ্গী কোম্পানি নতুন শহর গড়ে তুলবে বলে এই তল্লাটের আশেপাশে সব জমি-জিরেতগুলো কিনে নেবার মতলব করেছে, তখন ভাবলাম বুঝলেন কিনা, আমিই বা কিনে নিই না কেন যদি সক্ষম হই! কি বলেন?

তা তো বটেই। বিভূতি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয়।

তাই বলুন। হেঁ, হেঁ বুঝলেন কিনা, সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকলেও ঐ রায়েদের রক্তেরই তো কিছুটা এখনো ঐ সৌদামিনী ঠাকরুনের দেহে রয়েছে। তাই ভাবলাম শুধু জমি বা ভিটেটুকু নেওয়া নয়, ঐ সঙ্গে বুঝলেন কিনা, তাঁহার আশীর্বাদটুকুও হাত পেতে ভিক্ষে করে নেওয়া আর কি।

কথাগুলো বৈষ্ণবী বিনয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হলেও যে তার প্রতিটি শব্দের মধ্যে একটা অর্থ ও সৌভাগ্যের নিষ্ঠুর দম্ভ ও ব্যঙ্গ আছে—অন্তত বিভূতির সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তাই সে চুপ করেই শুনতে থাকে।

ফিরিঙ্গী কোম্পানির জিদ যখন চেপেছে, বুঝলেন কিনা, তারা কিনবেই আর কিনবেও, কিনুক আশপাশের জমি, আমি রায়েদের ঐ ভিটেটুকুই না হয় কিনে নিই। ওরা বের করুক না নয়া রাস্তা, বুঝলেন কিনা, আমার তো অত ক্ষ্যামতা নেই, সে থাকতো আজ আমাদের রায়-কর্তারা তবে দেখিয়ে দিতো না রাস্তা করা কাকে বলে!

বিভূতি তথাপি চুপ করেই থাকে।

রামলাল বলে চলেছেন তখনো, তাই ভেবেছি জায়গাটা কিনে ভাল করে একটা মনের মত মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিই। নামটা না হয়, বুঝলেন কিনা, রায়-কুঠিই দেওয়া যাবে, কি বলেন আপনি?

বলতে বলতে ঈষৎ বক্র হাসিতে তাম্বুল-সেবিত কালো পুরু ওষ্ঠ দুটি কোঁচকালেন রামলাল দাশ।

ভৃত্য রুপার গড়গড়ায় সুগন্ধী গয়ার অম্বুরী তামাক সেজে দিয়ে রুপার তারে জড়ানো গড়গড়ার নলটা সসম্ভ্রমে রামলালের হাতে তুলে দিয়ে গেল। নলটা মুখে দিয়ে গোটা দুই টান দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়া খানিকটা ছাড়লেন রামলাল। রামলালের বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি। তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে অবিশ্যি, বুঝলেন কিনা, আপনারা ফিরিঙ্গী কোম্পানীর কাছেও জায়গাটা বেচতে পারেন। শঙ্খচিলের মত ছোঁ মারবার চেষ্টা তারাও করছে, কিন্তু পাঁচ হাজার দর তারা দেবে না। অন্যান্য শরিকদের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। রাজী সকলেই আছে। এখন বুঝলেন কিনা, আপনারা শেষ অংশটুকু রাজী হলেই লেনদেনের বখেরা মিটিয়ে সামনের শুক্রবারেই দলিলটা সকলের উপস্থিতিতে একেবারে পাকা করে নেওয়া যেতে পারে রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে—কি বলেন আজ্ঞে?

পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় কাঞ্চনপ্রভাবে অতীতের ধন ও ঐশ্বর্যের জীর্ণ স্তূপটা আজ আবার হস্তান্তরিত হয়ে নতুন করে এই রূপ গ্রহণ করবে—এতে বিস্ময়ের, আশ্চর্যের বা বলবারই কি থাকতে পারে!

আর ক্ষোভ? ক্ষোভই বা কেন থাকবে বিভূতির? কে সে রায়-বংশের? ক্ষীণতম রক্তের স্বাক্ষর বহন করছে যে তো নয়!

তা ছাড়া এই বাজারে নগদ করকরে পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মত ঐ পাঁচ হাজার টাকার অঙ্কটাও হেলা-ফেলা করবার নয়।

পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা আর কি। ঐ পরিত্যক্ত জীর্ণ স্তূপের ষোল অংশের একাংশ। ইঁটের তলা থেকে ওর উদ্ধার শুধু অবিশ্বাস্য নয়, স্বপ্নেরই মত।

কাজেই সৌদামিনী দেবীকেও রাজী হতে হলো।

বললেন সৌদামিনী, পনেরো শরিকই যখন রাজী হয়ে গিয়েছে তখন আমাদেরই বা গতি কি!

অতএব নির্বিঘ্নেই শুক্রবারে ব্যাপারটা চুকে গেল।

রামলাল দাশের বখেরা মিটে গেল।

সকলের উপস্থিতিতেই বিক্রয় কোবলা রেজেস্ট্রী হয়ে গেল।

নিজেদের অংশটা বিক্রয় করে, রামলাল প্রদত্ত নগদ পাঁচ হাজার টাকার চকচকে কারেন্সী নোট পকেটস্থ করে সন্ধ্যার পর বিভূতি ফিরে এলো হালিশহরে একদিন।

সদু ঠাকরুন অন্ধকার ঘরের মধ্যে দৃষ্টিহীন চোখ নিয়ে প্যাঁচার মত বসে ছিলেন।

বিভূতি এসে সামনে দাঁড়ালো। বললে, বিক্রী হয়ে গেল। টাকাটা কাল তোমার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দিই?

কি হবে ও টাকা দিয়ে আমার? তুই-ই নে—

আমি!

হ্যাঁ।

না। আমি এ টাকা দিয়ে কি করবো?

কেন বিয়ে-থা কর, সংসার পাত।

বিয়ে!

হ্যাঁ, একটি টুকটুকে বৌ নিয়ে আয়।

টুকটুকে রূপের কথা মনে পড়লেই বিভূতির মনে পড়ে যায় ভগবতীর মত দেখতে তার সেই ছোট বোনটি মৃণালকে।

শিউরে ওঠে বিভূতি।

রূপ নয় বিষ!

সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার কয়েকটা লাইন মনে পড়ে যায় বিভূতির।

ভুল করেছিলাম—ভুল করেছিলাম ইন্দ্রাণীর মত রূপবতী হেমাঙ্গিনীকে ঘরে এনে। নিজেও সে জ্বলে মরলো, আমাকেও জ্বালিয়ে গেল। সেই বিষই সর্বদেহে আমার ছড়িয়ে গেল।

ধীরে ধীরে বিভূতি ঘর থেকে নিঃশব্দ পায়ে বের হয়ে গেল। বাইরের যে ছোট ঘরটায় বিভূতি থাকতো সেই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে এসে ঢুকলো।

একটু পরে অবনীর মেয়ে সুষমা একটা প্রজ্বলিত হ্যারিকেন হাতে ঘরে এসে ঢুকলো এবং কোন কথা না বলে হ্যারিকেনটা রেখে আবার বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ ৩ ॥

রসিক পুরুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে সুমন্তনারায়ণ রায়।

রোজনামচার আরম্ভটি ভারি সুন্দর। কাব্যিক।

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি' কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পুতলি মোর স্থির নাহি বান্ধে ॥

হেমাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী! আহা, কি রূপ ছিল গো তাঁর! হ্যারিকেনের আলোয় বিভূতি রোজনামচার জীর্ণ ঝুরঝুরে লাল পাতাগুলোর উপর নতুন করে আবার চোখ বুলোয়।

যতবার পড়তে বসেছে শেষ আর করা হয়নি। কখনো এখান থেকে কখনো ওখান থেকে এক পাতা দু পাতার বেশি পড়ার ধৈর্য বড় একটা থাকেনি। কারণ ভাষাটা বড় খটমটে। একেবারে দাঁত-ভাঙা সব শব্দ-বাণ!

আবার মনে হয় সৌদামিনীর কাছ থেকে শোনা কাহিনী ও সুমন্ত-নারায়ণের রোজনামচাকে অবলম্বন করে নতুন এক ইতিহাস রচনা করার কথাটা। সুমন্তনারায়ণ যেটা শেষ করে যেতে পারেননি, সেটাও একেবারে শেষের পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে, ইতি রায়-বংশ-ইতিহাসঃ সমাপ্তঃ, কেমন হয়!

সুষমা এসে আবার ঘরে প্রবেশ করলো, ভাত দেওয়া হয়েছে, খেতে চলুন। জীর্ণ রোজনামচাটার উপর একটা ভারী ইতিহাসের বই চাপা দিয়ে উঠে পড়লো বিভূতি।

আহারাদির পর সদু ঠাকরুন আবার ডাকলেন বিভূতিকে তাঁর ঘরে।

ডাকছিলে?

হ্যাঁ। ঘুম পেয়েছে নাকি?

না। কি বলবে বল না।

বোস।

ভাঙ্গা জীর্ণ তক্তাপোশটার এক পাশে বিভূতি বসলো। ঘরের বাতিটা কমানো। আবছা একটা আলো-আঁধারি ঘরটার মধ্যে। খোলা জানালার পথে পিছনের বাগানের ঝোপঝাড় থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে।

বলছিলাম রাম তাহলে তার মনিবের ভিটেয় বাড়ি তুলবে?

হ্যাঁ, সেই জন্যই তো জায়গাটা কিনে নিল।

মস্তবড় বাড়ি করবে বল তাহলে?

তা হয়তো করবে। জায়গা তো নেহাৎ কম নয়। প্রায় বিঘের কাছাকাছি। রামলাল করবে বাড়ি আর আশেপাশের প্রায় মাইলখানেক জায়গায় যত ছোটখাটো সব বাড়ি গলিঘুঁজি ছিল, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কিনে নিল। চল্লিশ ফুট চওড়া এক রাস্তা বের করবে। আঁকাবাঁকা গলিঘুঁজি নয়, সোজা সরল চওড়া মেটাল-বাঁধানো রাস্তা। দু পাশে তার উজ্জ্বল বিদ্যুৎ আর গ্যাসের

বাতি। দিনমানে তো বটেই, রাতের বেলাতেও দিনের আলোর মত ঝলমল করবে। তারপর ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠবে সেই চওড়া মেটাল-বাঁধানো রাস্তার দু পাশে নতুন নতুন দোতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা সব বাড়ি। কাঞ্চন-মূল্যে ক্রীত নতুন আভিজাত্যের চোখ-ঝলসানো নতুন এক পরিকল্পনা।

আশ্চর্য! অশীতিপর বৃদ্ধা সৌদামিনীরও যেন শুনতে শুনতে কেমন নেশা ধরে যায়। বলেন, তাহলে কিছুই আর সে সব থাকছে না বল বিভু?

না। তাহলে আর বলছি কি?

সত্যিই তো, এ তো আর সেই বিস্মৃতপ্রায়, বলতে গেলে সেই মান্ধাতা আমলের, কলকাতা শহর নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ নতুন গঠনের মুখে নয়া কলকাতা শহর। মনে পড়ে আজও সৌদামিনীর, মাতামহী রাধারাণীর সেই আক্ষেপ। থুরথুরে বুড়ী, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। মাথার সেই পিঠ ঢাকা কেশভার শণের মত সাদা হয়ে গিয়েছে তখন।

বুড়ী আপন মনেই আক্ষেপ করতো।

কি কুক্ষণেই না তিনি কুলগুরু করালীশংকরের পরামর্শে নিয়তি শনিকে আহ্বান করে এনে রায়-বংশের রক্তধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন!

ভীমরতি, ভীমরতি হয়েছিল তাঁর!

কোথা থেকে—তারপর দুদিনের মধ্যেই কি হয়ে গেল—শেষ পর্যন্ত সেই শনির দৃষ্টিতেই বুঝি এতবড় রায়-বংশটা ধীরে ধীরে নিঃশেষে মুছে গেল।

মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বুড়ীর শেষের দিকে। চুপচাপ বসে বসে দিবারাত্রির বেশির ভাগ সময়ই আপনমনে বিড় বিড় করে যেতেন। শনি! শনি! সেই শনির দৃষ্টিতেই পড়ে সব ছারখার হয়ে গেল, আর বাকী যেটুকু আছে তাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যাবে না, নিশ্চয়ই যাবে।

মধ্যে মধ্যে আবার নিষুতি রাত্রে চেঁচিয়ে উঠতো বুড়ী: কে? কে ওখানে মশাল হাতে যাচ্ছে? ওরে হতভাগা নিবিয়ে দে, নিবিয়ে দে। কন্দর্পের চোখে পড়লে জ্যান্তে গোর দেবে।

কখনো আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতেন আপন খেয়ালেই। আহা রে, আমার এত সাধের সোনার প্রতিমা! আমি নিজে বিষ দিলাম তাকে! যাবে, যাবে—সব যাবে। সব ঐ শনির দৃষ্টিতে যাবে। ইঁটের গাঁথুনিতে চিড় ধরছে, সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে লক্‌লকে জিভ বের করে এখনো রক্ত শুষছে সেই কাল শনি। সব, সব শুষে নেবে।

সৌদামিনী ঠিক বুঝতে পারতেন না রাধারাণীর আক্ষেপোক্তিগুলো।

রাত্রে ঐ ঘরের মেঝেতে তার মার বুকের কাছটিতে শুয়ে থাকতেন আর অন্ধকার ঘরের মধ্যে মাতামহীর কথাগুলো যেন বুকের মধ্যে তাঁর কি এক অস্বাভাবিক কাঁপুনি ধরাতো। রায়-বংশ যাবে—যাবে। বাতি দিতে এ বংশে আর কেউ থাকবে না রে, কেউ থাকবে না।

সত্যিই!

সৌদামিনীর বুকখানা কাঁপিয়ে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো।

অনুমান রাধারাণীর মিথ্যা হলো না। অক্ষরে অক্ষরে সব মিলে গেল।

পরে অবিশ্যি বড় হয়ে কানাঘুষায় কিছু কিছু শুনেছিলেন সৌদামিনী, বুঝেছিলেন। রায়-বংশের রন্ধ্রগত শনি কালীচরণের বংশধরেরাই আজ রায়েদের শেষ চিহ্নটুকু গ্রাস করলো। সুমন্তনারায়ণ রায়ের বসতবাটির জীর্ণ শেষ ধ্বংসস্তূপটুকু।

এ আমি জানতাম বিভু। এ জানতাম। এ যে হবেই হবে, কত্তামার কথা কি মিথ্যে হবার রে! সৌদামিনী বলেন।

ত্রিকালদর্শী ছিলেন যে কত্তামা।

প্রদীপের আলোয় বড় ঘরে সেই বিরাট পালঙ্কটার উপর বসে বসে সৌদামিনীর মাতামহী সুমন্তনারায়ণের স্ত্রী রাধারাণী, কত্তামার মুখে শোনা ঐ-সব কাহিনী।

অতি শৈশবের সেই আবছা ধূসর স্বপ্নের মত সন্ধ্যাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে কৈশোর ও যৌবনের সব কথাই সৌদামিনীর যেন আজও মনে পড়ে।

শৈশবে ও কৈশোরে কালো চকচকে কষ্টি পাথরের মত মসৃণ ও ঠাণ্ডা মেঝেতে কত্তামার সামনে বসে শোনা তাঁর সেই সব আক্ষেপোক্তি।

বসে বসে শুনতেন সৌদামিনী রায়-বাড়ির সেই সব ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের রূপকথা।

ঘরের এক কোণে পিতলের পিলসুজে টিপ্‌টিপ্‌ করে জ্বলতো দীপ-শিখাটি। আর সেই প্রদীপের আলোয় ঘরের মধ্যে যেন থম্‌থম্‌ করতো খানিকটা অন্ধকার, খানিকটা ছায়ার একটা প্রেতায়িত স্তব্ধতা।

রাজপুত্তুর, রাজকন্যা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কাহিনীর চাইতেও শুনতে ভাল লাগতো সৌদামিনীর সেই সব কাহিনী সেদিন। তবুও স্পষ্ট করে কিছু বলতেন না কত্তামা। মাঝে মাঝে কেমন অসংলগ্ন গোলমাল লাগত শুনে।

ঘরের দক্ষিণ ধারে বিরাট উঁচু একটা পালঙ্ক। পালঙ্কের একধারে লাগানো উপরে উঠবার জন্য কাঠের একটা ছোট সিঁড়ি। পালঙ্কের পায়ের দিকে ও মাথার দিকে বাতায় ধারালো বাটালি দিয়ে কুঁদে তোলা দক্ষ শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকার্য। লতাপাতা পদ্মকোরক। শিয়রের দিকের বাতায় দুটি পেখম ছড়ানো ময়ূর, চোখে তাদের বসানো ছিল রক্তের মত লাল টকটকে চুনি। প্রদীপের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলতো সে পাথর দুটো।

অসংলগ্ন এলোমেলো আক্ষেপ করতেন রাধারাণী দেবী ঐ পালঙ্কটার উপর বসে বসে।

তারপর আরো যখন বড় হয়েছেন, বুঝতে শিখেছেন সৌদামিনী, তখনও শুনেছেন।

সে আরো অনেক পরের কথা।

নির্মলার বিবাহ দিয়েছিলেন রাধারাণী অনেক খুঁজেপেতে মনোমত পাত্রে,

কিন্তু এক দিনের জন্যও নির্মলা স্বামীর ঘর করতে গেল না। কত্তামা দুঃখ করতেন, তাঁর মা হৈমবতী দুঃখ করতো, আরো অনেকেই দুঃখ করতো, কিন্তু কেন যে নির্মলা স্বামীর ঘর করলো না কোনদিন, তখন বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পেরেছিলেন বৈকি। তারপর আরো অনেক দিন পরে রায়বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শনির বিষাক্ত নিঃশ্বাস লেগেছে।

সৌদামিনীর তখন সবেমাত্র বিবাহ হয়েছে মন্মথর সঙ্গে। কন্দর্পের মত রূপবান স্বামী সৌদামিনীর, কিন্তু তবু বুঝি রাধারাণীর মনের কোথায়ও এতটুকু সুখ ছিল না।

ওদিকে তখন রায়বাড়ি প্রায় শ্মশান বললেও চলে। সুমন্তনারায়ণের একমাত্র বংশধর কন্দর্পনারায়ণ আত্মগ্লানিতে লজ্জায় ও ধিক্কারে জলসাঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। সুমন্তনারায়ণের তিন-তিনটি কন্যা—কঙ্কাবতী, হৈমবতী ও রূপবতী—তাদের মধ্যে সুমন্তনারায়ণের জীবনের শেষ দিকেই অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর মাত্র বৎসরখানেক আগে একমাত্র কন্যা নির্মলাকে রেখে কঙ্কাবতী বিধবা হয়ে স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছে, সর্বকনিষ্ঠা রূপবতীর বিবাহের মাত্র বৎসর-দুইয়ের মধ্যেই স্বামীসহ অকস্মাৎ একদিন ঝড়-জলের রাত্রে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র জীবিতা মধ্যম কন্যা হৈমবতী—কন্দর্পনারায়ণের আত্মঘাতী হবার মাত্র এক বৎসর পূর্বে ছয় বৎসরের কন্যা সৌদামিনীকে নিয়ে এসে স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়ে ঐ রাধারাণীরই আশ্রয়ে উঠেছে।

অতবড় বিরাট রায়বাড়িতে মানুষজনের মধ্যে তখন মাত্র—কন্দর্পনারায়ণের আত্মঘাতী হবার পর বিকৃত-মস্তিষ্ক রাধারাণী, হৈমবতী ও তার কন্যা সৌদামিনী। আর সৌদামিনীর স্বামী মাতাল গেঁজুড়ে মন্মথ। নির্মলা তখন আশ্চর্যজনকভাবে নিরুদ্দিষ্টা। বাইরে দেখাশোনা সব করেন বৃদ্ধ নায়েব উমাচরণ।

তারপর তো কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর একটি বৎসরও গেল না, হুগলী থেকে বিষ্ণুনারায়ণের ভ্রাতা কীর্তিনারায়ণের বংশধরেরা সূর্য রায় ও চন্দ্র রায় কি করে যেন শুভ সংবাদটা পেয়ে, যে সুমন্তনারায়ণের বংশে আর বাতি দিতে কেউ নেই, একদিন নৌকা করে এসে উঠলো হাটখোলার ঘাটে স্ত্রী-পুত্রদের হাত ধরে।

তারপর সেখান থেকে সোজা একেবারে রায়বাড়ির দেউড়ি দিয়ে অন্দর-মহলে গিয়ে একেবারে জাঁকিয়ে বসলো।

বাধা দেবে কে? কয়েকটি নারী, মাতাল মন্মথ আর বৃদ্ধ নায়েব উমাচরণ?

সুমন্তনারায়ণের বিরাট প্রাসাদে ধরেছে তখন ভাঙ্গন। পলেস্তারা খসে খসে ইঁট বের হয়ে পড়েছে।

কত্তামা রাধারাণীর আক্ষেপের মধ্যে সেদিন যে কেবল রায়বাড়ির কথাই

ছিল তা নয়, কলকাতা শহরের গোড়াপত্তনের ও তার সমৃদ্ধির কাহিনীটাও ছিল জড়িয়ে।

হিমালয়োদ্ভূতা গঙ্গোত্রী, মহানন্দাকে কোল দিয়ে দক্ষিণপ্রবাহ ভাগীরথী, নবদ্বীপ ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে যে তীরভূমিকে স্পর্শ করে নাম দিয়েছে হুগলী নদী, সেই তীরভূমি কলকাতারও শুরুর ইতিহাস।

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুই কূলে বসাইয়া বাট।

পাষাণে রচিত ঘাট দু-কূলে যাত্রীর নাট, কিংকরে বসায় নানান হাট ॥

কবিকংকণের ঐ চরণ দুটি বিভূতিও গুন গুন করে আওড়াতে শুনেছে বীরভদ্রকে। চাঁদ রায়ের ঐ একমাত্র ছেলে বীরভদ্র রায়।

নামটা যে কি করে ওর বীরভদ্র হলো এবং কি দেখে যে চাঁদ রায় ঐ অকালকুষ্মাণ্ড ছেলের নাম বীরভদ্র রেখেছিল সে-ই জানে।

শোনা যায় এগারো বছরের সময় যাত্রা ও ঢপের দলে সখী সেজে গান গাইতে শুরু করে এবং সারাটা যৌবন-কালই যাত্রার মায়া আর কাটিযে উঠতে পারেনি।

অনেক রাত্রে টিউশনি সেরে বিভূতি যখন রায়েদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রবেশ করতো, শুনতে পেতো প্রৌঢ় বীরভদ্রের কণ্ঠস্বর। যাত্রার পার্ট বলে যাচ্ছে।

সুমন্তনারায়ণ রায়ের রোজনামচায় লেখা আছে :

বিষ্ণুনারায়ণ রায় বাস সপ্তগ্রাম
যথা সপ্ত ঋষিস্থান ঘাট ত্রিবেণী নাম।
তাঁর পুত্র সুমন্ত রায় আপন বৈভবে রয়, ইত্যাদি—

বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গলেও সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যের কি বর্ণনা। সে কাব্য তো বিভূতিও পড়েছে।

অভিনব সুরপুরী দেখ সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাচ কাল
রাজমুক্তা প্রবালের ধারা।

সপ্তগ্রামের সে কি বোলবোলাওর দিন! আরব পারস্য আবিসিনিয়া থেকে পর্যন্ত সপ্তগ্রামের ঘাটে ঘাটে এসে ভিড়েছে সব বাণিজ্য-ডিঙা। বেচা-কেনা চলেছে তুলো, ইক্ষু, আদা, লালমরিচ, ওড়না, ঝালর চাদর। রুকনউদ্দীন তখন সপ্তগ্রাম সাতগাঁও-এর শাসনকর্তা। দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলাকে লুটেপুটে পর্তুগীজরা তখন এগুচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ ঐদিকে।

সপ্তগ্রামের পরের ইতিহাসই হচ্ছে কলকাতা। জাহাজ চলাচলের সুবিধা হতেই ক্রমশ পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে একজন দুজন করে সপ্তগ্রাম ছেড়ে উঠে আসতে লাগলো কলকাতায়।

ভাগীরথীরই তীরভূমির একাংশের ইতিহাস হচ্ছে কলকাতার ইতিহাস।

ভাগীরথী বহে চলে ধীরে। কলকাতারও ইতিহাস গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। আসতে থাকে মানুষজন, গড়ে ওঠে বসতি।

বিষ্ণুনারায়ণ একবার সুতোনটির হাট থেকে একটি চণ্ডাল রমণী ক্রীত-দাসীকে ক্রয় করে এনেছিলেন পর্তুগীজ ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

মঙ্গলা।

ক্রীতদাসী মঙ্গলাই নয়, তার সঙ্গে ছিল তারই তিন বৎসরের এক বালক রঘুনাথ। কালো কষ্টিপাথরের মত গায়ের রঙ। গাঁট্টাগোঁট্টা শিশু।

ভাগীরথীর তীরে কলকাতা শহরটা যখন গড়ার মুখে, পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ছোট ভাই কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুনারায়ণের বিবাদ বাধতে—আক্রোশের মাথায় পিতৃ-সম্পত্তির সমস্ত দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে বিষ্ণুনারায়ণ চলে গেলেন মুর্শিদাবাদে। সঙ্গে তাঁর মাতৃহারা দশ বৎসরের একমাত্র বালক-পুত্র সুমন্তনারায়ণ। কিন্তু বেশী দিন আর তিনি বাঁচলেন না, সুমন্তর যখন মাত্র ষোল বৎসর বয়স তখন মারা গেলেন।

সুমন্তনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুনারায়ণ যখন মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন, মুর্শিদাবাদ তখন বাঙলার রাজধানী। বাঙলার মসনদে মুর্শিদকুলি খাঁ বা কুলি খাঁ, এবং কুলি খাঁর দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাঙলার মসনদে এলেন সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ খাঁ। সেটা সরফরাজ খাঁর রাজত্বের শেষ। তারপর একদিন ব্যবসার কাজে একবার প্রথম যৌবনে সুমন্ত রায়কে যেতে হয়েছিল কাটোয়া।

কাটোয়ায় গিয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখেন* কিশোরী হেমাঙ্গিনীকে।

হরিহর সার্বভৌমের পৌত্রী। নামেই শুধু হেমাঙ্গিনী নয়, হৈমকান্তি গাত্রবর্ণ, সারা পৃষ্ঠ ব্যেপে কুঞ্চিত মেঘের মতই কেশদাম। সে রূপ দেখে যেন পাগল হয়ে গেলেন সুমন্ত রায়।

সেইদিনই দ্বিপ্রহরের দিকে খোঁজ নিয়ে গিয়ে হরিহরের কুটিরে উপস্থিত হলেন।

॥ ৪ ॥

নিকানো মাটির দাওয়ায় একটি কম্বলাসনে বসে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন হরিহর।

এটাই কি হরিহর সার্বভৌমের কুটির?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাশয়ের কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

সুমন্ত রায় নিজের পরিচয় দিলেন।

হরিহর চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন সুমন্ত রায়কে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ বপু। বিস্তৃত বক্ষপট। বৃষস্কন্ধ কাঁধের উপর কোঁকড়া বাবরী চুল গুচ্ছে গুচ্ছে এসে পড়েছে।

পরিধানে ধুতি, গায়ে বেনিয়ান ও রেশমের দামী উত্তরীয়।

আপনার একটি পৌত্রী আছে ?

মৃদু হেসে হরিহর বলেন, এক নয়, দুটি। একটি এগারো বৎসরের কিশোরী, অন্যটি চার বৎসরের বালিকা মাত্র। হেমাঙ্গিনী আর রাধারাণী।

আমি তাহলে ঐ কিশোরীটির কথাই বলছি। আমার পরিচয় তো শুনলেন, আমি যদি আপনার ঐ কিশোরী পৌত্রীটির পাণিপ্রার্থনা করি—

নারায়ণ, নারায়ণ! কল্যাণ হোক। বিলক্ষণ, আনন্দের সঙ্গে আমি রাজী আছি।

তাহলে বিবাহের আয়োজন করুন।

এখনি ?

হ্যাঁ, আজকালের মধ্যে যদি শুভদিন থাকে তো পরশু পর্যন্ত আমি দেরি করতে চাই না। কারণ আবার মুর্শিদাবাদে যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

পাঁজিতে পরের দিনই একটি লগ্ন ছিল সৌভাগ্যক্রমে।

কিশোরী হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করে নবপরিণীতা বধূসহ গঙ্গা-বক্ষে আবার ডিঙ্গি ভাসালেন সুমন্ত রায়। বিবাহের পরের দিনই।

মহাজনটুলীতে ছিল সুমন্তনারায়ণের বসতবাটি।

বাটির সম্মুখেই কলস্বনা ভাগীরথী। ভাগীরথীর অপর পারে মাহীনগর।

সে সময়টা হচ্ছে রবিঅল্-আওয়েল মাসের তৃতীয় দিবস। মহাসমারোহে তখন চলেছে কুলি খাঁর প্রবর্তিত উৎসব—আপামর সাধারণকে পানভোজনের আপ্যায়ন।

মাহীনগর থেকে লালবাগ পর্যন্ত দুই ক্রোশ ব্যাপী স্থান সেরাত্রে ভাগীরথীর উভয় তীরে অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় যেন স্বপ্নপুরীর মতই প্রতীয়মান হচ্ছিল।

আলোকাধারের গায়ে গায়ে কোরানের শ্লোক, মসজিদ ও বৃক্ষলতা পুষ্পাদির সব মনোরম চিত্র অঙ্কিত। সেনানী নাজির আহম্মদ সাহেব স্বয়ং আলোকদান কার্যের তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন।

ঘাটে এসে সুমন্ত রায়ের ডিঙ্গি লাগলো।

রক্তবর্ণ চেলীর অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে হেমাঙ্গিনী সকৌতুক দৃষ্টিতে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখছিল। এ কোথায় নিয়ে এলেন তাঁর স্বামী! হুরী পরীর রাজ্যে কি! নব-পরিণীতা বধূর হাত ধরে ডিঙ্গির পাটাতনে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন সুমন্ত রায়।

এতো আলো কিসের ? কিশোরী-সুলভ কৌতূহলে প্রশ্নটা স্বামীকে না করে পারেনি হেমাঙ্গিনী।

এটা রবিঅল্-আওয়েল মাস। তাছাড়া আজ রোশনী পর্ব।

তাই এতো আলো বুঝি ?

হ্যাঁ, খাজা খিজিরকে উদ্দেশ করে এই আলো দেওয়া হয় বছর বছর এই দিনটিতে।

খাজা খিজির, সে আবার কে ?

খাজা খিজির (হরিৎপ্রভু) খ্রেস্তানদের ইলিয়াস্। "জীবন নির্ঝর" আবিষ্কার করে তিনি অমর হয়েছেন কথিত আছে।

ভাগীরথী-তীর থেকে একেবারে সন্নিকটেই সুমন্ত রায়ের বাসগৃহ।

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরে গৃহে প্রবেশ করলেন সুমন্তনারায়ণ।

ভৃত্য রঘুনাথ প্রভুর সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো।

মঙ্গলার সন্তান রঘুনাথ তখন পূর্ণ যুবা। মঙ্গলার বছর পাঁচেক পূর্বে মৃত্যু ঘটেছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যসদৃশ চেহারা রঘুনাথের।

কিন্তু আশ্চর্য, হেমাঙ্গিনীর এতটুকুও ভয় করে না। অবাক কৌতূহলে সেই কৃষ্ণকায় দৈত্যের দিকে চেয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করে, এ আবার কে ?

ও রঘু। আমাদের ভৃত্য।

রঘুও প্রভুর পাশে দণ্ডায়মান ছোট কিশোরী হেমাঙ্গিনীকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল। তারও মনের ভাবটা যেন, ইনি আবার কে ?

স্ত্রীর মত ভৃত্যের নিঃশব্দ কৌতূহলটাও সুমন্ত রায় মিটিয়ে দিলেন। বললেন, তোর গিন্নী-মা রঘু !

গিন্নী-মা কথাটা শুনে ফিক করে হেসে ফেলেছিল হেমাঙ্গিনী।

রঘুনাথ তখন তার প্রভু-পত্নীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানাচ্ছে।

এতটুকু রোগা ছোটখাটো দেখতে হেমাঙ্গিনী। পাখীর মতই যেন ডানা মেলে ফুর ফুর ক'রে এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কার্যব্যাপদেশে দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই সুমন্ত রায়কে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। যে সময়টা গৃহে থাকেন, সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখেন কিশোরী স্ত্রীকে।

রূপ তো নয়, যেন চলন্ত একটি আগুনের শিখা।

রাত্রে পাখীর ছানার মত দুহাতে স্বামীর গলা আঁকড়ে তাঁর বিশাল বক্ষের মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমোয় হেমাঙ্গিনী।

একদিন সুমন্ত রায় ঠাট্টা করে বলেন, রাত্রে বুঝি খুব ভয় করে ?

ভয় ? কে বললে ?

তবে অমনি করে আঁকড়ে ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমোও কেন ?

ধ্যেৎ, তা কেন হবে ?

তবে ?

ও আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে।

অভ্যাস হয়ে গিয়েছে !

হ্যাঁ, দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে রাত্রে ঘুমোতাম যে !

দাদুর জন্য বুঝি মন-কেমন করে ?

এবারে ছলছল করে ওঠে হেমাঙ্গিনীর দুটি চক্ষু।

ঐ দেখ, চোখে জল এসে গেল বুঝি অমনি পাগলীর ?

হ্ঁ, বলেছে তোমাকে !

কাঁদে না, কাঁদে না—একদিন নিয়ে যাবো।

সুমন্ত রায় স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু সেই একদিন আর নয় বছরেও হয়ে ওঠেনি। এবং দশ বছর পরে সত্যি সত্যি যখন সেই দিন এলো, স্ত্রীকে নিয়ে নাওয়ে চেপে কাটোয়া যাত্রা করলেন সুমন্ত রায়, দিন কুড়ি বাদেই আবার ফিরে আসবেন বলে। আর ফিরতে পারেননি হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে।

সঙ্গে অবিশ্যি এনেছিলেন বটে, তবে সে হেমাঙ্গিনী নয়, তার সেই ছোট বোন রাধারাণীকে।

ডি'ভ্যালো। শয়তান হার্মাদ ডি'ভ্যালো।

বুকের রক্ত যেন নিদারুণ অপমান ও আক্রোশের জ্বালায় ছল্‌কে ছল্‌কে ওঠে।

নটা বৎসর যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে !

সেদিনকার সে কিশোরী হেমাঙ্গিনী আজ পূর্ণ-যৌবনা হেমাঙ্গিনী। কিশোরীর সেদিনকার সদ্যস্ফুটনোন্মুখ রূপবহ্নি আজ সহস্র শিখায় শিখায় যেন প্রদীপ হয়ে উঠেছে।

চেয়ে চেয়ে সুমন্তনারায়ণের যেন আশ মেটে না। মুর্শিদাবাদের নবাবের রঙমহালেও বুঝি ও রূপ নেই।

সংসার তেমনি আছে। আজো হেমাঙ্গিনীর কোন সন্তানাদি হয়নি। রঘুনাথ ইতিমধ্যে বিবাহ করেছিল, কিন্তু তার স্ত্রী মারা গিয়েছে সাত বৎসরের একট শিশু কালীচরণকে রেখে।

সাত বৎসরের বালক কালীচরণ হেমাঙ্গিনীর বড় প্রিয়। মাতৃহারা বালককে হেমাঙ্গিনী সত্যি প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করতেন।

নিঃসন্তান হেমাঙ্গিনী যেন কার কাছে শুনেছেন সাতগাঁর সিংহবাহিনীকে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে পুত্র কামনা করলে ব্যর্থ হয় না সে প্রার্থনা।

একদিন রাত্রে হেমাঙ্গিনী স্বামীর কাছে নিবেদনটি পেশ করলেন। সাতগাঁয় গিয়ে সিংহবাহিনীর পূজা দেবো।

কেন গো !

পুরুষমানুষ তুমি, তা শুনে তোমার প্রয়োজনটা কি ! বলে রহস্যপূর্ণ হাসি হাসলেন হেমাঙ্গিনী।

মঙ্গলকাব্যের কথা ঃ

> এই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষিস্থান।
> জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম ॥
> সেই গঙ্গা-ঘাটে পূর্বে সপ্তঋষিগণ।
> তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ ॥
> তিন দেবী একস্থানে একত্র মিলন।
> জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম ॥

তা ছাড়া আদিবাস সমন্তনারায়ণের ঐ সপ্তগ্রাম, সাতগাঁ। পৈতৃক ভিটার হয়তো কিছুই নেই, তবু একবার ঘুরে আসতেই বা ক্ষতিটা কি।

সর্দার মাঝি মুকুন্দকে ডেকে সমন্ত রায় বললেন, ডিঙ্গা সাজাও। সাতগাঁয় যাবো মুকুন্দ।

হেমাঙ্গিনীর মনে আনন্দ যেন টলমল করতে থাকে। সিংহবাহিনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে পুত্রবতী হবে সে। এই শূন্য ঘর-দুয়ার আর ভালো লাগে না।

শিশুর কলকাকলীতে ভরে উঠবে গৃহ। টলমল পায়ে সারা আঙ্গিনাময় হাঁটি হাঁটি পা পা করে বেড়াবে শিশু। স্বপ্ন দেখেন হেমাঙ্গিনী।

শুভ দিন শুভ লগ্ন দেখে পূর্ণ কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি দিয়ে মঙ্গলাচরণ করে হেমাঙ্গিনী স্বামীসহ সপ্তগ্রাম যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

রঘুনাথ এসে দাঁড়ালো সামনে, দেরি করবেন না তো মা ?

না রে না, যাবো আর আসবো।

সমন্তনারায়ণ মনে মনে স্থির করেছেন, সপ্তগ্রামে গিয়ে সিংহবাহিনীর পূজা দিয়ে ফিরবার পথে একেবারে কাটোয়া হয়ে ফিরবেন।

দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে অবশেষে সকলে এসে সপ্তগ্রামের কাছাকাছি পৌঁছলেন।

সামান্যই আর পথ বাকী। হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে বেতোড়ে নোঙ্গর ফেললেন সমন্ত রায়। রাত্রের মত সেখানে বিশ্রাম করে পরের দিন প্রত্যূষে আবার যাত্রা করবেন।

দূরে দেখা যাচ্ছে পর্তুগীজদের দুখানি জাহাজ নোঙ্গর ফেলে রয়েছে। ঘাঁটি বসেছে।

দরমা আর হোগলা দিয়ে আটচালা তুলে বেতোড়ের হাটে তাদের মাল বেচাকেনা চলছে।

হেমাঙ্গিনীর শখ হলো হাট দেখবেন তিনি। ঝালর চাদর আর ওড়না কিনবেন তিনি হাট থেকে।

হেমাঙ্গিনীকে হাট দেখাতে নিয়ে চললেন সমন্ত রায়।

হাটে ঘুরছে সব পর্তুগীজরা। ইয়া দৈত্যের মত বিশাল চেহারা, লাল মুখ, তামাটে গোঁফ-দাড়ি, পিঙ্গল চোখের তারা, বিচিত্র ঝলমলে পোশাক গায়ে, মাথায় অদ্ভুত টুপি সব শোলার।

কৌতূহলী হেমাঙ্গিনী শুধালেন, ওরা কে গো ?

পর্তুগীজ ক্রেস্তান,—

হার্মাদ ?

হ্যাঁ।

ওরাই হার্মাদ ? লুট করে বেড়ায় ?

করতো তবে এখন আর করে না। অবিশ্যি শুনেছি বাগে পেলে ছাড়েও না।

শয়তান!

হাট গমগম করছে। বেচা-কেনা চলেছে।

স্ত্রীর চাপা কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকালেন সুমন্ত রায়।

ঐ হার্মাদটা আমার দিকে কেমন করে চেয়ে আছে দেখছো!

ভয় করছে নাকি?

ভয়! হেমাঙ্গিনী অপূর্ব ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকালেন স্বামীর দিকে। তাঁর স্বামীরও লম্বা-চওড়া চেহারা। বিরাট বক্ষপট।

আরো কিছুক্ষণ হাটের এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে হেমাঙ্গিনী হাতভর্তি লাল নীল সবুজ সাদা বেলোয়ারী চুড়ি কিনলেন, ঠোঙাভর্তি লাল মরিচ। মিঠা লাল মরিচ। তারপর ফিরে এলেন ডিঙ্গায়।

নদীর জল রাঙা করে তখন সূর্য পাটে বসেছে।

মুখে যাই বলুক হেমাঙ্গিনী, বুকটার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর কিন্তু কাঁপছিল। শিরশির করছিল।

কাটোয়ার পাশের বাড়িতে মোক্ষদা পিসীর পূর্ববঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। তার কাছে ঐ হার্মাদদের কত কাহিনী শুনেছেন হেমাঙ্গিনী ছোটবেলায়।

মোক্ষদা পিসী একটা গান গাইতেন। মনে পড়ে না স্পষ্ট চরণগুলো। তবে কিছু কিছু মনে পড়ে আজও।

মনে রাখিও গো মনে রাখিও
অভাগিনীরে—
ঘাটেতে রইল পড়িয়া
কলসী আমার রে।
ছুঁইয়ো রে ছুঁইয়ো আমার কঙ্কণ আর কলসীরে
পরাণ আমার জুড়াইবে রে
ওরে অভাগিনী রে॥

ডিঙ্গির জানালাপথে কৌতূহলী হেমাঙ্গিনী চেয়ে চেয়ে দেখেন দূরে নোঙ্গর করা পোর্তুগীজদের জাহাজগুলো।

হ্যাঁগা, ওই সব জাহাজ কোথায় কোথায় যায়?

অনেক অনেক দূর, সুমন্তনারায়ণ বলেন, চোল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, সিংহল কত কত জায়গায়।

॥ ৫ ॥

তারপর নদীর জলে কালো পক্ষ বিস্তার করে ঘন হয়ে এলো রাত্রির কালো অন্ধকার। ডিঙ্গির গায়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ছল ছল ছলাৎ নদীর ঢেউ। কালো আকাশটার গায়ে একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠছে। কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত। চাঁদ উঠতে অনেক দেরি।

ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়। আহারাদি সেরে শয্যায় আশ্রয় নেন

সমন্তনারায়ণ ও হেমাঙ্গিনী ডিঙ্গির ভেতরেই। শেষ রাত নাগাদ ছাড়লে ভোর ভোর গিয়ে ত্রিবেণীর ঘাটে পৌঁছতে পারবেন, তারপর সিংহবাহিনীর পূজো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

হেমাঙ্গিনী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন স্বামীর পাশে। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হলো একটা বন্দুকের গুলির শব্দে ও সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা মনুষ্যকণ্ঠের তীক্ষ্ন আর্তনাদ।

বন্দুকের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আর্তকরুণ শব্দটাও মিলিয়ে গেল।

প্রথমটায় ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি সুমন্ত রায়। নিদ্রার মধ্যে যেন একটা ধাক্কা খেয়েই ধড়ফড় করে উঠে বসেছিলেন শয্যার উপরে।

সেই শব্দে হেমাঙ্গিনীরও নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল।

নাওয়ের কামরার মধ্যে ঝুলন্ত বাতিটা দুলছে।

বোবা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন হেমাঙ্গিনী সম্মুখে উপবিষ্ট স্বামীব মুখের দিকে।

ঠিক সেই সময় ঝুপ করে জলের মধ্যে কি একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ হলো, নাওটা দুলেও উঠলো. মনুষ্যকণ্ঠের একটা ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল ঃ হুজুব. হার্মাদ ! হার্মাদ—

হার্মাদ !

মুহূর্তের জন্য বুঝি সুমন্ত রায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, পরক্ষণেই শয্যাব তলা থেকে পাকা বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে কামবার বাইরে চলে গেলেন।

আকাশে কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদ। সেই চাঁদের ম্রিয়মাণ আলোয় দেখলেন, কোথায তীর. কোথায় নোঙ্গর। তরী মাঝ-দরিয়ায় দুলতে দুলতে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। আব নাওয়ের পাটাতনের উপরে রক্ত ভেসে যাচ্ছে। আর সেই রক্তের মধ্যে সর্দার মাঝি মুকুন্দব নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে।

তারপরই আবার চোখ তুলতে সুমন্ত রায়ের চোখে পড়লো, হাত-তিনেকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মত তিনজন পর্তুগীজ। হার্মাদ ! চাঁদের আলো তাদের পোশাকের জরির কাজের উপর, অভ্রের চুমকির উপর পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে।

প্রথম পর্তুগীজের হাতে একটা বন্দুক।

হাতের লৌহকঠিন মুঠিটা সুমন্ত রায়ের তেলপাকানো বাঁশের লাঠিটার উপর শক্ত হয়ে উঠলো বারেকের জন্য বুঝি, চোখের কালো মণি দুটো আক্রোশে ও জিঘাংসায় ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে। তারপরই হাতের লাঠিটা এক পাক ঘুরিয়ে মাথার উপর তোলবার আগেই বন্দুকের মুখে অগ্নিঝলক দেখা দিল।

দুড়ুম করে একটা গুলির শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠিটা দু ভাগ হয়ে একটা ভাগ ছিটকে গিয়ে নদীর জলে পড়লো।

তবু নিরস্ত হলেন না সুমন্ত রায়। ভাঙা অর্ধেক লাঠিটা নিয়েই সামনের পর্তুগীজটার উপর যেন সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেই সময় একটিমাত্র শব্দ কানে এসেছিল সুমন্ত রায়ের ঃ ডি'ভ্যালো!

সুমন্ত রায় একাকী, প্রতিপক্ষ দু'জন পর্তুগীজ। ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো সেই নাওয়ের পাটাতনের উপরেই। স্রোতের মুখে নাও দুলতে লাগলো। তারপরই বাম বাহুতে তীক্ষ্ণ একটা অস্ত্র কি বিদ্ধ হতেই একটু বেসামাল হয়ে পড়লেন। আর সেই মুহূর্তে মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগলো। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন সুমন্তনারায়ণ পাটাতনের উপর। কানে এলো তাঁর তীক্ষ্ণ বাজের মত একটা উচ্চহাসির রোল। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

তারপর আর কিছু মনে নেই। বিস্মৃতি। জ্ঞান ফিরে এলো যখন, রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পূর্বাশার প্রান্তে ভোরের প্রথম আলোর চাপা রক্তাভাস। মুকুন্দর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটার পাশে তিনি পড়ে আছেন।

নাও স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। সমস্ত চিন্তাশক্তি বিশৃঙ্খল এলোমেলো।

ধীরে ধীরে উঠে বসতে গিয়ে বাম হাতটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো। দেখলেন বাম হাতের উপরিভাগে একটা ক্ষতস্থান দিয়ে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

সহসা ঐসময় প্রথম যে প্রশ্নটা মাথার মধ্যে উঁকি দিল, হেমাঙ্গিনী! হেমাঙ্গিনী—হেমাঙ্গিনীর কিছু হয় নি তো?

নাওয়ের কামরার মধ্যে ছুটে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এ কি! কামরা শূন্য। হেমাঙ্গিনীর চিহ্নমাত্রও নেই। কেবল বিস্রস্ত এলোমেলো শয্যাটার উপর ভগ্ন বেলোয়ারী চুড়ির লাল, নীল, সবুজ টুকরোগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে।

হেমাঙ্গিনী! হেমাঙ্গিনী! চিৎকার করে ডেকে উঠলেন সুমন্ত রায়।

নেই—হেমাঙ্গিনী নেই!

আবার কামরার বাইরে নাওয়ের পাটাতনের উপর এসে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ। পাগলের মতোই বৃথা চিৎকার করে উঠলেন আবার, হেমাঙ্গিনী! হেমাঙ্গিনী!

কিন্তু কোথায়? কোথায় হেমাঙ্গিনী? হেমাঙ্গিনী নেই! নাওটা শুধু স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে।

পরের দিন প্রত্যূষে নাওটা স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে এসে লাগলো সুতানটির হাটে।

দুদিন ধরে সুতানটির হাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন বিভ্রান্তের মত সুমন্তনারায়ণ। পর্তুগীজরা এখান থেকে সেখান থেকে লুঠ করে ছেলেমেয়েদের ধরে এনে আর্মেনিয়ানদের হাতে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রয় করে।

সেদিন ছিল হাটবার, বেচাকেনাও চলছিল।

সারাটা দিন অভুক্ত অস্নাত সুমন্ত রায় হাটের এদিক ওদিক যেন উদ্ভ্রান্তের মতই ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। হেমাঙ্গিনী—তাঁর হেমাঙ্গিনী হারিয়ে

গিয়েছে!

কোথায় গেল হেমাঙ্গিনী? কোথায় গেল?

পরের দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাটে এসে বসলেন। সামনেই ভাগীরথীর স্রোতধারা কুলকুল নিনাদে আপন মনে বয়ে চলেছে। বসে থাকতে থাকতে সহসা সুমন্তনারায়ণের দু চোখের কোল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।

হেমাঙ্গিনী! তাঁর হেমাঙ্গিনী! তাঁর সোনার প্রতিমা! তাঁর হৃদয়-আলো-করা প্রদীপ্ত রূপবহ্নি!

তিনদিন পরে আবার মাঝিমাল্লা সংগ্রহ করে নাও ভাসালেন ভাগীরথী-বক্ষে সুমন্তনারায়ণ।

চারদিনের দিন গভীর রাত্রে সুমন্ত রায়ের নাও এসে কাটোয়ার ঘাটে ভিড়লো। এক আধ দিন নয়, সুদীর্ঘ নয় বৎসর পরে সুমন্ত রায় কাটোয়ার মাটিতে পা দিলেন। সুদীর্ঘ এই নয় বৎসরে অনেক অনেক অদল-বদল হয়ে গিয়েছে।

তবু হরিহর সার্বভৌমের কুটির চিনে নিতে সুমন্তনারায়ণের খুব কষ্ট হয়নি। মধ্যরাত্রে এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিলেন সুমন্ত রায়।

একটু পরেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। প্রদীপ হাতে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী প্রশ্ন করে, কে?

সেই কণ্ঠস্বর শুনে প্রদীপের আলোয় সেই কিশোরীর মুখখানির দিকে চেয়ে যেন সহসা চমকে উঠেছিলেন সুমন্ত রায়। বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠে-ছিলেন, কে? হেমাঙ্গিনী?

পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো কিশোরীর কণ্ঠস্বরে, কে! কে আপনি?

তুমি কে?

আমি রাধারাণী।

রাধারাণী!

পরে একদিন রাধারাণী বলেছিল, মাগো, সে কি চেহারা তোমার! এক-মাথা রুক্ষ চুল। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এই বিরাট চেহারা। ভয়ে তখন আমার গলা শুকিয়ে ওদিকে কাঠ! ডাকাত না কে গো! দাদুকে যে চিৎকার করে ডাকবো তাও মনে পড়ে না।

খুব ভয় পেয়েছিলি বুঝি? হাসতে হাসতে সুমন্তনারায়ণ শুধিয়েছিলেন।

ভয় হবে না? যে ভূতের মত চেহারা সে সময় তোমার!

তা বটে।

সুমন্ত রায় কি আর তখন নিজের মধ্যে নিজে ছিলেন!

তা ওখানে গিয়েছিলে কেন? আবার শুধিয়েছিল রাধারাণী।

নইলে তোকে পেতাম কি করে?

হুঁ! আমি বুঝি না, না? সব তোমার চালাকি!

তবে ধরে ফেলেছিলি বল্‌?

নিশ্চয়ই।

নয় বছর পরে দেখা তো, তাছাড়া হেমাঙ্গিনীর বিয়ের সময় কতই বা বয়স ছিল রাধারাণীর! মাত্র তো চার বছর তখন তার বয়স। চিনবে সে কেমন করে তার দিদি হেমাঙ্গিনীর স্বামী সুমন্ত রায়কে।

তাই সুমন্ত রায়কেই সেরাত্রে পরিচয় দিতে হয়েছিল। বলেছিলেন, এটাই তো সার্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি?

হ্যাঁ।

তুমি তাঁর কে?

পৌত্রী।

তিনি কোথায়? গৃহে নেই?

আছেন। পূজার ঘরে বসে গীতাপাঠ করছেন।

এত রাত্রে!

প্রতি রাত্রেই তো করেন।

হুঁ। আচ্ছা তাঁকে—তাঁকে বলো গিয়ে—বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন সুমন্ত রায়।

কি বলবো?

বলো গিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে সুমন্তনারায়ণ এসেছেন।

কৌতূহলে তাকাল রাধারাণী আবার সুমন্তনারায়ণের মুখের দিকে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, তুমি রায়মশাই!

হ্যাঁ।

তুমি একা এলে, দিদি আসেনি?

না।

পৌত্রী রাধারাণীর মুখে সুমন্তর আগমন-সংবাদ পেয়ে অধ্যয়নরত হরিহর মুখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, সে কি রে!

হ্যাঁ, দাদু। দেখবে চলো না. বলেই রাধারাণী নাকি হেসে ফেলেছিল ফিক্ করে।

হাসছিস যে দিদি!

মাগো, তোমার নাতজামাই কি কুচ্ছিত দাদু! একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভূতের মত চেহারা। ডাকাতি করে বুঝি?

দূর পাগলী! বলে হেসে উঠেছিলেন হরিহর।

তারপরই শশব্যস্তে বলে ওঠেন, কিন্তু তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস কেন? যা, যা—ভিতরে ডেকে নিয়ে আয়!

রাধারাণী বলেছিলেন, যেতে হয় তুমি যাও।

নারায়ণ, নারায়ণ। বলতে বলতে উঠে খড়ম পায়ে খট্ খট্ শব্দ তুলে সুমন্তনারায়ণকে ডাকতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সার্বভৌম।

সার্বভৌম এসে সামনে দাঁড়াতেই নীচু হয়ে পদধূলি নিলেন সুমন্ত রায়

দাদাশ্বশুরের।

এসো, এসো। কল্যাণ হোক।

একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন নাতজামাইকে।

তার পর? হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন? কত দিন দেখিনি দিদিকে। সেই যে বিবাহ করে নিয়ে গেলে—

সুমন্ত রায় নিশ্চুপ, যেন পাথরের মতই বসে আছেন। ঘরের প্রদীপের আলোটা ঘরের মাটির দেওয়ালের উপরে প্রতিফলিত করেছে সুমন্ত রায়ের দীর্ঘ ছায়াটা। ছায়াটা পর্যন্ত নড়ছে না।

ঘরে ঢোকেনি রাধারাণী। জানালার ওপাশ থেকে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তখনো দেখছিল সুমন্ত রায়কে। চার বছর বয়স যখন তার, সেই সময় নাকি দিদি হেমাঙ্গিনীকে ঐ লোকটা বিবাহ করে নিয়ে চলে যায়। সে কতদিনের কথা! দিদির মুখটাও আজ স্পষ্ট মনে নেই রাধারাণীর।

দিদি হেমাঙ্গিনী নাকি দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। তাকে লোকেরা বলে সুন্দর, কিন্তু তার চাইতেও নাকি দিদি অনেক বেশী সুন্দরী ছিল।

সেই দিদির স্বামী ঐ সুমন্ত রায়, রায়মশাই! ভারি রাগ হয় রাধারাণীর লোকটার উপরে। কেন দিদিকে তার সঙ্গে নিয়ে এলো না? নিয়ে এলে কেমন দিদিকে দেখতে পেতো!

হঠাৎ আবার হরিহরের কণ্ঠস্বর কানে এলো রাধারাণীর।—সুমন্ত, হেমাঙ্গিনী ভালো তো?

সুমন্তনারায়ণ ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকালেন হরিহরের দিকে।

হেমাঙ্গিনী নেই।

সে কি! নেই মানে?

নেই।

মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ! যেন হঠাৎ চমকে উঠলেন সুমন্ত রায়। তারপর পাথরের মত কঠিন কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, হ্যাঁ।

কিন্তু কি—কি হয়েছিল তার? ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তাকান সার্বভৌম নাত-জামাইয়ের দিকে।

হঠাৎ ঐ সময় যেন কেমন ভয়-ভয় করতে থাকে রাধারাণীর। জানালার কাছ থেকে সরে যায়।

নিম্নকণ্ঠে সুমন্ত রায় তখন যেন কি বলছেন হরিহরকে।

রাধারাণীর সেকথা শোনবার আর কোন স্পৃহাই ছিল না।

॥ ৬ ॥

মাত্র দু দিন ও দু রাত্রি সুমন্ত রায় শ্বশুরালয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় দিন সকালে রাধারাণী যেই হেমলতার সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে গিয়েছে, সেই সময় শুনলো সেই কথাটা।

তার নাকি সেইদিন সন্ধ্যালগ্নে বিবাহ।

হেমলতা ডাকে, সই!

কিলো সই?

তোর যে আজ বিয়ে!

ওমা তাই নাকি সই?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে রে? তোর সঙ্গে বুঝি?

মরণ।

খিল খিল করে হেসে ওঠে রাধারাণী।

বরটি কে জিজ্ঞাসা করলি না?

কেন তুই!

মরণ! আমি কেন, বর যে তো ঘরেই—

ঘরেই! এবারে অবাক হবার পালা রাধারাণীর।

রায়মশাই রে! তোর রায়মশাই!

এবারে রাধারাণী বলে, মরণ!

সত্যি সত্যি সেইদিন সন্ধ্যালগ্নে সুমন্ত রায়ের সঙ্গেই বিবাহ হয়ে গেল রাধারাণীর।

রাধারাণী যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে ঠিক কি হলো রাধারাণী যেন সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারে না।

চিরদিনের ডানপিটে জেদী একগুঁয়ে রাধারাণী সত্যিই যেন বিস্ময়ে ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল।

পাড়া-প্রতিবেশীরা কানাকানি করে, এ কেমন ধারা বিয়ে গো! আলো নেই, বাদ্যি নেই, লোক নেই, জন নেই!

সম্প্রদানের সময় দৈত্যের মত বিরাট পুরুষটি তাঁর বাঘের মতই চওড়া থাবা দিয়ে ফুলের মত নরম রাধারাণীর এতটুকু হাতের পাতাটি মুঠি করে ধরে যখন মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন, ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু—রাধারাণী তখন যেন পাথরের মতই ঠাণ্ডা জমাট বেঁধে গিয়েছে। সমস্ত অনুভূতি অসাড় নিস্পন্দ। পৌষের হাড়-কাঁপানো শীত তখন, তবু সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে।

গাঁটছড়া বেঁধে রাধারাণী স্বামীর পিছনে পিছনে বাসরঘরে এসে ঢুকলো অবশ পা দুটো টেনে টেনে।

বাকী রাতটুকু সারাটা ক্ষণ কেটে গেল তার ঘরের কোণে পিলসুজের উপরে টিম্‌টিমে সোহাগ-প্রদীপটির দিকে চেয়ে চেয়ে।

পরের দিনের রাতটা কালরাত্রি। রাধারাণী দাদুর পাশে শুয়েই কাটিয়েছিল।

এবং পরের দিন সন্ধ্যার দিকে সুমন্ত রায় তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী রাধারাণীকে নিয়ে নৌকায় উঠে বসলেন।

আবার মুর্শিদাবাদ।

আর দশজন সদ্যবিবাহিতা মেয়ের মত প্রথম শ্বশুরালয় যাবার প্রাক্কালে কিন্তু আশ্চর্য, কাঁদেনি রাধারাণী!

কেন যেন তার চোখের কোলে এক ফোঁটা অশ্রুও ছিল না। এমন কি যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে হরিহর যখন রাধারাণীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, তখনও তার চোখে এক ফোঁটা অশ্রু আসেনি।

সইয়ের দল সরমা হেমলতা প্রভৃতি এতদিনের খেলার সঙ্গিনীরা ঘাট পর্যন্ত ওদের পিছনে পিছনে এসেছিল রাধারাণীকে বিদায় দিতে। তাদের কারো দিকে একটি বারের জন্যও ফিরে তাকায়নি রাধারাণী।

চলন্ত একটা প্রাণহীন কাঠের পুতুল যেন, সাড়া নেই, বেদনা নেই, অনুভূতি নেই, হাসি নেই, অশ্রু নেই। সমস্ত মুখখানি জুড়ে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য। ধীর নিঃশব্দ পায়ে স্বামীর পিছনে পিছনে এসে উঠেছিল রাধারাণী নৌকার উপরে।

ভাগীরথীর জলে অত্যাসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

চারিদিকে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে কেমন যেন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা। মৌন বিষণ্ণতা। তারপর একসময় নৌকা ছেড়ে দিল।

নৌকার ভিতরে বসে ছোট জানালাটা দিয়ে যতক্ষণ গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ হরিহর সার্বভৌমকে দেখা যায় চেয়ে ছিল রাধারাণী।

ক্রমে ক্রমে চেনা জায়গা ও তীরভূমিটা সন্ধ্যার ঘনায়মান বিষণ্ণ আলোয় একটু একটু করে অস্পষ্ট দৃষ্টিপথ থেকে নিঃশব্দে মুছে গেল।

এর পর জলের দিকে তাকালো রাধারাণী। শীতের নদী শান্ত নিস্তরঙ্গ। বিষণ্ণ ক্লান্তিতে যেন শিথিল দেহ এলিয়ে পড়ে আছে।

পাল তুলে তর তর করে সুমন্ত রায়ের নৌকা ভেসে চলেছে।

ক্রমশ অন্ধকারে চারিদিক দৃষ্টির সামনে থেকে মুছে যায়। ঘনিয়ে আসে রাত্রি কালো ডানা মেলে।

আসবার সময় হরিহর একটা মাটির হাঁড়িতে কিছু দধি, মিষ্টান্ন ও পক্ক রম্ভা ও কিছু পিঠে দিয়ে দিয়েছিলেন—রাত্রে ক্ষুধা পেলে আহার করবার জন্য।

রাধারাণী তখনো জানালা-পথে বাইরের অন্ধকারে জলের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। ছল্ ছল্ ছল্ কেমন যেন একটা ক্লান্ত শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সহসা স্বামীর ডাকে ফিরে তাকালো রাধারাণী।

রাত হলো, কিছু খেয়ে নিয়ে এবারে শুয়ে পড়ো। স্বামী বললেন।

কামরার মধ্যে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় স্বামী সুমন্ত রায়ের মুখের দিকে আজ দুদিন পরে সর্বপ্রথম ভালো করে তাকালো রাধারাণী।

দিদির স্বামী রায়মশাই নয়, তার স্বামী। পিঙ্গল দুটো চোখের তারা। নির্নিমেষে চেয়ে আছে ওরই মুখের দিকে নিঃশব্দে।

কেমন যেন সহসা শিরশির করে ওঠে রাধারাণীর দেহের মধ্যে।

খড়্গের মত তীক্ষ্ণ উঁচু নাসা। প্রশস্ত ললাট। স্কন্ধের দু পাশে গুচ্ছে গুচ্ছে তৈলসিক্ত বাবরি চুল নেমে এসেছে। বিরাট বক্ষ, বৃষস্কন্ধ। মেরজাইয়ের উপরে রেশমের উড়ুনি।

রাত হলো, কিছু খেয়ে নিয়ে এবারে শুয়ে পড়ো। স্বামী আবার বললেন।

রাধারাণী কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আরো দু'একবার বললেন সুমন্ত রায় কিছু খাবার জন্য, কিন্তু রাধারাণী সাড়া দেয় না।

সুমন্ত রায়ও কিছু খেলেন না। শয্যায় গা ঢেলে দিলেন।

দু রাত্রি পর পর চোখে ঘুম নেই। কানে আসছে একটানা ঢেউয়ের ছল্ ছল্ শব্দ। অনিদ্রার ক্লান্তি, তার উপরে নৌকার মৃদু-মন্দ দুলুনি, কখন যে এক সময় রাধারাণীর দুচোখের পাতায় নিদ্রার ঢুলুনি এসেছিল, টেরও পায়নি সে। এক সময় শয্যার পাশে গা এলিয়ে দিয়েছিল।

সহসা একটা বিজাতীয় স্পর্শে, মৃদু আলিঙ্গনের পীড়নে ঘুমটা ভেঙে যেতে রাধারাণী ধড়ফড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই বাধা পেল।

সুমন্ত রায়ের বিশাল বলিষ্ঠ দুটি বাহু-আলিঙ্গনের মধ্যে রাধারাণী বাঁধা পড়েছে।

কামরার মধ্যে সেই আলোটা তখনো জ্বলছে। তারই আলোয় নৌকার ভিতরে একটা মৃদুমন্দ আলো-ছায়ার রহস্য।

অতর্কিতে ঘুম ভেঙে গেলেও ঘুমের বিন্দুমাত্রও আর তখন চোখে ছিল না।

সেই আলো-ছায়ার মধ্যে সুমন্ত রায়ের পিঙ্গল চোখের তারা দুটো যেন কি এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে।

রাধারাণী শরীরটাকে তার এঁকিয়ে বেঁকিয়ে আবার সেই বলিষ্ঠ বাহু-বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে করে ফল হলো ঠিক বিপরীত। বাহুর বেষ্টনীটা আরো একটু নিবিড় হয়ে চেপে ধরে যেন তাকে।

এবারে আর গায়ের জোরে সেই বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল না রাধারাণী। বেষ্টনকারীর দক্ষিণ বাহুর যে নিম্নাংশটা একেবারে তার মুখের কাছটাতেই ছিল, মুখটা একটু নীচু করে বাহুর সেই অংশে কামড়ে দিয়ে একেবারে তার ধারালো দুটো দাঁত বসিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃঢ় বেষ্টনী শিথিল হয়ে এলো।

সুমন্ত রায় তাঁর বাহুবেষ্টনী আলগা করে দিতেই রাধারাণী যেন ছিটকে খানিকটা দূরে সরে গেল। তীক্ষ্ণ অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো স্বামীর মুখের দিকে রাধারাণী।

এত জোরে দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়েছিল রাধারাণী সুমন্তনারায়ণের বাহুতে যে, দুটো দাঁত পুষ্ট বাহুর পেশীতে একেবারে বসে গিয়েছিল। রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছিল সেই ক্ষতস্থান থেকে।

সুমন্ত রায়ের পিঙ্গল চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে ছিল রাধারাণীর

মুখের দিকে।

হঠাৎ রাধারাণীর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে।

বাঘের মত ঐ বিশাল কঠিন থাবা দিয়ে যদি এখনই তার গলাটা টিপে ধরে লোকটা!

পিঙ্গল চোখের তারা দুটো যেন আক্রোশে নীল আগুন ছড়াচ্ছে।

কিন্তু না। কিছুই করেননি সেদিন সুমন্তনারায়ণ।

ধীরে ধীরে পিঙ্গল চোখের নীল আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ চাপা হাসিতে সেই মুখখানা ভরে গিয়েছিল।

প্রায় দীর্ঘ পনের দিন লেগেছিল সুমন্ত রায়ের বাহুর সেই ক্ষতস্থান ভাল করে শুকোতে। এবং ক্ষত শুকিয়ে গেলেও ক্ষতের দাগটা কিন্তু আর কোন-দিনই মিলায়নি সুমন্তনারায়ণের দক্ষিণ বাহু থেকে।

একটা কৃষ্ণবর্ণ চক্র-চিহ্নের মত বরাবর সেই দাগটা থেকে গিয়েছিল সুমন্তনারায়ণের দক্ষিণ বাহুর নিম্নাংশে আমরণ। এবং পরবর্তীকালে মধ্যে মধ্যে বাহুর সেই কৃষ্ণ চক্র-চিহ্নটি দেখিয়ে সুমন্তনারায়ণ রাধারাণীকে বলতেন, রাক্ষুসী দেখেছিস, সেরাত্রের তোর দাঁতের দাগ এখনো মিলোয়নি!

রাধারাণী হেসে জবাব দিয়েছে, বেশ হয়েছে। কেন হাত দিতে গিয়েছিলে আমার গায়ে চোরের মত!

চোরের মত?

নয়! ঘুমিয়ে ছিলাম আর তার মধ্যে—

সত্যি! সুমন্তনারায়ণ কোনদিনই স্ত্রীকে বলতে পারেননি। হঠাৎ সে রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে নৌকার মধ্যে মিটিমিটি আলোয় রাধারাণীর কোমল ঘুমন্ত শিথিল দেহটার দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল তাঁর। লোভী মনটা হঠাৎ থাবা মেরেছিল তাই।

কি করবো বল্, তোর নরম তুলতুলে দেহটা যেন মনের মধ্যে কেমন একটা ক্ষিধে জাগিয়ে তুললো।

সহসা ঐ সময় রাধারাণী স্বামীর বলিষ্ঠ হাতটা টেনে নিয়ে সেই কৃষ্ণ চক্র-চিহ্নটির উপরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, খুব রেগে গিয়েছিলে সেদিন নাগো!

তোর কি মনে হয়? স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতেন সুমন্তনারায়ণ।

আমার? হাতটা তোমার কামড়ে দেবার পর আমার বুকের মধ্যে তখন কি কাঁপুনি। এই বুঝি তুমি আমাকে এক চড় বসিয়ে দেবে!

প্রত্যুত্তরে সুমন্তনারায়ণ রক্তাভ ডালিমের মত রাধারাণীর নরম গালটি দু আঙ্গুলে টিপে দিতে দিতে বলতেন, হারামজাদী, রাক্ষুসী!

॥ ২ ॥

বর্গী

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল
বরগির নাম শুইনা সব পলাইল ॥

॥ ১ ॥

মহাজনটুলীর ঘাটে এসে আব্যর একদিন সন্ধ্যার দিকে সুমন্তনারায়ণের নাও ভিড়ল। কিন্তু সেটা রবিঅল্-আওয়েল মাসও নয় আর রেবা রোশনী পর্বের দিনও নয়। পৌষের এক শীতার্ত সন্ধ্যা।

আবছা আবছা কুয়াশা চারিদিকে। ঘাট থেকে হাঁটিয়েই নিয়ে এলেন সুমন্ত রায় তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের নবপরিণীতা স্ত্রী রাধারাণীকে।

ঘোমটা টেনে আলতা-পায়ে স্বামীর পিছনে পিছনে চললেন রাধারাণী স্বামীগৃহে।

ভৃত্য রঘুনাথ অন্দরে ছিল।

রঘুনাথ!

প্রভুর ডাক শুনে ত্বরিত পদে ছুটে এলো রঘুনাথ। দরজা খুলে দিল।

আলোটা নিয়ে আয়। সুমন্ত রায় বললেন।

একটু পরেই আলো হাতে দরজার গোড়ায় আবার ফিরে এলো রঘুনাথ। সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তার অষ্টমবর্ষীয় বালক কালীচরণ।

কিন্তু আলোতে প্রভুর পার্শ্বে পরিচিত প্রভুর পত্নীর বদলে সম্পূর্ণ অপরিচিতা, মাথার উপরে অল্প-গুণ্ঠন কিশোরী রাধারাণীকে দেখে প্রথমটায় বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় রঘুনাথ।

কিশোরী রাধারাণীও তাকিয়ে ছিল, একদৃষ্টে রঘুনাথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান কালো কষ্টিপাথরের মত গাঁট্টাগোট্টা বালক কালীচরণের দিকে।

সহসা যেন এক দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কায় কিশোরী রাধারাণীর বুকের ভিতরটা শিরশির করে ওঠে। কালো কষ্টিপাথরে গড়া একটি বালক নয়, যেন একটা কুণ্ডলী পাকানো কৃষ্ণসর্প। এখনই বুঝি ছোবল হানবে!

শুধু সেই প্রথম দর্শনের দিনটিতেই নয়, তারপর বহু বার বহু রাত্রে রাধারাণী ঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখেছে, কালো কষ্টিপাথরে গড়া একটা দুঃস্বপ্ন, ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরছে। তার কণ্ঠের ওপরে প্যাঁচের পর প্যাঁচ দিয়ে তার শ্বাস রোধ করে আনছে।

হঠাৎ স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছিল রাধারাণী।

হাঁ করে পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? সর, পথ ছাড়!

তাড়াতাড়ি রঘুনাথ সরে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে।

সেই রাত্রেই। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল রাধারাণীর।

বিরাট একটা পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে ছিল রাধারাণী। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যেতে দেখলে, ঘরে আর দ্বিতীয় কোন প্রাণীই নেই। সে একা। শুধু দেওয়ালের গায়ে তখন দেওয়ালগিরির আলোর শিখাটা পিট্ পিট্ করে জ্বলছে। মৃদু আলোয় সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্ করছে।

মাথার ধারের জানালাটা খোলা। বাইরের অন্ধকার থেকে পৌষের মধ্য-রাত্রির একটা ঠাণ্ডা হাড়-কাঁপানো হাওয়া মধ্যে মধ্যে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুলছে।

টাক্‌টু, টাক্‌টু—বিশ্রী কুৎসিত একটা শব্দ করে ডেকে উঠলো অন্ধকারে বাইরে একটা তক্ষক। ঠিক তারপরই চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ওর কানে আসতেই চমকে ওঠে রাধারাণী। চাপা কণ্ঠ হলেও বুঝতে কষ্ট হয়নি রাধারাণীর। সে কণ্ঠস্বর তার স্বামীরই। এবং পাশের ঘর থেকেই শোনা গিয়েছিল সে চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

খবরদার রঘু, এ কথা যেন কোনদিনও আর শুনতে না পাই!

কিন্তু আমার মা ঠাক্‌রুণ—

বাঘের মতই যেন থাবা দিয়ে রঘুর কথাটা থামিয়ে দিলেন সুমন্ত রায়। এবং পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে বললেন, মরে গিয়েছে। ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে হুগলী নদীর তলায় তলিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মা ঠাকরুণ যে আমাদের মাছের মতই সাঁতার দিতে পারতেন। তাছাড়া এই পৌষ মাসে ঝড়—

আবার!

ইতিমধ্যে কৌতূহলী রাধারাণী পালঙ্ক-শয্যা থেকে নেমে নিঃশব্দে পায়ে পায়ে ঘরের ভেজানো কবাটটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভাল করে সব কথা শোনবার জন্য কান পেতে দাঁড়িয়েছিল।

ঠিক ঐসময় বাইরের সদরে ধাক্কা দেবার শব্দ শোনা গেল।

কে আবার এত রাত্রে এলো, দেখ তো রঘু—

দরজা খোলার শব্দ। তার পরই আবার সুমন্ত রায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এ কি, চিন্ময় রায়!

হুঁ।

এত রাত্রে কি সংবাদ?

সংবাদ অত্যন্ত অশুভ রায়মশাই।

অশুভ!

হ্যাঁ, কিছুই কি আপনি শোনেননি?

না তো!

নবাব আলিবর্দী খাঁ উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করে রাজধানীতে ফিরছিলেন, এবং যুদ্ধের বিশেষ তেমন প্রয়োজন নেই বলে বেশির ভাগ সেনানীরাই ছুটি পেয়ে কিছুদিন হলো রাজধানীতে চলেও এসেছে।

তারপর?

তারপর ক্রমশ নবাব মেদিনীপুরে পৌঁছাবার পরই শুনলেন পঞ্চকোটের পার্বত্য পথ দিয়ে রঘুজী ভোঁসলা চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ঝড়ের বেগে 'চৌথ' আদায়ের জন্য বাঙ্গলায় আসছেন—

চৌথ!

চৌথ না হাতী! আসলে হচ্ছে—মারাঠা দস্যুরা চারিদিক লুঠ করতে করতে আসছে।

তারা কতদূর পর্যন্ত এসেছে?

এখন তারা বর্ধমানে।

বলো কি!

হ্যাঁ, আজই সকালে একজন মাহুত এখানে পালিয়ে এসেছে কোনমতে প্রাণ নিয়ে। তার মুখে যা শুনলাম, সব নগর ও আশপাশের যত গ্রাম ছিল লুঠ করে আগুন জ্বালিয়ে তছনছ করে দিয়েছে বর্গীরা। যেখানে যত যুবতী সুন্দরী স্ত্রীলোক ছিল, লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। নবাব সসৈন্যে ইতিমধ্যে বর্ধমানে এসে পৌঁছেছেন বটে আজ দিন-পাঁচ-ছয় পূর্বে, তবে কিছু সুবিধা করতে পারছেন না।

কেন নবাবের পাঠান সেনাপতিরা, তারা তো শুনেছিলাম দুর্ধর্ষ সব যোদ্ধা!

তারা—চিন্ময় বাব হেসে বললেন, তারা এতদিন পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থেকে লোকদেখানো সামান্য যুদ্ধ করে মজা দেখছিল। তার পর নাকি একদিন রাত্রে নবাব তার দৌহিত্র সিরাজকে নিয়ে আফগান সেনাপতিদের শিবিরে গিয়ে হাজির হয়ে অনুনয়-বিনয় করতে তারা এখন যুদ্ধ করছে। কিন্তু হলে কি হবে, পঙ্গপালের মত মারাঠা-ইন্দুরগুলোকে রোধ করা কি এতই সোজা! বুঝলেন রাযমশাই, এ হচ্ছে পাপের ফল, বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে সর্‌ফরাজকে নিহত করে মসনদে বসেছে। ছেলেপুলে আর বেগমদের পর্যন্ত ঢাকায় পাঠিয়ে দিলে—যাবে, সব যাবে! মুর্শিদাবাদেও তারা এলো বলে—

ছেড়ে দাও ভাই ওসব কথা। দেওয়ালেরও কান আছে। নবাবের কানে কথাটা যদি ঘুণাক্ষরেও যায় তো সকলকে জ্যান্তে গোর দেবে। কিন্তু তুমি তো বড় চিন্তায় ফেলে দিলে হে চিন্ময়! এখানেও যদি সেই শয়তানরা এসে লুঠতরাজ শুরু করে দেয়—

করে দেয় কি, দেবে! বাঙ্গলাদেশকে শ্মশান করে দিয়ে তবে যাবে ওরা।

সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েন সুমন্তনারায়ণ। হার্মাদের থাবার ঘা-টা এখনো শুকোয়নি। হেমাঙ্গিনীকে হারিয়েছেন তিনি, আবার কি রাধারাণীকেও

হারাতে হবে ?

দেওয়ান আলমচাঁদের কুটিরে কাল এক মন্ত্রণা-সভা বসবে, সেখানে উপস্থিত থাকবেন। চিন্ময় রায় আবার বলেন।

যাবো।

অতঃপর চিন্ময় রায় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

একটু পরেই সুমন্তনারায়ণ শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

রাধারাণীকে শয্যার উপর জেগে বসে থাকতে দেখে বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, এ কি, তুমি ঘুমাওনি ?

এত রাত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলে ? কে এসেছিল ?

আমার একজন বিশেষ বন্ধু।

কি সব মারাঠাদের কথা বলছিল ? মারাঠারা কি হার্মাদ ?

না, না—তার পরই মৃদু হেসে স্ত্রীর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বলেন, তা হলেই বা, ভয় কি ! আমি তো আছি !

কিন্তু তার পরমুহূর্তেই রাধারাণী সুমন্তনারায়ণকে যে প্রশ্নটি করেছিল সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুমন্ত রায়ের মুখের ক্ষণপূর্বের হাসিটুকু যেন কর্পূরের মতই উবে গিয়েছিল।

আচ্ছা রায়মশাই, দিদি কি সত্যিই মারা গিয়েছে ?

ভূত দেখার মতই যেন চমকে রাধারাণীর মুখের দিকে তাকান সুমন্তনারায়ণ।

তার পর অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ।

কি হয়েছিল দিদির ? কি হয়ে মারা গেল ?

জানি না।

তবে যে একটু আগে রঘুকে বলছিলে, ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে দিদি !

ওসব কথা থাক রাধারাণী।

বল না রায়মশাই !

চুপ করবে রাধারাণী ? কেন বিরক্ত করছো ?

কথাগুলো বলে আর ঘরের মধ্যে দাঁড়াননি সুমন্ত রায়। দ্রুতপদে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এবং ঘর থেকে বের হয়ে সোজা একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসেছিলেন সুমন্তনারায়ণ। বাকী রাতটুকু গঙ্গার ঘাটেই বসেছিলেন।

নিরুপায় একটা আক্রোশের আগুন যেন বুকের ভিতরটা সুমন্তনারায়ণের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল।

হেমাঙ্গিনী ! হেমাঙ্গিনী !

কোথায় গেল হেমাঙ্গিনী, কোথায় হারিয়ে গেল ! কে জানে আজ সে কোন ধনী আর্মেনিয়ানের গৃহে ক্রীতদাসীর জীবন অতিবাহিত করছে, না কোন হার্মাদ কামোন্মত্ত পশুরই অঙ্কশায়িনী হয়েছে !

না, না, তার চাইতে হেমাঙ্গিনী মরুক। বিষপান করে, জলমগ্ন হয়ে—যেমন করেই হোক তার মৃত্যু হোক।

কিন্তু এসব কি তিনি ভাবছেন? হেমাঙ্গিনী তাঁর জীবনের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে।

রাধারাণী! রাধারাণী আজ তাঁর গৃহে। রাধারাণীই তাঁর গৃহলক্ষ্মী। তাঁর ভাবী সন্তানের জননী।

সত্যিই আশ্চর্য। রাধারাণী যেন হেমাঙ্গিনীর প্রতিচ্ছবি। চোখ কান নাক ওষ্ঠ চিবুক সব যেন একেবারে হুবহু হেমাঙ্গিনীর মতই। এমন কি কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত।

তাই তো সেদিন রাত্রে প্রদীপ হাতে দুয়ার খুলে দেবার পর রাধারাণী যখন তাঁকে শুধিয়েছিল, কে! তিনি চমকে উঠেছিলেন সেই কণ্ঠস্বর শুনে।

সশরীরে যেন হেমাঙ্গিনীই তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই রাত্রে প্রদীপটি হাতে নিয়ে।

রাধারাণী! তাঁর রাধারাণী!

উঠে আবার গৃহের দিকে চললেন সুমন্তনারায়ণ।

পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে আছে রাধারাণী।

দেওয়ালের গা থেকে দেওয়ালগিরিটা নামিয়ে সেটা হাতে করে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন সুমন্তনারায়ণ পালঙ্কের একেবারে কাছটিতে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল রাধারাণী।

হাতের আলোয় ঘুমন্ত রাধারাণীর মুখের দিকে তাকালেন।

মুদ্রিত আঁখিপল্লবের নীচে মুক্তার মতই দু বিন্দু অশ্রু তখনো চিক্ চিক্ করছে।

আশ্চর্য! ঠিক যেন হেমাঙ্গিনী।

অবিকল হেমাঙ্গিনী।

হেম! হেম—

নিদ্রিতা রাধারাণীর মুখের কাছে নীচু হয়ে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ অসতর্ক সুমন্ত রায়ের হাত থেকে দেওয়ালগিরিটা মাটিতে পড়ে গিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ঘরটা নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল।

আর সেই শব্দ মিলোবার আগেই অন্ধকারে ঘুম ভেঙে ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে উঠলো রাধারাণী, কে! কে!

শঙ্কিত বিব্রত সুমন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, আমি রাধা—
[illegible]

হাত বাড়িয়ে দিলেন অন্ধকারেই সুমন্তনারায়ণ।

অন্ধকারেই ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো রাধারাণী সুমন্ত রায়ের বিশাল বক্ষে মুহূর্তে।

থেকে থেকে তখনো কেঁপে উঠছে রাধারাণীর দেহটা সুমন্ত রায়ের বুকের

মাঝে।

সস্নেহে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সুমন্তনারায়ণ ডাকেন, রাধা, রাধারাণী !

উঁ !

॥ ২ ॥

চিন্ময় রায়ের অনুমানটা মিথ্যা হলো না।

দাবানলেরই মত কিছুদিনের মধ্যে দুঃসংবাদটা ছুটে এলো রাজধানী মুর্শিদাবাদের ঘরে ঘরে। আপামর জনসাধারণের ঘরে ঘরে।

মারাঠা দস্যু আসছে ! মারাঠা দস্যু .....

যে বিশৃঙ্খলা অনিয়ম অত্যাচার ও রাজনীতির মধ্যে, যে দুর্নীতির ও ভাঙ্গনের পথ ধরে নবাব আলিবর্দীর সময়ে বর্গীদের অত্যাচারে, মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারে বাঙ্গলার ভূমি কেঁপে উঠেছিল, তার বীজটি কিন্তু নিহিত হয়েছিল আলমগীর বাদশাহ্ ঔরংজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুবিস্তীর্ণ মুঘল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগলো। মুল্লুকে মুল্লুকে শুরু হয়ে গেল বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অবাধ লুঠতরাজ, মারপিট আর খুনখারাপি। মাৎস্যান্যায়ের এক চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি।

মারমূর্তিতে ধ্বংসের ভয়াবহ দানব যেন এলো এগিয়ে।

দিল্লীর তখত্-এ-তাউসে আর দিল্লীশ্বর জগদীশ্বররা নেই, কাঠের পুতুল এক-একজন আসে আর যায়। রাজনীতি ও রাজ্যশাসন তখন শক্তির অসি-ক্রীড়ায় পর্যবসিত।

ওদিকে বাঙ্গলার মসনদ থেকে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর তিরোধানের পর মসনদ নিয়ে শুরু হয়ে গেল একদিকে কুলি খাঁর জামাই ও অন্যদিকে দৌহিত্রে দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব। একদিকে ন্যায্য উত্তরাধিকার, অন্যদিকে চক্রান্ত ও লোভের দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি লোভেরই হলো জয়।

সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য বাঙ্গলা মুলুকে ফিরে এলো কিছুটা শান্তি ; কিন্তু ধ্বংসের দানব যেখানে বাহু মেলেছে, সেখানে শান্তি কতদিন টিকে থাকবে !

বাতাসে বাতাসে শুরু হলো আবার লোভের চক্রান্ত, ফিসফিস কানা-কানি।

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তখন সরফরাজ খাঁ মসনদে।

চরিত্রহীনতায় কামুকতায় সে পিতারও এককাঠি উপরে যায়। নারী-মাংস-লোলুপতা ও কুৎসিত কদাচারই সে যুগের নবাবী আমলের ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবাবদের সে সময় রাজনীতির চাইতে নারীর উপরেই বেশি অনুরাগ।

হারেমের ঘরে ঘরে রূপবতী যুবতীদের ভিড়। নানা জাতের নানা দেশের সব সুন্দরী নারী। তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সব উদ্যানবাড়ি।

এদিকে কূটচক্রী শক্তিশালী পূর্বতম দেওয়ান হাজি আহম্মদকে অনুগত ভৃত্যদের প্ররোচনায় সর্‌ফরাজ গদিচ্যুত করেছেন।

মুখে আনুগত্য দেখিয়ে তলে তলে সে ছুরি শানাচ্ছে।

সম্রাট মহম্মদ শার দেওয়া 'জগৎশেঠ' উপাধিধারী ফতেচাঁদ সে সময় অর্থবলে দেশের মধ্যে একজন বিশেষ শক্তিশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি।

ফতেচাঁদেব পৌত্র মহাতাপ রায়ের স্ত্রী নাকি রূপে একেবারে অনন্যা। কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। হাসলে মানিক, কাঁদলে ঝরে মুক্তা।

একদা সেই কন্যার কথা উঠলো নবাব সর্‌ফরাজের কানে।

কেয়া! এতনা খপসুরত!

হ্যাঁ খপসুরত! কিন্তু শেঠবংশের বধূ সে। সাধারণ নারী নয় যে জোর-জুলুম করে হারেমে বা বাগানবাড়িতে ধরে নিয়ে আসা যাবে।

অতএব কৌশল।

ফতেচাঁদকে একদিন ডেকে আনালেন নবাব, শেঠজী, লোকপরম্পরায় শুনলাম আপনাব পৌত্রবধূর নাকি রূপের তুলনা নেই! এই দীনাতিদীন অভাজন নবাব কি আপনার ঘরের সেই অতুলনীয রূপলাবণ্য বারেক দর্শন কবে ধন্য হতে পারে না?

স্তম্ভিত নির্বাক জগৎশেঠ।

কি বলছেন জনাব!

একবার, শুধু একটিবার যদি আমার হারেমে তাকে প্রেরণ করেন শেঠজী! কিংখাপে মোড়া পালকি যাবে। কেউ জানবে না। কেউ দেখবে না।

শযতান! কিন্তু ম'লেও তো সে কথা উচ্চারণ কবা চলবে না। নবাব দেশের সর্বেসর্বা। তাই বিনীত অনুরোধ করলেন, জনাব ক্ষমা করুন, এ সংবাদ ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ পায় তো পবিত্র শেঠকুলে কালি লাগবে চিরদিনের মত।

মিথ্যেই আপনি শঙ্কিত হচ্ছেন শেঠজী। এই কোরান স্পর্শ করে আমি শপথ করছি, শুধু একটিবার, একটিবার দেখে নয়ন সার্থক করেই আবার তাকে আপনার অন্তঃপুরে সসম্মানে পাঠিয়ে দেবো। কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

নিরুপায় জগৎশেঠ রুদ্ধ বিষসর্পের মত আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বললেন, বেশ।

তাছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? সম্মত না হলে নবাব যে বলপ্রয়োগে দ্বিধামাত্রও করবেন না।

তারপর এলো শেঠবধূ গভীর নিশীথে কিংখাপে মোড়া পালকি চেপে নবাবের অন্দরমহলে।

নিরুপায় অপমানিত লাঞ্ছিত জগৎশেঠ আপাতত চুপ করে রইলো বটে কিন্তু প্রতিহিংসার যে বিষ সেদিন তাঁর অন্তরে ফেনায়িত হয়ে উঠেছিল সে

বিষের জ্বালা আর নেভেনি।

তাই যেদিন আলিবর্দী সর্ফরাজ খাঁকে গদিচ্যুত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, হাজি আহম্মদ অনায়াসেই জগৎশেঠ ও রায়রায়ান আলমচাঁদকে সেদিন তাঁর চক্রান্তের মধ্যে টেনে নিতে পেরেছিল।

বাঙ্গলাদেশে যখন ঐভাবে চলেছে বিশৃঙ্খলতা ও লাম্পট্যের চরম, সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে তখন চলেছে এক নব অভ্যুত্থান।

জীবনের শেষ মুহূর্তে অনন্যোপায় রণক্লান্ত জীর্ণ বাদশা আলমগীর শিবাজীর জীবিতকালেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন—রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ চৌথ পাবে মারাঠা।

সেই চৌথ আদায়ের ছলেই আলিবর্দীর সময়ে তাঁর পূর্বতনদের বিশৃঙ্খল ও স্বৈরাচারের সুযোগে, ঘোড়ার লৌহ-খুরে-খুরে পাথরের বুকে বুকে আগুনের ঝিলিক জাগিয়ে, পঙ্গপালের মত উড়িষ্যার গিরিনদী পার হয়ে, বিষ্ণুপুর বীরভূমের রাঙামাটি ও শালবন পার হয়ে, বিশ হাজার বর্গী সেনা সহ জ্বলন্ত একটা উল্কাপিণ্ডের মতই যেন ভাস্কর পণ্ডিত নেমে এলো শস্য-শ্যামলা নদীমাতৃকা বাঙ্গলার শান্ত বুকে।

দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন—বর্গী! বর্গী!

পালা! পালা!

জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম। লুঠ আর নারীধর্ষণ, বুকফাটা কান্না আর রক্তপাত।

ঘর বাড়ি বিষয় সম্পত্তি ফেলে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক, কাঁসারী, তাঁতী, কুমোর, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক-যুবতী, শিশু, বালক,—যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। মোগল-পাঠানরাও বাদ যায় না।

শুধু এক কথা—পালা, পালা, পালা! বর্গী এলো—পালা!

রাধারাণী পালঙ্কের উপর বসে বসে সন্ধ্যার স্তিমিত প্রদীপের আলোয় মধ্যে আফিমের নেশায় ঝিমুতেন আর সেই সব দিনে তাঁর চোখে দেখা ও শোনা বর্গীদের অত্যাচারের কথা বলতেন পরবর্তীকালে।

স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলোয়ার খুলিয়া সব তাহাদের কাটিবা।

বালেশ্বর থেকে রাজমহল, মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান বর্গীদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে আঘাতে, হাতের তরোয়ালের খোঁচায় খোঁচায় ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। ওদিকে হুগলীর আর্তনাদ ভাগীরথীর ঢেউয়ে আছড়ে আছড়ে এসে পড়ছে কলকাতার কিনারে কিনারে।

উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত নবাব আলিবর্দী বর্ধমান আপাতত ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। চারিদিকে শত্রুশিবির। ক্ষুধিত শাণিত কৃপাণ হাতে মারাঠারা ঘুরছে, কামান গোলাগুলি রসদ সর্বস্ব প্রায় তাদের

হাতে তুলে দিয়ে নবাব প্রত্যূষের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে কাটোয়ার দিকে চললেন।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই, বর্গীরা তাঁর পিছু পিছু তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ শুধু রাজধানীতে ফিরে আসতে থাকে। আতঙ্ক ঘনীভূত হতে থাকে। মন্ত্রণা-সভার পর মন্ত্রণা-সভা।

সুমন্তনারায়ণ প্রায় সময়ই বাড়িতে থাকতেন না। কিশোরী রাধারাণীর বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঁপতে থাকে। পাশের বাড়ি থেকে সেইসময় একদিন সুরধুনী এলো।

॥ ৩ ॥

গোবর্ধন ঘোষের মেয়ে সুরধুনী।

সুমন্তনারায়ণের দুখানা বাড়ির পরের বাড়িতেই সুরধুনী আর তার বাপ গোবর্ধন ঘোষ থাকতো।

ঘরে অনেকগুলো গাই মহিষ। তারা প্রচুর দুধ দেয়, সেই দুধ থেকে ঘোল সর ননী ছানা তৈরী করে বিক্রয় করে গোবর্ধনের অবস্থা রীতিমত সচ্ছল।

সুমন্ত রায়ের বাড়িতেও গোবর্ধন দুধ সর ননী ছানা ঘি-র যোগান দিত। সেই সূত্রেই মধ্যে মধ্যে সুমন্তনারায়ণের গোবর্ধনের গৃহে যাতায়াত ছিল।

যাতায়াতের অবিশ্যি আরো একটা গূঢ় অব্যক্ত কারণ ছিল সুমন্ত-নারায়ণের।

যদিও সেটা আর কেউই জানতো না।

সুরধুনীর বয়স আঠারো কি উনিশ। দোহারা দেহের গঠন। গায়ের বর্ণ কালো হলেও যৌবনপুষ্ট দেহখানির মধ্যে সুরধুনীর এমন একটা যৌন-লালিত্য ছিল এবং সেই সঙ্গে তার চলাফেরা, কথাবার্তা ও হাসিটির মধ্যে এমন একটা যৌন-আকর্ষণ সর্বদা উছলে পড়তো যে, বয়সের পুরুষ মাত্রেই তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারত না।

সাত বছরের সময় বিবাহ হয়েছিল সুরধুনীর, আর নয় বছর বয়সের সময় বিধবা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কালোপেড়ে শাড়ি সে পরতো। পানের রসে ওষ্ঠ দুটি সর্বদা লাল হয়ে থাকতো। গন্ধ-তৈলে সুবাসিত তৈলসিক্ত কেশ। সুরধুনী ছিল যেন রসের নাগরী।

সেদিন সহসা দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে প্রত্যাগমন করে সুমন্ত রায় দেখলেন শয়নঘরের দরজা অর্গলবদ্ধ।

রাধা! রাধারাণী!

ডাকতেই রাধারাণী দুয়ার খুলে দেয়।

এ কি! জেগেছিলি?

হ্যাঁ।

তবে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলি কেন ? ভয় করছিল বুঝি ?

ভয় ! তা কেন—

তবে ?

বর্গীরা যদি হঠাৎ দলসমেত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়তো -

হা হা করে হেসে উঠেছিলেন কিশোরী স্ত্রীর ভয়শঙ্কিত মুখখানির দিকে তাকিয়ে সুমন্তনারায়ণ ।

ভয় নেই রে, ভয় নেই। আমি তো আছি। তাছাড়া বর্গীরা এখন কাটোয়ায়। আর রঘুই তো সব সময় বাড়িতে থাকে।

কিন্তু মেয়ে তো নয় সে ?

এই কথা ! ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করছি !

পরের দিনই এলো সুরধুনী দ্বিপ্রহরে। পরিধানে কালোপাড় তাঁতের শাড়ি। মুখ-ভর্তি পান, পানের রসে সিক্ত টুকটুকে লাল দুটি ওষ্ঠ। ওষ্ঠের কোণে মৃদু হাসি।

কোথায় গো বৌ, বাড়িতে আছো ?

জানালার ধারে ঘরের দুয়ারে অর্গল দিয়ে একাকিনী বসেছিল রাধারাণী।

ডাক শুনে বের হয়ে এলো দুয়ার খুলে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সুরধুনীর দিকে রাধারাণী।

কে গো তুমি ?

সুরধুনীর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলে, ওমা তুমিই বুঝি ঠাকুরমশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষ !

তুমি কে ?

আমি !

হ্যাঁ—

সুরধুনী গো সুরধুনী !

সুরধুনী বলে, তোমার নাকি একা একা ঘরে থাকতে ভয় করে, তাই ঠাকুর-মশাই বলেছেন, তিনি যতক্ষণ না থাকেন এখানে এসে থাকতে।

রাধারাণী তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল সুরধুনীকে। কালো দেহে যৌবন তো নয়, যেন নীল আগুন ঝিলিক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

সুরধুনীও চেয়ে ছিল রাধারাণীর দিকে।

হঠাৎ একসময় বলে ওঠে, চুল বাঁধো নি কেন গো বৌ ! এসো তোমার চুল বেঁধে দিই !

ঐ যে প্রথমবার প্রথম দিনে প্রথম সম্ভাষণেই বৌ বলে ডেকেছিল সুরধুনী রাধারাণীকে, তারপর চিরদিনই সে তাকে বৌ বলেই ডেকেছে, যতকাল সে বেঁচেছিল।

আর সুরধুনীর সেই নীল আগুনের মত ঝিলিক-হানা যৌবন, জ্বলন্ত চিতার ওপরে হাসতে হাসতে যেদিন সে আরো অনেক অনেক বছর পরে প্রাণ

দিয়েছিল, সেদিনও ঠিক যেন তেমনটিই ছিল।

যদিও সুরধুনীর বয়স তখন সার্ধ চল্লিশের কোটা ছুঁই-ছুঁই করছে, চিরযৌবনা ছিল যেন সুরধুনী।

এবং ঐ যে সেদিন দ্বিপ্রহরে এসে সুরধুনী রাধারাণীর সংসারে এসে পা দিয়েছিল, বলতে গেলে সেই তার আসা। আর সে ফিরেই যায়নি।

কাটোয়ায় পৌঁছেও আলিবর্দী আক্রমণকারী বর্গীদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকেও নতুন সৈন্যদল নবাবের সাহায্যের জন্য কাটোয়ায় গিয়ে পৌঁছেছে।

বন্দী মীর হবীব বর্গী সর্দারকে পরামর্শ দিল, নবাব এখন কাটোয়ায়, এই সুযোগে যদি ভাগীরথীর পশ্চিম পার দিয়ে গিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করা যায় তো কেল্লা ফতে।

ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়া।

স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীর উত্তর পার ছড়িয়ে প্রায় তিনক্রোশ বিস্তৃত তখনকার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহর।

মীর হবীবের পরামর্শ ভাস্কর পণ্ডিতের মনে ধরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর তার বিশাল বর্গীবাহিনীকে বললে, চলো মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ দূর নয়।

হাজার হাজার ঘোড়ার খুরের আঘাতে কেঁপে উঠলো বাংলার মাটি। উড়লো ধূলি। তীরের বেগেই যেন পঙ্গপালের মত বর্গীরা সারাটা দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়ে প্রত্যূষের প্রথম আলোয় নগরের পশ্চিমভাগে ডাহাপাড়ায় এসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে যেন সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ছড়িয়ে গেল। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠলো আগুন।

বৃদ্ধ যুবা শিশুর চিৎকারে ও কান্নায় আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হতে লাগলো।

লুঠ আর নারীধর্ষণ চলতে লাগলো বেপরোয়া।

বিরাট গঞ্জ ডাহাপাড়ায়। আগুনের লেলিহান শিখা উঠে দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগলো। মহাজনটুলীতে ভীতসন্ত্রস্ত নাগরিকেরা প্রতি মুহূর্তে সেই নেকড়ের মত রক্তলোলুপ বর্গীদের আগমন-আশঙ্কায় প্রহর গুনতে থাকে।

রাজধানী বলতে গেলে একপ্রকার অরক্ষিতই। বেশির ভাগ সৈন্যই তখন কাটোয়ায় নবাবের সাহায্যে গিয়েছে। তবু সামান্য যা সৈন্য ছিল তাদেরই নিয়ে হাজি আহম্মদ ও নোয়াজিস কেবল কেল্লা রক্ষা করতে লাগলো প্রাণপণে।

অগ্নিদগ্ধ ডাহাপাড়াকে পশ্চাতে ফেলে বর্গীরা ভাগীরথী পার হয়ে চলে এলো এপারে। শুরু হলো সেখানেও আবার লুঠ, ধর্ষণ ও ঘরে ঘরে অগ্নি-সংযোগ।

কুবেরের ঐশ্বর্য শেঠজীর তোষাখানায়। হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে বর্গীর দল

জগৎশেঠের কুঠিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আক্রান্ত হলো গোবর্ধন ঘোষের গৃহও।

সুরধুনী ঘরের মধ্যে অর্গল তুলে কাঁপছিল। দশজন বর্গী বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ে, অর্গল ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে যুবতী সুরধুনীকে দেখে হা হা করে রাক্ষসের মত হেসে উঠলো।

গোবর্ধন ঘোষ এগিয়ে এসেছিল বাধা দিতে, কিন্তু একজন বর্গী তার হস্তধৃত তীক্ষ্ন তরবারির অগ্রভাগটা চকিতে গোবর্ধনের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে একটা হেঁচকা টান দিতেই সব নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে এলো।

শেষ একটা আর্ত চিৎকার করে গোবর্ধন রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে গেল।

বর্গীরা হা হা করে হেসে উঠলো।

টানতে টানতে সুরধুনীকে বর্গীগুলো গোয়ালঘরের দিকে নিয়ে চলে গেল।

গোয়ালের একদিকে স্তূপীকৃত করা ছিল গরু-মহিষদের খাদ্য খড়। সেই খড়ের গাদার উপরে এনে ফেললো সুরধুনীকে।

রঘু আর সুমন্ত রায় দুজনে লাঠি ও তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল রঘু।

হৈ হৈ করে দশ-বারোটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত বর্গী যখন সুমন্ত রায়ের গৃহের দরজার সামনে এসে পড়লো, বাঘের মতই তেল-পাকানো চক্‌চকে চার হাত প্রমাণ লাঠিটা নিয়ে রঘু রুখে দাঁড়ালো। বিদ্যুৎগতিতে চরকির মতই যেন চারপাশে রঘু লাঠি ঘুরিয়ে এদিক ওদিক করে চলেছে। গোটাতিনেক বর্গী জখম হয়ে ছিট্‌কে পড়লো।

কিন্তু ততক্ষণে আরো চারজন বর্গী এসে পড়েছে রঘুকে আক্রমণ করতে।

তাদেরও দুটোকে ঘায়েল করল রঘু। কিন্তু একা সে জুঝবে কতক্ষণ! হাতের কব্জি তার ধীরে ধীরে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে।

বর্গীগুলোও যেন সব শয়তানের বাচ্চা, মরেও মরে না।

রঘু চেঁচিয়ে উঠলো ঐসময়, কর্তা, আমি আর পারছি না!

কথাটা শেষ হলো না রঘুর, তীক্ষ্ন সূচালো একটা তরবারির অগ্রভাগ ওর বক্ষের মধ্যে বাম পার্শ্বে ঢুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেল রঘু।

কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে তখনই সুতীক্ষ্ন তরবারি হাতে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন সুমন্তনারায়ণ।

তরবারি চালনায় সুনিপুণ সুমন্ত রায়। বাঘের মতই গর্জন তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুমন্ত রায় অমিতবিক্রমে অবশিষ্ট তিনজন বর্গীর মধ্যে।

বাকী বর্গীদের দুজন ইতিপূর্বেই রঘুর লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিল ও তিনজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

প্রায় আটঘণ্টা ধরে রঘুর সঙ্গে লড়ে তারাও—মানে বাকী তিনজন বর্গীও তখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন সুমন্ত রায়ের তরবারির মুখে প্রাণ দিল, বাকী দুজন পালাল প্রাণ নিয়ে কোনমতে।

কিন্তু সুমন্ত রায়েরও তখন রক্তে খুনের নেশা জেগেছে। মুক্ত কৃপাণ হাতে ছুটলেন সুমন্ত রায় পলায়নরত সেই বর্গী দুজনের পিছনে পিছনে।

বর্গীদের ঘোড়াগুলো কাছেই ছিল, দুজনে দুটো ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

সুমন্ত রায় আবার ফিরে এলেন নিজ গৃহে।

অর্গল তুলে ঘরের মধ্যে একাকিনী রাধারাণী ভয়ে উত্তেজনায় যেন পাথরের মত হয়ে ছিল। অর্গলবদ্ধ দ্বারে এসে ধাক্কা দিলেন সুমন্ত রায়, দরজা খোল রাধা!

কিন্তু রাধা তখন একরকম চলৎশক্তিহীন। সাড়া পর্যন্ত দিতে পারে না স্বামীর ডাকে।

অনেক ধাক্কাধাক্কি ও চেঁচামেচির পর রাধা দরজা খুলে দিল।

অক্ষত ছিলেন না সুমন্তনারায়ণও। দেহের বহুস্থান কেটে গিয়ে ক্ষতস্থান-গুলো দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ধূলায় ধূসরিত ঘর্মাক্তকলেবর দেহ। হাঁপাচ্ছেন তখন রীতিমত সুমন্তনারায়ণ।

তরবারিটা একপাশে রেখে মাটিতেই ধপ করে বসে পড়লেন সুমন্তনারায়ণ, —একটু জল!

রাধারাণী তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে এলো।

জল পান করে যেন অনেকটা ক্লান্তি দূর হয়। আঃ! জলের গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন সুমন্তনারায়ণ, আপাতত শয়তানরা গেছে বটে, তবে আবার যে দ .বল নিয়ে ফিরবে না তা বলা যায় না।

কিন্তু সুমন্তনারায়ণ জানতেন না যে, বর্গীদের সেরাত্রে ফিরে আসবার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সেইদিনই সন্ধ্যার মুখে নগর ত্যাগ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল।

তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে বর্গীদের মুর্শিদাবাদ আক্রমণের পরিকল্পনার কথা পূর্বাহ্ণেই চরের মুখে নবাবের গোচরীভূত হয়েছিল।

নগরী প্রায় অরক্ষিত বললেও চলে, এসময় বর্গীরা যদি নগরে প্রবেশ করে তো সর্বনাশ হবে।

নবাব তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে শিবির তুলে তাদের মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হবার জন্য।

এবং ঐদিনই নগরী থেকে মাত্র দুই ক্রোশ ব্যবধানে কিরীটকোণায় নবাবের বিরাট সৈন্যদল এসে পেঁছালো।

নবাব সংবাদ পেয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন প্রায়, ভাস্কর পণ্ডিত আর মুর্শিদাবাদে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলো না।

তাছাড়া ঐ একদিনেই অন্যান্য লুঠের ব্যাপার বাদ দিলেও একমাত্র জগৎশেঠের কুঠি লুঠ করে দুই কোটি টাকা পেয়েছিল ভাস্কর। অধিক লোভে বিপদের সম্ভাবনা। অতএব ভাস্কর তার বর্গীবাহিনীকে বললে, চল, ফেরো। এবং প্রত্যূষের আবছা আলোয় হৈ হৈ করে যেমন তারা নগরীতে এসে প্রবেশ করেছিল, তেমনি সন্ধ্যার আবছা আলোয় হৈ হৈ করে আবার তারা লুঠের মাল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে কাটোয়ার দিকে চলে গেল।

পশ্চাতে পড়ে রইলো তখনো প্রজ্বলিত নগরী। বাতাসে ভরে রইলো ক্ষতবিক্ষত ও ধর্ষিতা নরনারীর মর্মন্তুদ চিৎকার, আকাশ কালো হয়ে রইলো ধোঁয়ায়।

॥ ৪ ॥

সারাটা দিন সুমন্তনারায়ণকে রাধারাণী ঘর থেকে আর বের হতেই দিল না। কক্ষের অর্গল তুলে দিয়ে সে বর্গীদের দুঃস্বপ্নকে প্রতিরোধ করবার জন্য স্বামীকেও কক্ষের বাইরে যেতে দিল না, নিজেও গেল না।

বাইরে থেকে আর্ত নরনারী ও শিশুর হৃদয়বিদারক কণ্ঠস্বরের মুহুর্মুহু চিৎকার অর্গলবন্ধ দুয়ারের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। আর সেই চিৎকারে শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো রাধারাণী।

সুমন্তনারায়ণ প্রতিমুহূর্তে প্রতিহিংসাপরায়ণ উন্মত্ত বর্গীদের পুনরায় আক্রমণের অপেক্ষা করতে লাগলেন। লাঞ্ছিত বর্গীরা যে আবার ফিরে এসে তাদের উপরে আক্রমণ চালাবে সে বিষয়ে সুমন্তনারায়ণ একেবারে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে বাইরের চিৎকারটা যখন মিলিয়ে এলো, অত্যাচারিত নাগরিকদের কান্নার শব্দটা ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল, সুমন্তনারায়ণ তখন বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু স্বামীকে লাঠি হাতে দরজার দিকে অগ্রসর হতে দেখে শঙ্কিত রাধারাণী এগিয়ে এসে স্বামীর একটা হাত চেপে ধরে।

ও কি! কোথায় যাচ্ছো?

একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসি রাধা।

না, না—বাইরে বের হলেই হয়তো এখুনি তারা তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

না, আমার মনে হচ্ছে এদিকে তারা হয়তো আর নেই।

না, তবু তোমাকে আমি ঘরের বাইরে যেতে দেবো না।

মিথ্যে তুমি ভয় পাচ্চো রাধারাণী। তুমি কি মনে করেছ তারা এ তল্লাটে থাকলে এতক্ষণ আবার এখানে এসে হানা দিতো না, নিশ্চয়ই তারা চলে গিয়েছে—

না, তবু তোমাকে বাইরে যেতে দেবো না আমি।

একবার বাইরে আমাকে যেতেই হবে। এভাবে ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজায়

খিল তুলে বসে থাকার কোন মানেই হয় না। আজ না বের হলেও কাল বা পরশু যখন হোক ঘর থেকে তো বেরুতেই হবে। সারাটা জীবন তো এমনি করে আমরা ঘরের অর্গল তুলে থাকতে পারবো না।

না গো না—

ছিঃ রাণী. অবুঝ হয়ো না। তাছাড়া রঘুর কি হলো তাও তো আমাদের একবার দেখা দরকার। শুধু রঘু কেন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও তো খবরাখবর নেওয়া আমাদের একটা কর্তব্য!

তবু রাধারাণী স্বামীকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুমন্তনারায়ণ শুনলেন না। অর্গল খুলে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন স্বামী।

অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলো তখন চারিদিকে ধীরে ধীরে চাপ বেঁধে উঠলেও একটা ঈষৎ রক্তিমাভায় সমস্ত আকাশটা যেন কেমন ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। বর্গীরা যেসব কুটিরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল লুঠ করে চলে যাবার মুখে, সে আগুন তখনো সব নেভেনি।

এখানে ওখানে তখনো ধিকি ধিকি জ্বলছিল আগুন। আর তারই রক্তিমাভা রাতের আকাশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে চাপ চাপ শ্বাসরোধকারী কালো ধোঁয়া।

দগ্ধ পৃথিবী ধূম্রশ্বাসে হাহাকার করছিল বুকভাঙ্গা বেদনায়।

সদরের সামনেই জমাট কালো রক্তের মধ্যে রঘুর নিষ্প্রাণ দেহটা পড়েছিল তখনো। ভৃত্য নয়, দীর্ঘদিনের সহচর। সত্যকারের একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতো তাঁর জন্যে। সেই প্রাণই দিয়ে গেল সে।

সুমন্তনারায়ণের দু' চোখের কোণে জল ভরে আসে।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলেন সুমন্তনারায়ণ, তারপর নীচু হয়ে দু'হাত দিয়ে রঘুর মৃতদেহটা পিঠের উপর তুলে নিলেন।

চারিদিকে থমথম করছে আসন্ন রাত্রির পূর্বাভাস। অন্ধকার। মাথার উপরে আগুনের আভায় ধূম্ররক্তিম আকাশ। বাতাসে একটা পোড়া কটু শ্বাস-রোধকারী গন্ধ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন সুমন্তনারায়ণ মৃতদেহটা পৃষ্ঠে বহন করে গঙ্গার ঘাটের দিকে।

কলকল ছলছল মৃদুমন্দ শব্দ তুলে বয়ে চলেছে ভাগীরথী সন্ধ্যারাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে।

ঝিরঝিরে একটা বাতাস। মৃতদেহটা পৃষ্ঠে করেই জলের মধ্যে অন্ধকারে নেমে গিয়ে কোমরজলে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ। তারপর ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ দেহটা জলের মধ্যে নামিয়ে দিলেন।

ওঁ শান্তি। শান্তি। শান্তি।

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি প্রেততর্পণ কালে ভবন্তিহ। রঘুনাথস্য-প্রেতস্য এতৎ গঙ্গোদকেন তৃপ্যস্ব।…

গঙ্গোদকেন তৃপ্যন্ব।

নিঃশব্দে চক্ষুর কোল বেয়ে দুটি ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো সুমন্ত-নারায়ণের।

অশ্রুসজলচক্ষে একবার অন্ধকারে নিঃশব্দ প্রবহমান গঙ্গাবক্ষের দিকে তাকিয়ে আবার মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকালেন। তখনো অগ্নিপ্রভায় রক্তিম রাত্রির আকাশ।

ধীরে ধীরে জল থেকে আবার উঠে এলেন সুমন্তনারায়ণ। বাড়ির কাছা-কাছি এসে হঠ্যাৎ মনে পড়ে গেল আর একখানি মুখ। সুরধুনী।

বাড়িতে তার বৃদ্ধ পিতা, বলতে গেলে সে একাকিনীই ছিল, যখন এ পাড়ায় বর্গীরা হামলা করে।

তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে একটা মশাল জেবলে নিয়ে গোবর্ধন ঘোষের বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন সুমন্তনারায়ণ।

বাড়িটায় বর্গীরা আগুন দেয়নি বটে তবে চারিদিকে তাকালে মনে হয় যেন প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ঝাপটায় সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে।

হস্তধৃত মশালের রক্তাভ আলোয় বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন সুমন্তনারায়ণ। মাথার উপরে তখনো আগুনের আভায় রক্তাভ রাত্রির আকাশটা কি এক মর্মান্তিক মূক বেদনায় গুমরে গুমরে উঠছে।

আঙ্গিনার একধারে জুঁই গাছটাকে অজস্র সাদা সাদা জুঁই ফুলে কেমন যেন কুৎসিত সাদা মনে হয়।

এগুতে এগুতে চাপা কণ্ঠে ডাকলেন সুমন্তনারায়ণ, গোবর্ধন! গোবর্ধন!

কিন্তু শূন্য আঙ্গিনায় সেই চাপা কণ্ঠের ডাকটা চক্রাকারে একটা ধূম্রশিখার মতই উঠে ক্রমে ক্রমে ব্যর্থ একটা হাহাকারের মত হারিয়ে গেল।

হাতের মশালের আলোটা শুধু দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে।

আবার ডাকলেন সুমন্তনারায়ণ পূর্ববৎ চাপা কণ্ঠে, সুরো, সুরধুনী!···

তবু তো কই কোন সাড়া নেই।

কোথায় দূরে যেন একটা সারমেয় ডেকে উঠলো দীর্ঘ উঁ উঁ শব্দে।

এতক্ষণ সারমেয়গুলিও যেন ডাকতে ভুলে গিয়েছিল।

শূন্য ঘরের কপাটগুলো হা হা করছে খোলা।

আরো একটু এগিয়ে গেলেন সুমন্তনারায়ণ হাতের মশালটা নিয়ে।

হঠাৎ একটা বীভৎস দৃশ্যে থমকে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ। চাপ চাপ রক্তের মধ্যে গোবর্ধনের দেহটা হাত-পা ছড়িয়ে দাওয়ার সামনেই মাটিতে পড়ে আছে। পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে চম্‌কে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করতেই একটা ভয়ের তীক্ষ্ণ অনুভূতি দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো দিয়ে শিরশির করে বয়ে গেল সুমন্তনারায়ণের।

খিড়কির দরজাটার কাছে হাত-দশ-বারো দূরে, আবছা অন্ধকারের মধ্যে

দুটো নীল আলোর ভাটা যেন ধকধক করে জ্বলছে।

কী! কী ওটা! ভয়ের আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্তের জন্য সুমন্তনারায়ণ যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সাহসে ভর করে হাতের মশালটা নিয়ে দু' পা এগিয়ে যেতেই দপ্ করে নীল আলোর ভাঁটা দুটো নিভে গেল। খস খস্ একটা শব্দ শোনা গেল। অন্ধকারে একটা ছায়া যেন সরে গেল চকিতে। একটা শৃগাল।

কিন্তু সুরধ্বনী, সুরো কোথায়?

বাড়িটার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা। বাতাস যেন সীসের মত ভারি। দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুরো, সুরো—এবারে চাপা কণ্ঠে নয়, বেশ একটু গলা ছেড়েই ডাকলেন সুমন্তনারায়ণ।

তবু সাড়া পাওয়া গেল না। তবে কি বর্গীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল?

মশাল হাতে এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বাড়ির পশ্চাতে গোয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন সুমন্তনারায়ণ।

চর্বিতচর্বণের একটা মৃদু শব্দ কানে এলো সুমন্তনারায়ণের। পরক্ষণেই তাঁর নজরে পড়লো ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মত দেহ. মেঘের মত কালো, সুরধ্বনীর সেই প্রিয় পুরুষ মহিষ রাজাকে।

বিরাট সুচালো শৃঙ্গ। পাহাড়ের মত মহিষ রাজা খড়ের গাদার একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আপনমনে জাবর কাটছে। মশালের আলোয় রাজার ভাঁটার মত চোখ দুটো যেন ধকধক করে জ্বলছে। বিরাট ঐ যমসদৃশ মহিষটাকে ভয় করে না ঐ তল্লাটে বড় একটা কেউ ছিল না।

সুরধ্বনীর অতিপ্রিয় ছিল মহিষটা। যেন মানুষের মতই অদ্ভুত কথা শুনতো রাজা সুরধ্বনীর।

রাজার দিকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে সুমন্তনারায়ণের দৃশ্যটা নজরে পড়লো।

॥ ৫ ॥

কালো পাহাড়ের মত রাজার সামনেই পড়ে আছে অচৈতন্য দেহটা সুরধ্বনীর।

আরো এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন সুমন্তনারায়ণ মশালটা হাতে।

মুহূর্তের জন্য বোবা বিহ্বলতায় থমকে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নিরাবরণ সুরধ্বনীর দেহটা পড়ে আছে খড়ের গাদার উপরে।

সুরধ্বনীর দেহটা যেন একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে খুবলে খুবলে খেয়েছে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে চিহ্নিত।

কি যে মুহূর্তের জন্য ভাবলেন সুমন্তনারায়ণ, তারপর এগিয়ে গেলেন ভূপতিত অচৈতন্য সুরধ্বনীর কাছটিতে। প্রথমেই গাত্রে হাত দিলেন। গাত্র

তখনো উষ্ণ। নাসারন্ধ্রের কাছে হাত দিয়ে বুঝলেন শ্বাসপ্রশ্বাস তখনো চলছে। প্রাণ তাহলে আছে!

আবার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে একটা বস্ত্র যোগাড় করে আনলেন সুমন্ত-নারায়ণ। তারপর কোনমতে সেই বস্ত্রের সাহায্যে অচৈতন্য সুরধুনীর উলঙ্গ দেহটাকে ঢেকে সেটা কাঁধের উপরে তুলে নিলেন। এবং অচৈতন্য সুরধুনীর দেহটা বহন করে সোজা এসে নিজগৃহে প্রবেশ করলেন।

শয়নকক্ষের দরজাটা বন্ধ ছিল। বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত করে ডাকলেন, রাধা, রাধারাণী—দরজাটা খোল। আমি সুমন্ত—

দু'তিনবার ডাকার পর ভিতর থেকে রাধারাণী দরজাটা খুলে দিল।

ভিতর থেকে ঘরের দরজায় অর্গল তুলে রাধারাণী ঘরের এক কোণে বসেছিল।

আতঙ্কে ভয়ে চোখ মুখ তার শুকিয়ে গিয়েছিল।

ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলছিল টিম্‌টিম্‌ করে!

বস্ত্রাবৃত একটা দেহ স্বামীকে স্কন্ধে করে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে যেন সহসা দু' পা পিছিয়ে যায় রাধারাণী অজানিত একটা আশঙ্কায়।

প্রদীপের ম্লান আলোয় স্বামীর থম্‌থমে মুখটার দিকে তাকিয়ে কি যেন প্রশ্ন করতে গিয়েও কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ উচ্চারিত হয় না রাধারাণীর। ফ্যালফ্যাল করে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়েই থাকে।

সুরধুনীর লুপ্ত জ্ঞান তখন বোধ হয় পুনরায় একটু একটু করে ফিরে আসছে।

দেহটা সযত্নে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সুমন্ত রাধারাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ঘটিতে করে একটু জল নিয়ে এসো রাধারাণী।

রাধারাণী কিন্তু যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়েই থাকে। কোন সাড়া দেয় না।

কই, জল নিয়ে এসো! সুমন্ত আবার বললেন।

তবু নিশ্চুপ রাধারাণী।

বিরক্তিভরে এবার অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, শুনতে পাচ্ছো না? জল নিয়ে এসো!

লোহার মতই শক্ত কঠিন করে দেহটা তবু দাঁড়িয়েই থাকে নিঃশব্দে রাধারাণী।

সুমন্ত রায় নিজেই এবারে উঠে কক্ষের কোণ থেকে জলের কলসটা তুলে নিয়ে এসে সুরধুনীর চোখে মুখে জলের ছিটা দিতে লাগলেন।

জ্ঞান ফিরে আসছে সুরধুনীর। জলসিক্ত বিস্রস্ত চূর্ণ কুন্তলগুলো যেন কালো কালো সরীসৃপের মত সুরধুনীর কপালের উপরে নেমে এসেছে। শিউরে উঠেছিল কেন না-জানি সহসা রাধারানী সুরধুনীর সেই জলসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে। একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি যেন তীব্র একটা বিষের জ্বালার মতই রাধারাণীর শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে চলেছিল সেই মুহূর্তে।

চম্‌কে উঠেছিল পরক্ষণেই আবার স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাধারাণী।

সুরধুনী! সুরো—

ধীরে ধীরে ক্লান্ত আঁখি মেলেছে তখন সুরধুনী। জলসিক্ত আঁখির পল্লব দুটি থিরথির করে কাঁপছে।

সুরো!

কে?

আমি সুমন্ত।

আমি—আমি কোথায়?

ভয় কি, তুমি আমার গৃহে!

পাথরের মতই স্তব্ধ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে মাত্র দু' হাত দূরে রাধারাণী।

খোলা জানলাপথে রাতের হাওয়ায় ঘরের প্রদীপশিখাটা বার-দুই কেঁপে উঠে সহসা তৈলাভাবে দপ্‌ করে নিভে গেল।

নিশ্ছিদ্র আঁধারে নিমেষে কক্ষটা যেন দৃষ্টির সামনে থেকে মুছে গেল।

কাটোয়ার পথে অন্ধকারে হাজার অশ্বের খুরে খুরে খট্‌ খট্‌ শব্দ তুলে বর্গীর দল ছুটে চলেছে। সর্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে দলপতি ভাস্কর পণ্ডিত।

মুর্শিদাবাদ থেকে একমাত্র জগৎশেঠের তোষাখানা লুঠ করেই বহু ধনরত্ন পাওয়া গিয়েছে। মীর হবীবকে ধন্যবাদ।

কাটোয়া তো পূর্বেই বর্গীরা একদফা দগ্ধ করে দিয়ে গিয়েছে। মানুষ-জনও বড় একটা সেখানে আর নেই।

কাটোয়ার উত্তরে অজয়পারে সাঁকাই পল্লী। সেখানে নবাবী আমলের একটি মাটির কেল্লা ছিল। আর ছিল নগরের মধ্যে গড়খাতে বেষ্টিত ফৌজদারের সুরক্ষিত বসতবাটি।

ভাস্কর তার দলবল নিয়ে ঐ কেল্লা ও বাটি অধিকার করে, কাটোয়া থেকে তিনক্রোশ দূরবর্তী দাঁইহাট পর্যন্ত তাঁবু ফেলে আবার সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে রইলো।

ক্রমশ আকাশ গেল মেঘে মেঘে ছেয়ে। দুরু দুরু ডেকে উঠছে মেঘ। বিদ্যুতের চমকানি।

এলো বর্ষা। বর্ষার প্লাবনে অজয় নদ ভেসে দুকূল ছাপিয়ে ভাগীরথী উঠলো গর্জে। দুকূলপ্লাবী ভাগীরথীর সেই বিভীষণা মূর্তির সামনে অগ্রসর হয় কার সাধ্য!

নবাব আলীবর্দী দেখলেন এই সুযোগ, তিনি সৈন্য-সংগ্রহে ও মুর্শিদাবাদকে সুরক্ষিত করে তুলতে তৎপর হয়ে উঠলেন।

আবার মীর হবীব ভাস্করের কানে কানে দিল মন্ত্রণা।

দাঁইহাটের ঘাটে বড় বড় সব নৌকার সাহায্যে সেতু রচনা করে ভাগীরথী পার হয়ে বর্গীরা হুগলী অঞ্চলে আবার ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে

পড়লো। আবার লুণ্ঠন, আবার হত্যা, আবার ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ।

নবদ্বীপ, বীরভূম, হুগলী সর্বত্র হাহাকার পড়ে গেল।

সর্বত্র শুধু এক রব, পালা, পালা, পালা—

বর্গী এলো দেশে। পালা, পালা, পালা।

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে তখন সব পালাচ্ছে পদ্মার ওপারে মালদহ, রামপুর ও বোয়ালিয়ার দিকে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চলছে তখন ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ভয়াবহ পৈশাচিক লীলা। ছুটছে সব অন্ধের মত প্রাণভয়ে ভীত নাগরিকেরা গঙ্গার ওপারে। মাথায় রইলো সব কৃষি-বাণিজ্য—আগে প্রাণ বাঁচুক, তারপর অন্য কথা।

কাটোয়া ও বর্ধমানের দক্ষিণ অঞ্চল ক্রমশ একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ল দেখতে দেখতে বর্গীর ভয়ে।

বর্গীর অন্যতম প্রধান আড্ডা তখন হুগলী বন্দর।

ভাগীরথীর পশ্চিম পারের লোকেরা ছুটছে তখন সব কলকাতার দিকে।

কলকাতায় কোম্পানীর লোকেরা তখন অনেকটা জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের সৈন্য কামান বন্দুক সব আছে। তবু কতকটা নিশ্চিন্ত কলকাতায় কোম্পানীর আশ্রয়ে একবার গিয়ে উঠতে পারলে।

আর ফিরিঙ্গী বণিক কোম্পানীও দেখলে, এই তো সুযোগ। নবাবের সম্মতি নিয়ে তারা কলকাতা রক্ষার অজুহাতে কলকাতার অন্য তিন দিকে শুরু করে দিল গড়খাই খুঁড়তে।

শুধু কলকাতাতেই বা কেন, নবাবের অনুমতিক্রমে কাশিমবাজার কুঠির চারদিকে গড়ে উঠলো ইটের প্রাচীর ও চার কোণে চারটি সুদৃঢ় বুরুজ।

চলতে লাগলো কলকাতায় সৈন্যসংগ্রহ, কামান বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ ও দুর্গ-সংস্কার।

ধীরে বহে চলে ভাগীরথী। আর ভাগীরথীর তীরে তীরে পরবর্তী দুই-শত কালের এক নয়া ইতিহাসের পাতায় একটি দুটি করে আঁচড় পড়তে থাকে অদৃশ্য কালের হস্তধৃত অদৃশ্য লেখনীর সূচ্যগ্র ফলায় ফলায় অদৃশ্য কালির মসীকৃষ্ণ অক্ষরে অক্ষরে।

ভাগীরথী বহে চলে ধীরে।

সুমন্তনারায়ণও দেখলেন, আর না। বর্গীর হাঙ্গামা দিনের পর দিন যেমন বেড়ে চলেছে আর মুর্শিদাবাদ নিরাপদ নয়। সময় থাকতে থাকতে এই সময় কোন নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে মাথা গোঁজাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন সুমন্তনারায়ণ।

কিন্তু কোথায় যাবেন? কয়েকদিন ধরে অহোরাত্র চিন্তা করলেন সুমন্ত-নারায়ণ।

ভাগীরথীর তীরে নতুন যে শহর গড়ে উঠছে কলকাতা, ফিরিঙ্গী বণিকদের চেষ্টায় ও যত্নে, যদি যেতে হয় তো সেখানেই যাওয়া সর্বদিক থেকে শ্রেয়—বিবেচনা করলেন সুমন্তনারায়ণ। কলকাতা ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূল। বারাণসী সমতুল।

তারপর একদিন নিশিরাত্রে কিশোরী স্ত্রী রাধারাণী, বিধবা যুবতী সুরধুনী ও পিতৃমাতৃহারা চণ্ডাল অষ্টমবর্ষীয় বালক কালীচরণকে নিয়ে নৌকায় চেপে ভাগীরথী-বক্ষে ভাসলেন সুমন্তনারায়ণ।

শ্রাবণ-রাত্রির আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে। অসহ্য একটা গুমোট গরম। দুরন্ত আবেগে ভাগীরথী যেন আথালিপাথালি করছে।

মোচার খোলার মতই নৌকাটা সেই খরস্রোতা ভাগীরথী-বক্ষে হেলতে-দুলতে থাকে। অন্ধকারে নৌকার পাটাতনে একটা দীর্ঘ বল্লম হাতে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে সুমন্তনারায়ণ। ভাগ্যান্বেষণে চলেছেন কলকাতায়। না জানি অদৃশ্য ভাগ্যের পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে!

একটা শুধু জলস্রোতের শব্দ। অন্ধকারে যেন একটা ক্রুদ্ধ পশু অবিরাম গর্জে চলেছে, হিংস্র নখরাঘাতে ভাসমান নৌকাটাকে যেন আঁচড়ে চলেছে।

আর নৌকার মধ্যে টিম্‌টিমে আলোয় নির্নিমেষে চেয়ে বসেছিল রাধারাণী অদূরে ঘুমন্ত অষ্টমবর্ষীয় বালক কালীচরণের কালো কষ্টিপাথরের মত মুখটার দিকে। মানুষের ছেলে নয়, যেন একটা বিষাক্ত কৃষ্ণ সর্প কুণ্ডলী পাকিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ শিউরে ওঠে রাধারাণী যেন আপন মনেই—হঠাৎ ফণা তুলে বিষাক্ত ছোবল হানবে না তো!

॥ ৩ ॥

সুতানুটি গোবিন্দপুর

খালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দু কূলে বসাইয়া ঘাট।
পাষাণে রচিত ঘাট, দু-কূলে যাত্রীর নাট, কিঙ্করে বসায় নানান হাট॥

॥১॥

আজকের আলো-ঝলমল কলকাতা শহর নয়।

কলকাতার সেই আদিলীলা। শিশু কলকাতা। বন আর জঙ্গল, জঙ্গল আর বন। কেবল বাতাসে একটা ভ্যাপসা পচা পাতার গন্ধ। ডিহি কলকাতা।

হুগলী নদীর তীরভূমির সেই শুরুর ইতিহাসটা।

দক্ষিণে বেহালা, বড়িশে, উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। এরই মাঝে কালীক্ষেত্র—যেটা ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারির অন্তর্গত।

আর ঐ কালীক্ষেত্রের মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনখানি নগণ্য গ্রাম। উত্তরে সুতানুটি, দক্ষিণে গোবিন্দপুর, আর মাঝখানে তার ডিহি কলকাতা।

মনে পড়ে বিভূতির, ছোটবেলায় সৌদামিনী—সদু ঠাকরুনের মুখে মুখে গল্পচ্ছলে সেই মান্ধাতা আমলের কলকাতার কত পুরাতন বিচিত্র কাহিনীই না শুনেছে সে।

সৌদামিনী বলতেন, কোথায় ছিল রে তোদের আজকের এ শহর সেকালে। কর্তামা বলতেন— অর্থাৎ রাধারাণী; বিকৃত-মস্তিষ্কা অশীতিপর বৃদ্ধা শকুনী রাধারাণী নাকি বলতেন—কেবল বন জঙ্গল আর জঙ্গল। জমে জমে সাঁচি স্তূপের মত উঁচু। কোথাও জল নিকাশের কোন নালা নেই। যেদিকে তাকাই, এঁদো পচা ডোবা, ফল-ফলারির বাগান, হোগলার ঝোপ আর বাঁশের ঝাড়। বাতাসে দিবা-রাত্র সোঁ সোঁ শব্দ তুলছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভোঁ ভোঁ করে এসে ছেঁকে ধরে পঙ্গপালের মত মশার ঝাঁক। মাটিতে পা দিয়েছো কি শিরশির করে উঠবে। যেমন স্যাঁতস্যাঁতে তেমনি ভিজে।

কলকাতার আদি চেহারার কিছুটা সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতাতেও আঁকা ছিল। কলকাতা শহরে বড় রাস্তা বা সড়ক বলতে সবেধন নীলমণি একটিই ছিল। এবং সকলে সেটাকে সড়ক বললেও সেটা একটা মানুষের পায়ে চলা সরু রাস্তা ছাড়া যাতায়াতের আর বেশী কিছুই ছিল না।

এঁকেবেঁকে সেই পায়ে-চলা রাস্তাটাই উত্তরে চিৎপুর গ্রাম থেকে দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। এবং শোনা যায় সেই সড়ক বা পায়ে-চলা রাস্তাটি ধরেই তীর্থযাত্রীর দল যেত দেবী-দর্শনে। তাও নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে নয়। ভয়ে ভয়ে প্রাণটা হাতে করে। কারণ পথের ধারে ধারে বন-জঙ্গলের মধ্যে ছিল যত সব খুনে ঠ্যাঙ্গাড়ে ও ডাকাতের ঘাঁটি। কখন কোন্ মুহূর্তে যে তারা

হৈ হৈ করে নিরীহ পথিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, খুন জখম করে লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে সর্বস্ব লুটেপুটে নেবে তারই কি কিছু স্থিরতা ছিল!

শুধু কি আবার ঠ্যাঙ্গাড়ে খুনে আর ডাকাতই! বন জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ারদের কি উৎপাত কম ছিল? ডাঙ্গায় বাঘ, বুনো দাঁতাল শুয়োর, নদীতে হাঙ্গর কুমীর সাপ।

পা ফেলবার যো ছিল নাকি তখনকার দিনে কলকাতায়! ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা! কর্তামা বলতেন, তার চাইতে ঢের ভাল ছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদ।

সুমন্তনারায়ণের রোজনামচায় ছিল অবিশ্যি লেখা আরো অনেক কথা।

চার্নক সাহেব বোকা ছিলেন না। সাধে কি তিনি সোনার সপ্তগ্রাম আর হুগলী ছেড়ে নাও ভাসিয়ে এসে কলকাতায় উঠেছিলেন একদিন!

অনেক ভেবেচিন্তেই এসেছিলেন। শত্রু—চট করে কোন শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালাতে পারবে না।

চারিদিকে বনজঙ্গল, জলাজমি, সল্ট লেক, কোন দিকে কোন রাস্তা নেই। তারপরেই ভাগীরথী। দস্যু মারাঠারাও চট্ করে এসে হামলে পড়তে পারবে না, আবার আসল যা ব্যবসা-বাণিজ্য তাও বেশ চলবে।

সুতানুটির হাট।

পাশের গাঁয়েই শেঠ বসাকদের বসবাস।

পর্তুগীজরা যখন জাহাজ-চলাচলের সুবিধার জন্য বেতোড় থেকে সালকেতে এলো, সেই সময়েই তো সপ্তগ্রামের মায়া কাটিয়ে কয়েক ঘর শেঠ ও বসাক তাদের ব্যবসাবাণিজ্য গুটিয়ে কলকাতায় এসে ডেরা বেঁধেছিল।

বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিম কূল। সেই পশ্চিম কূলেই ছিল ভদ্রলোক বলতে সেই সময়কার যারা তাদের বসবাস।

আর পূর্বকূল তো তখন বন-জঙ্গলে ভরা, ছায়া-রহস্যে ঘেরা, বলতে গেলে সুন্দরবনেরই একাংশ।

শুধু সুমন্ত রায়ই নয়, তাঁর মত আরো অনেকেই তাঁর আগে থাকতেই বর্গীর আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় আশায় ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে ভরসা করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে!

উত্তর-পূর্ববঙ্গের মত কলকাতা তখন অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া বা বসবাসের পক্ষে তেমনি সুবিধাজনক না হলেও এবং কাগজে-কলমে ও আইন-কানুনে নবাবের অধীনে থাকলেও, আসলে ঐ সময় প্রকৃতপক্ষে ফিরিঙ্গী বণিকেরাই ছিল কলকাতা শহরের সর্বেসর্বা। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী দুস্তর সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙ্গিয়ে, বাণিজ্যের লোভে যে ফিরিঙ্গী বণিকের দল হকিন্সের দলপতিত্বে একদা জাহাঙ্গীর বাদশাহের দরবারে এসে কুর্নিশ ঠুকে ভিক্ষা চেয়েছিলো, এই শস্যশ্যামলা সুজলাং সুফলাং ভারতে একটুখানি বাণিজ্যের অধিকার এবং যে সময় তাদের মুখে ছিল শান্ত, মৃদু, স্নিগ্ধ হাসি ও বিনম্র

বুলি—মহানুভব সম্রাটের তারা দাসানুদাস। তারপর অনেকগুলো দীর্ঘ বৎসর কালের স্রোতে মিলিয়ে গিয়েছে।

সুরাটে, মাদ্রাজে, হুগলীতে, কাশিমবাজারে, মালদহে, পাটনায়, ঢাকায় একে একে ফিরিঙ্গী বাণিজ্য-কুঠি তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে বাঙ্গলায়, হুগলীতে ফিরিঙ্গীদের ব্যবসা ভরাদীঘির মত কানায় কানায় টলমল হয়ে উঠছে। ক্রমশ সুতানুটির হাট হয়ে ওঠে জমজমাট। সুতানুটির দক্ষিণ দিকে গঙ্গার ঠিক কূল ঘেঁষেই একটা উঁচু ঢিপি—দুর্গের পত্তন হলো সেখানে। জলের বণিক ডাঙ্গায় এসে তৈরী করলে কেল্লা। তারপরেই শোভা সিংহের বিদ্রোহ। নবাবের অনুমতি মিলে গেল সেই অরাজকতার ডামাডোলের মধ্যে ইংরেজ বণিকদের কেল্লাকে সুদৃঢ় করে গড়ে তোলবার।

ভাগীরথী বহে চলে আগের মতই। কলকল ছলছল। তার ঘোলাটে জলে পড়া নয়া ইতিহাসের সুদৃঢ় গোড়াপত্তনের ছায়া ধীরে ধীরে একটু একটু করে।

শুধু বাণিজ্যের সুবিধা আ: আত্মরক্ষার জন্য কেল্লাই নয়, সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়িই হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেরেস্তা। প্রথমে ছিল ভাড়া নেওয়া কিন্তু তাতে বড় অসুবিধা। অতএব ফিরিঙ্গী কোম্পানী সেটা কিনে নিল। তারপর ক্রমশঃ শুরু হলো মাটি-ক্রয়—জমিদারী একটু একটু করে।

কাজে কাজেই কলকাতার জমিদার তখন ফিরিঙ্গীরা। তারা তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখে গড়ে তুললে ব্যস্ত নয়া কলকাতা শহর এক। তা•ছাড়া ফৌজদার বা নবাবের চেলা-চামুণ্ডাদের নিত্য নূতন অত্যাচার নেই। ফিরিঙ্গীরা জোর করে ঘরের সুন্দরী বৌ-ঝিদের ছিনিয়ে নিয়ে যায় না, দেনার দায়ে জোর করে ক্রিশ্চানও করে না। বে-সরকারী আধা-সরকারী নানা ধরনের প্রচুর কাজের জন্য সেখানে তখন কাজ চাইলেও পাওয়া যাচ্ছে, বেকার বসে থাকতে হয় না কাউকে।

সব চাইতে বড় কথা বর্গীর আক্রমণ থেকে রক্ষারও মস্ত আশ্রয়স্থল ফিরিঙ্গী বণিক জমিদার, তাদের সৈন্যসামন্ত, কেল্লা, বন্দুক, কামান, গোলা-গুলি কত হাতিয়ার আছে।

তাই অনেক ভেবেচিন্তে চলে এসেছিলেন সুমন্তনারায়ণ রায় সেদিন কলকাতায়, রাজধানীর মায়া কাটিয়ে।

রাত্রেই ঘাটে এসে নৌকার নোঙ্গর ফেলেছিলেন সুমন্ত রায় কিন্তু নামেননি। পরের দিন প্রত্যূষে কলকাতার মাটি স্পর্শ করলেন।

সামনে ঐ ফিরিঙ্গীদের চারপাশে ইঁটের গাথুনি তোলা কেল্লা। আর ঐ যে নোঙ্গরেশ্বর শিবের মন্দির।

মন্দিরঘাটে নেমে প্রথমেই পূজা দিলেন সুমন্তনারায়ণ নোঙ্গরেশ্বরের মন্দিরে।

কিশোরী রাধারাণীও অবগুণ্ঠনের ফাঁকে সকৌতুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।

এই কলকাতা!

কিন্তু কোথায় আশ্রয় নেবেন সুমন্তনারায়ণ! গোবিন্দপুরে একপ্রকার তখন ঠাঁই নেই বললেও চলে। বাসিন্দাতে ভরে গিয়েছে চারিদিক। বড়বাজার অঞ্চলেও ন স্থানং তিলধারণং, আর ফিরিঙ্গী-সাহেবপাড়াতে দেশী কালা আদমীদের জন্য প্রবেশ নিষেধ। কেনারাম অর্থাৎ কিনু চাটুয্যেকে পূর্ব থেকেই চিনতেন সুমন্তনারায়ণ। হাটখোলায় তারই সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন সুমন্তনারায়ণ।

আশ্রয় দিন চাটুয্যে মশাই, যেখানে হোক একটু। পরিবারবর্গ নিয়ে চলে এলাম এবারে আপনাদেরই আশ্রয়ে—বলে চাটুয্যের পা দুটো একেবারে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন সুমন্তনারায়ণ।

বেশ বেশ। মৃদু হেসে কিনু চাটুয্যে মশাই বললেন, জায়গা হবে বৈকি। সবই তাঁর ইচ্ছা, হরি ব্রহ্ম।

শহরের ক্রমবর্ধমান আশ্রয়ের চাহিদায় তখন পূর্বদিকের জঙ্গলের আদি-বাসীদের ঠেলে দিয়ে কলকাতায় নবাগতদের দল বাগবাজার হাটখোলা কুমার-টুলি, জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থানে ভাগীরথীর কূলে কূলে বসতবাটি তুলে বসবাস করছে। আপাততঃ হাটখোলাতে কিনু চ্যাটুয্যে মশাইয়ের গৃহেই উঠলেন সুমন্তনারায়ণ।

॥ ২ ॥

দিনসাতেক বাদে চাটুয্যে মশাই সুমন্তনারায়ণকে বললেন, চল হে সুমন্ত, তোমাকে বাজদর্শনটা করিয়ে আনি।

রাজদর্শন!

তা বৈকি। গোবিন্দ মিত্তির মশাই। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

কথাটা মিথ্যে নয়। সুতানুটি অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা ধনী ও নামকরা ব্যক্তি হচ্ছেন গোবিন্দ মিত্তির মশাই সে সময়।

কিছুকাল ইংরেজ বণিক কোম্পানির অধীনে ব্ল্যাক জমিদার ছিলেন, সেই সময়েই নানা উপায়ে মিত্তির মশাই প্রচুর অর্থসঞ্চয় করেছিলেন। শুধু কি পয়সার প্রাচুর্যেই একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন গোবিন্দ মিত্তির মশাই? তা নয়, ইংরেজের দরবারে ও কাউন্সিলেও তাঁর তখন প্রচুর প্রতিপত্তি।

কর্মতৎপরতায় মিত্তির মশাই প্রসিদ্ধ। তিনিই প্রথম গোবিন্দপুর থেকে বাস উঠিয়ে সুতানুটিতে এসে বসবাস শুরু করেন। স্বনামে বেনামীতে নানা ধরনের ব্যবসা, বাজারগুলো ইজারা নেওয়া জমি বিলি ইত্যাদি।

কিনু চাটুয্যের ইঙ্গিতে সুমন্তনারায়ণ একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মিত্তির মশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু আশ্রয় চাই।

মিত্তির মশাই তখন বাইরে বেরুবেন বলে প্রস্তুত হয়েছেন। সঙ্গে

হ্ঁকাবরদার, সরকার ও মোসাহেবের দল।

হ্ঁকাবরদারের হাতে হ্ঁকা, র্পালি জরিতে মোড়া নলটা মিত্তির মশাইয়ের হাতে। মধ্যে মধ্যে স্গন্ধী তাম্রক্টের ধোঁয়া ছাড়ছেন। হাতে সোনার ছড়ি।

লোকটি কে ঠাকুর মশাই? মিত্তির মশাই কিন্ চাটুয্যেকে ঠাকুর মশাই বলে সম্বোধন করতেন।

আজ্ঞে আমার আত্মীয়। কথাটা অবিশ্যি মিথ্যাই বলেছিলেন কিন্ চাটুয্যে।

একটু আশ্রয় দিতে হবে হ্জ্র ওঁকে।

হ্ঁ। আচ্ছা সন্ধ্যার পর কাল একবার আসবেন। বলে মিত্তির মশাই বের হয়ে গেলেন হাতের সোনার ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে।

স্মন্তনারায়ণকে নিয়ে অতঃপর ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে সব কিন্ চাটুয্যে দেখাতে লাগলেন।

বিরাট অট্টালিকা। অট্টালিকার লাগোয়াই একেবারে ন'টা চ্ড়াওয়ালা গোবিন্দ মিত্তিরের প্রতিষ্ঠিত নবরত্নের মন্দির।

এক সময় চুপিচুপি ঘ্রে ঘ্রে সব দেখতে দেখতে স্মন্তনারায়ণ কিন্ চাটুয্যেকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা চাটুয্যে মশাই, মিত্তির মশাইয়ের হাতে যে ছড়িটা দেখলাম ওটা কি সত্যি সত্যিই সোনার তৈরী নাকি?

নিশ্চয়ই, আগাগোড়া সোনা দিয়ে বাঁধানো। ঐ তো প্রসিদ্ধ গোবিন্দ মিত্তিরের ছড়ি। তারপরই ছড়াটা কাটলেন।

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দ মিত্রের ছড়ি।
জগৎশেঠের কড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি।

বনমালী সরকারটি কে চাটুয্যে মশাই?

আর একটু এগিয়ে চল না, দেখবে'খন সরকারের প্রাসাদ। এই কুমারটুলিতেই! আগে পাটনায় কমার্শিয়াল রেসিডেন্সের দেওয়ান ছিলেন, এখন কোম্পানির ডেপ্টি ট্রেডার। মস্ত ধনী!

আর ঐ উমিচাঁদ না কি?

আরে ঐ তো আমাদের শিখ বণিক উমাচরণ। নবাব দরবারে ওর খ্যাতিপ্রতিপত্তির কথা শোননি?

হ্ঁ।

হাটখোলা অঞ্চলেই নিজের জমি থেকে প্রায় সওয়া বিঘে জমি নিষ্কর দান করলেন গোবিন্দ মিত্তির কি জানি কি ভেবে স্মন্তনারায়ণ রায়কে তাঁর বসতবাটি তৈরী করে বসবাস করবার জন্য। এবং সেই সঙ্গে নিজের স্ন্দরী-কাঠের ব্যবসায় সরকার নিয্ক্ত করে দিলেন।

বিচক্ষণ কর্মঠ ও পরিশ্রমী সুমন্তনারায়ণ দেখতে দেখতে এক বৎসরের মধ্যেই যেন নিজের ভাগ্যের চাকাটা আবার ফিরিয়ে নিলেন। বলতে গেলে নিঃস্ব কপর্দকহীন অবস্থাতেই কলকাতা শহরে এসে পা দিয়েছিলেন সুমন্ত রায়।

গোবিন্দ মিত্তির মশাইয়ের অনুগ্রহে জমি পেয়ে প্রথমে সেখানে তুললেন মাটির বাড়ি, তারপর ক্রমশ সুন্দরী-কাঠের ব্যবসায় যখন বেশ দু পয়সা উপার্জন হতে লাগলো, ভাঙ্গা সংসার ও ঘরকে নতুন করে আবার ধীরে ধীরে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে মন দিলেন।

উদ্‌যোগিনঃ পুরুষসিংহম্‌।

পুরুষসিংহই ছিলেন সুমন্তনারায়ণ রায়। একাদশে বৃহস্পতির যোগ চলছে তখন তাঁর। সংসারে তো মাত্র পাঁচটি প্রাণী। তিনি নিজে, কিশোরী স্ত্রী রাধারাণী, বিধবা আশ্রিতা সুরধুনী, চণ্ডাল বালক কালীচরণ আর জনা-দুই ভৃত্য ও দাসী।

সংসারের যাবতীয় কাজ সুরধুনীই করে। রাধারাণীকে কিছুতে হাতই দিতে দেয় না।

দেখতে দেখতে আরো একটি বৎসর কালের স্রোতে মিলিয়ে গেল।

জলের বণিকদের নতুন ইতিহাস ধীরে ধীরে রচিত হচ্ছে ডাঙ্গায়।

ভাগীরথীর তীরভূমিতে শনৈঃ শনৈঃ নতুন এক শহর—কলকাতা, সরগরম হয়ে উঠছে। নানা দিক থেকে নানা শ্রেণীর লোক এসে শহরে ভিড় জমাচ্ছে।

বর্গীর হাঙ্গামায় অনেক দেশ উচ্ছন্নে গেলেও, সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ বণিকদের কোন ক্ষতিই হয়নি বলতে গেলে। এবং পূর্ববঙ্গের অবস্থাটা ভাল ছিল বলেই বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে ইংরাজ বণিকদের কাজকারবার বর্গীর ডামাডোলের মধ্যেও বন্ধ হয়নি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

বর্গীর হামলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য শহরে ইঞ্জিনিয়ার সার্ভেয়ার যারা ছিল, কাউন্সিল তাদের ডেকে একটা সভা করে—পরামর্শ করে শহর রক্ষার একটা প্ল্যান তৈরী করে ফেলে। শহরের উত্তর সীমানাতেই শত্রু-আক্রমণের সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী বলে চার কামানের এক ঘাঁটি সেখানে বসলো। জোড়াবাগানেও বসলো ছয় কামানের আর একটা ঘাঁটি। জোড়াসাঁকোয় তিন কামানের।

এবং সে সময়কার সাহেবপাড়া লালবাজারে তিন কামানের এক ঘাঁটি।

আর গোবিন্দপুর ও কলকাতার মাঝামাঝি চার কামানের একটি ঘাঁটি।

শহর-রক্ষাকর্তা ও মালিকের দল তো বেশ নিজের কোলের দিকে ঝোল টেনে নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যাপারটা পাকাপোক্ত করে নিলেন।

শহরের দেশীজনেরা পড়ল সব ফাঁপরে।

অতঃ কিম!

প্রস্তাব পাঠালো তখন সকলে মিলে কাউন্সিলেঃ আমাদের কি হবে

আত্মরক্ষার ? অনুগ্রহ করে উত্তর দিকের বাগবাজার থেকে দক্ষিণ দিকে কুলির বাজার পর্যন্ত একটা খাত কেটে দেওয়া হোক।

কাউন্সিল দেখলো, সে প্রচুর টাকার মামলা। অতএব তারা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। এদিকে শিয়রে সংক্রান্তি—কখন বর্গীরা এসে পঙ্গপালের মত হামলে পড়ে কে জানে! কাজে কাজেই সকল দেশীজনেরা পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে স্থির করলো—খাত কাটবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন. সেটা চাঁদা তুলে সাহেবদের হাতে তুলে দেবে তারাই।

হলোও তাই। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখা গেল, পরিকল্পিত সেই খাতটার আধাআধি খোঁড়া হবার পরই কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনদিনই কলকাতায় বর্গীর হামলা হয়নি।

কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করবার ঠিক বৎসর দুই পরেই সুমন্ত-নারায়ণের সংসারে এলো নতুন অতিথি। রাধারাণীর প্রথম সন্তান।

প্রচুর ঘটা ও জাঁকজমকের সঙ্গে নবজাতকের ষষ্ঠীপূজা হলো। কুলগুরু কালীশঙ্করের ইচ্ছামতই নবজাতকের নামকরণ করা হলো: কন্দর্পনারায়ণ। কন্দর্পই বটে। কাঁচা হরিদ্রার মত গাত্রবর্ণ। সাত দিনের হৃষ্টপুষ্ট শিশুটিকে দেখলে মনে হয় যেন এক মাসেরও বেশী বুঝি শিশুর বয়স।

কন্দর্পের জন্ম-তারিখের কথাটা বিশেষ করেই মনে ছিল যেন রাধারাণীর।

ছেলে হয়েছে, পাড়াপড়শী অনেকেই এসে ছেলে দেখে গিয়েছে কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তবু ছেলের বাপ সুমন্তনারায়ণ, রাধারাণীর স্বামী একটিবার এলেন না ছেলের মুখ দেখতে। অথচ তাঁরই তো সর্বাগ্রে এসে ছেলের চাঁদ মুখখানি দেখে আশীর্বাদ করে যাবার কথা! শেষটায় রাধারাণী ধৈর্য না রাখতে পেরে লজ্জা ও মানের মাথা খেয়ে দাসী গোলাপীকে ডেকে বলেছিল, তোদের কত্তাবাবুকে একবার আমার কথা বলে খবর দিয়ে আসতে পারিস গোলাপ ?

কেন পারবো না বৌঠান! এখুনি যাচ্ছি।

দাস-দাসীরা সকলে রাধারাণীকে বৌঠান বলেই ডাকতো। আর সুর-ধুনীকে ডাকতো ঠাকরুণ বলে।

কিছুক্ষণ বাদেই দাসী ঘুরে এসে বললে, কত্তাবাবু দেখলাম কাজ করছেন বৌঠান। অনেক লোক সেখানে। বনমালীকে বলে এসেছি কত্তাবাবুকে খবরটা দিতে।

জবাবে রাধারাণী আর কিছু বলেনি। কিন্তু মুখে কিছু না বললেও মনে মনে লজ্জায় ও অপমানের তিক্ততায় যেন গুমরে মরতে থাকে।

দুই বৎসরের অধিক বিবাহিত জীবনে রাধারাণী একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিল। স্বল্পভাষী স্বামীর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা লুকানো ক্ষত আছে। যেটা তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে অন্যের কাছ থেকে সর্বদা আড়াল করেই চলতেন যেন। এবং রাধারাণীর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, সেই ক্ষতটা তার

স্বামীর মনের মধ্যে ছিল তারই দিদি হেমাঙ্গিনীর স্মৃতিকে ঘিরেই।

লোকমুখেই বরাবর শুনে এসেছে রাধারাণী, তার দিদি হেমাঙ্গিনীর রূপের নাকি অবধি ছিল না। অশেষ রূপলাবণ্যময়ী হেমাঙ্গিনীকে যে তার স্বামী প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসতেন, অসাধারণ বুদ্ধিমতী রাধারাণীর সেটা বিবাহের পরেই স্বামীগৃহে এসে বুঝতে কষ্ট হয়নি বিবাহের পর স্বামী-গৃহের সেই প্রথম রাত্রে—আচমকা ঘুম ভেঙে স্বামী ও রঘুনাথের মধ্যে পরস্পরের কথাবার্তা যা তার কানে এসেছিল, কোনদিনই রাধারাণী সে কথা-গুলো ভুলতে পারেনি।

দু-একবার কথার ছলে সে যখনই তার দিদির প্রসঙ্গ স্বামীর কাছে উত্থাপন করবার চেষ্টা করেছে, স্বামী তার যেন শুরুতেই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিয়েছেন এবং গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন।

রঘুনাথও পারতপক্ষে কখনো তার দিদির কথা তার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়নি। সব কিছু জড়িয়ে রাধারাণীর মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল—তার দিদি হেমাঙ্গিনীর আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন একটা রহস্য কোথাও আছে।

প্রথম প্রথম তো বিবাহের পর স্বামীর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে বা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেই রাধারাণীর সাহসে কুলায়নি। বুকের ভিতরটা যেমন দুরু্দুরু্ করে উঠেছে।

তবু এখানে আসবার পর থেকে ভয়টা যেন একটু একটু করে কমছিল। স্বামীও মধ্যে মধ্যে ইদানীং হেসে আপনা থেকেই দু'চারটে কথা বলেন।

তাইতেই শেষবারের মত কয়েক মাস আগে একদিন রাত্রে স্বামী যখন তাঁর সঙ্গে কি একটা প্রসঙ্গ নিয়ে হেসে হেসে আলাপ করছিলেন, হঠাৎ আবার সেই পুরাতন প্রশ্নটা সাহসে ভর করে তুলেছিল রাধারাণী।

আমি যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি রাগ করবে?

কি কথা রে!

বলো, রাগ করবে না তো?

না, না— রাগ করবো কেন? বল কি বলছিস্?

বলছিলাম দিদি—

রাধারাণীর কথাটা শেষ হলো না, বাঘের মতই যেন একটা থাবা দিয়ে অর্ধপথে কথাটা থামিয়ে দিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

রাধারাণী!

সভয়ে তাকিয়েছিল রাধারাণী স্বামীর মুখের দিকে।

শিয়রের ধারের প্রদীপের আলো খানিকটা স্বামীর মুখের উপর এসে পড়েছে। মাথায় বাবরি চুল, গালপাট্টা, পাকানো গোঁফ, পিঙ্গল চোখের তারা দুটো কি একটা উত্তেজনায় যেন ঝক ঝক্ করছে।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে স্বামী বলেছিলেন, যে গত হয়েছে তাকে ভুলে

যাওয়াই ভাল। এবং কথাটা বলেই শয্যা থেকে নেমে কক্ষের অর্গল খুলে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ। সেরাত্রে আর শয়নকক্ষে ফিরে আসেননি সুমন্তনারায়ণ।

॥ ৩ ॥

সুমন্তনারায়ণ যে নবজাতকের মুখদর্শন করতে এখনো আসেননি, ব্যাপারটা সুরধুনীর দৃষ্টিতেও পড়েছিল। এবং গোলাপকে দিয়ে যে রাধারাণী ডাকতে পাঠিয়েছিল সুমন্তনারায়ণকে, সে কথাটাও গোলাপের মুখ থেকেই শুনেছিল সুরধুনী।

রাধারাণী না জানলেও সুরধুনীর অজ্ঞাত ছিল না—পুত্রদর্শন করতে কেন সুমন্তনারায়ণ আসেননি।

হেমাঙ্গিনী, সুমন্তনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী, সুরধুনীরই সমবয়সী ছিল এবং দুজনার মধ্যে আলাপ-পরিচয়ও ছিল। পুত্রবাসনায় হেমাঙ্গিনী যখন ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠেছে, সুরধুনীই তাকে সিংহবাহিনীকে পূজা দিয়ে পুত্র কামনা করতে উপদেশ দিয়েছিল। এবং সুরধুনীর অবিদিত ছিল না কি গভীর ভালবাসাই না ছিল সুমন্তনারায়ণের হেমাঙ্গিনীর প্রতি।

কিন্তু বেচারী রাধারাণীর দোষ কি?

তাই সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুমন্তনারায়ণ যখন শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপরে শুয়ে ফরসীর নলটা হাতে তাম্রকূট সেবন করতে করতে, চক্ষু দুটি মুদ্রিত করে বিশ্রাম উপভোগ করছিলেন, সুরধুনী নিঃশব্দে এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলো।

রায়মশাই কি ঘুমালে নাকি?

সুরধুনীর কণ্ঠস্বরে সুমন্তনারায়ণ চক্ষু মেলে তাকালেন।

কে! সুরো, এসো—

কি ব্যাপার তোমার বল তো?

কেন? কি হলো আবার?

অমন চাঁদের বরণ ছেলে হলো, সাত রাজার ধন এক মানিক, একটিবার দেখতে পর্যন্ত গেলে না!

সুমন্তনারায়ণ জবাবে কোন কথাই বলেন না। চুপ করে থাকেন।

কি গো, কথা বলছো না যে!

তা অত তাড়াহুড়ারই বা কি আছে? ছেলে যখন আমারই ঘরে এসেছে পালাচ্ছে তো আর না!

মৃদু হাসে সুরধুনী। মৃদু কণ্ঠে বলে, তা বলাই কি যায় নাকি! তা ছাড়া তোমার মনে পুরানো কথা জেগেছে বলেই যে আর একজনের মনের দিকে তুমি তাকাবে না এই বা কেমনধারা বিচার!

সুরো!

কিন্তু বাধা দিল সুরধুনী। বললে, না, আজই একটিবার গিয়ে ছেলেকে দেখে এসো।

তোমাকে দূত পাঠিয়েছে বুঝি?

না। দূত পাঠাবে কেন! মনে হলো কথাটা, তাই বলতে এলাম।

পরের দিনই প্রত্যূষে সুমন্তনারায়ণ আঁতুড়ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ডেকেছিলেন, এই গোলাপী, দাইকে বল ছেলেকে বাইরে নিয়ে আসতে।

প্রভুর আহ্বানে গোলাপীই নবজাতককে এনে সুমন্তনারায়ণের সামনে ধরেছিল। সুরো মিথ্যে বলেনি। সত্যি চাঁদের মত শিশু।

মুহূর্ত! পলকমাত্র পুত্রের, নিজের ঔরসজাত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে, হাতের চক্‌চকে সোনার বাদশাহী মোহর দশটা ছেলের বুকের উপর আলগোছা ফেলে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে স্থানত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ। ফিরেও আর তাকাননি।

আঁতুড়ঘরের শয্যায় শুয়ে শুয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছিলো ব্যাপারটা রাধারাণী। কিছুই তার নজর এড়ায়নি।

বস্তুত অন্য কোন কারণে নয়, সুরধুনীর সেদিনকার সে কথাগুলো উপেক্ষা করতে পারেননি সুমন্তনারায়ণ।

সুরধুনীর সঙ্গে সুমন্তনারায়ণের সম্পর্কটা যে ঠিক কি ছিল সেটা কেউ কোনদিন জানতে পারেনি। বাইরে থেকে চাক্ষুষ ওঁদের পরস্পরের আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় যেটুকু প্রকাশ পেতো, সেটা এত অস্পষ্ট যে তা থেকে কোন কিছু সঠিক ধারণা করে নেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

সুমন্তনারায়ণ ও সুরধুনী পরস্পরের সঙ্গে 'তুমি' সম্বোধন করেই কথা-বার্তা বলতো। এবং একটা ব্যাপার যা কারো কাছেই অস্পষ্ট ছিল না, সেটা হচ্ছে রায়-কর্তার উপরে সুরধুনীর যে একটা রীতিমত আধিপত্য আছে সেটাই।

পরবর্তীকালে রাধারাণী নিজেও দেখেছে—যেখানে সুমন্তনারায়ণ জগদ্দল পাথরের মত কঠিন অনড়, সেখানেও সুরধুনীর একটিমাত্র কথাতেই সুমন্ত-নারায়ণ রাজী হয়ে গিয়েছেন। স্বল্পভাষী ও চাপা প্রকৃতির লোক হলেও সুমন্তনারায়ণের ক্রোধটা ছিল ভয়াবহ। একবার ক্রুদ্ধ হলে তাঁর সামনে দাঁড়াবার কারো সাধ্য হতো না। কিন্তু সে ক্রোধও যেন নিমেষে নির্বাপিত হয়ে যেতো সুরধুনী একটিবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যদি বলতো, কি, এত চেঁচামেচি কেন?

মাথা নীচু করে একপাশে সরে যেতেন সুমন্তনারায়ণ যেন ধুলো-পড়া সাপের মতই।

অথচ মাত্র একটি দিন ছাড়া সুরধুনী যতদিন রায়বাড়িতে ছিল, কখনো মনে পড়ে না রাধারাণীর, সুরধুনীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর কোনদিনের বা কোন মুহূর্তের জন্য এমন কোন ব্যাপার দেখেছে যা থেকে সে ক্ষুণ্ণ হতে পারে বা লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করতে পারে স্ত্রী হিসাবে। অথচ নারীমন দিয়ে

রাধারাণী বুঝতো তাঁর স্বামী ও সুরধুনীর দুটি মনের মধ্যে কোথায় একটি অদৃশ্য সেতু রয়েছে, যে সেতুপথে তাদের মনের গোপন দেওয়া-নেওয়াটা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

তাতেই মনের মধ্যে রাধারাণীর একটা জ্বালা চিরদিন তাকে যেন দগ্ধে দগ্ধে মেরেছে। যে জ্বালা নিভাতেও পারেনি এবং যে জ্বালার কথা কাউকে কোনদিন মুখ ফুটে জানাতে পারেনি। বিশেষ করে স্বামী বা সুরধুনী দুজনের একজনকে কোন দিনই সে অভিযোগ জানাতে পারেনি রাধারাণী। নারীমনের এ হিংসা যে কি যে নারী ভুক্তভোগী সেই একমাত্র বুঝি জেনেছে।

ভিতরের কথা না জানলেও বাইরে যে সুরধুনীর একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছিল বর্গীর হাতে ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হবার পর থেকেই, সেটা এতটুকু অস্পষ্ট ছিল না কারো কাছেই। যে সুরধুনী হেসে ছাড়া কথা বলতো না, দিবারাত্র তাম্বুল-চর্বণে যার ওষ্ঠ দুটি সর্বদা লাল হয়ে থাকতো, সে তাম্বুলও যেমন ত্যাগ করেছিল তেমনি হাসতেও বুঝি ভুলে গিয়েছিল। মাথায় তৈল পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করেছিল। কালোপাড় শাড়িও আর ব্যবহার করতো না। তৈলহীন রুক্ষ কেশভার পৃষ্ঠব্যেপে ছড়িয়ে থাকতো।

সাদা থান পরিধানে। সমস্ত চেহারা ও বেশভূষায় যেন একটা বৈরাগ্যের শান্ত সমাহিত বেদনা। অকপট রিক্ততা।

কথায় কথায় সুরধুনীর সে হাসিও আর ছিল না। কৌতুকপ্রিয়তাও ছিল না। হাসতে যেন সে ভুলেই গিয়েছিল।

তবু—তবু যেন রাধারাণী সুরধুনীকে সহ্য করতে পারতো না। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হচ্ছে সহ্য তাকে না করতে পারলেও ব্যবহারে বা কথায়-বার্তায় সেটা প্রকাশ করবার যেন এতটুকু সাহসও হয়নি কোনদিন তার।

এমন একটা নিরবচ্ছিন্ন গাম্ভীর্যের গৌরবে সর্বদা নিজেকে সুরধুনী সমস্ত সংসারের মধ্যে সর্বব্যাপারে জড়িত রেখেও নিজের চারিদিকে একটা স্বাতন্ত্র্যের সুকঠিন গণ্ডি টেনে রেখেছিল, যেখানে প্রবেশ করবার কারো বুঝি সাধ্যই ছিল না। এমন কি সুমন্তনারায়ণেরও না। এবং সুরধুনীর সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কাছে সকলকেই মাথা নীচু করতে হতো।

মাত্র একটি রাত্রে একটি ব্যাপার রাধারাণীর চোখে পড়েছিল।

সেও অনেকদিন পরে। কন্দর্পনারায়ণ তখন সাত বছরের বালক।

রাধারাণীর বয়সও তখন বেড়েছে। হঠাৎ একরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রাধারাণীর মচ্‌মচ্‌ একটা শব্দে। প্রথমটায় ঘুমের চোখে বুঝতে পারেনি। পরে বুঝতে পারলে যখন দেখল তার স্বামী শয্যা থেকে নেমে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন।

এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন স্বামী তাঁর? সহজাত নারীমনের কৌতূহল। রাধারাণীও নিঃশব্দে স্বামীকে অনুসরণ করেছিল সেরাত্রে।

কক্ষের সামনেই অলিন্দ। মধ্যরাত্রির ম্লান চাঁদের আলো অলিন্দ-পথে এসে পড়েছে। এখানে ওখানে খানিকটা আলো খানিকটা ছায়া। আলো-

ছায়ার লুকোচুরি। সেই আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে একটা ছায়া-মূর্তির মত উত্তরের পোতার ঘরটির দিকে এগিয়ে চলেছেন সুমন্তনারায়ণ, রাধারাণীর স্বামী।

ওদিকে কেন যাচ্ছেন এত রাত্রে তার স্বামী?

উত্তরের পোতায় ঐ কক্ষেই তো থাকে সুরধুনী!

এতদিনে, এতদিনে তবে কি সত্য সত্যই রাধারাণী ওদের পরস্পরের গোপন সম্পর্কের ব্যাপারটা জানতে পারলো? কি এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রাধারাণীর বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে। ভয় যে হয় না তাও নয়। তবু কৌতূহলেরই হয় জয়। রাধারাণী নিঃশব্দে তার স্বামীকে অনুসরণ করে চলে।

টুক্‌ টুক্‌ টুক্‌।

সুরধুনীর কক্ষের বন্ধ দুয়ারে মৃদু সাংকেতিক করাঘাত করলেন সুমন্তনারায়ণ।

ছিঃ ছিঃ! কি ঘেন্না! তাহলে সত্যিই স্বামী তার ঐ বিধবা—একদা বর্গী কর্তৃক ধর্ষিতা গোয়ালার মেয়েটির গোপন প্রেমাভিলাষী? ছিঃ ছিঃ! এ দৃশ্য চোখে দেখবার পূর্বে তার মৃত্যু হলো না কেন? কান্নায় চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

ঠিক সেই সময় বন্ধ দরজা-কপাট দুটো খুলে গেল। আর চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল রাধারাণী, দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে সুরধুনী।

চট্‌ করে ক্ষিপ্রগতিতে রাধারাণী অলিন্দের একটা থাম্বার আড়ালে নিজেকে গোপন করে ফেলেছিল। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় তার সজাগ হয়েই ছিল।

কি ব্যাপার, এত রাত্রে? সুরধুনীর শান্ত স্নিগ্ধ নিরুদ্বেগ কণ্ঠস্বর।

সুরো!

মৃদু একটা হাসির শব্দ শোনা গেল।

কি হলো, বৌ তাড়িয়ে দিল নাকি ঘর থেকে?

সুরো!

কি?

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। ঘরে চলো।

কি এমন কথা যে এই মাঝরাত্রে তোমাকে উঠে আসতে হলো রায়মশাই?

আছে বৈ কি। ঘরে চলো বলছি।

মুহূর্তকাল কি যেন ভাবে সুরধুনী। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, এসো।

দুজনে কক্ষের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো। কক্ষের কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

পা টিপে টিপে রাধারাণী দেওয়াল ঘেঁষে কক্ষের অলিন্দ-মুখী খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে কান পেতে দাঁড়ালো। কিন্তু কিছুই তো শোনা যায় না। উঁকি দিল এবারে রাধারাণী জানালাপথে কক্ষের মধ্যে।

কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের ম্লান আলোয় রাধারাণী দেখতে পায়, সুরধুনী শয্যার উপরে বসে আর তাঁর স্বামী সুমন্তনারায়ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে। সুরধুনী ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে।

সুরধুনীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, কই, কি বলবে বলছিলে ?

তুমি আমার সঙ্গে ইদানীং এখানে আসা অবধি এরকম ব্যবহার করছো কেন ?

মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুরধুনীর মুখখানি। এবং পরক্ষণেই স্মিতকণ্ঠে বলে, কেন কি ব্যবহার করলাম আবার তোমার সঙ্গে রায়মশাই !

কি বলতে চাইছি আমি, তুমি কি তা বুঝতে পারছো না সুরো ?

ও, এই কথা !

দেখ সুরো, তোমার সব কিছু আমার সহ্য হয়, কিন্তু এই অবহেলা, ইচ্ছাকৃত এই অমনোযোগিতা—

ছিঃ, এসব কি বলছো !

না না···সত্যি বলছি এ আমার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

অভাগিনী সুরধুনীকে তুমিও যদি না বুঝবে তো আর কে বুঝবে রায়-মশাই ?

বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে যেন সুরধুনীর কণ্ঠস্বর।

না, না—সহসা উঠে দাঁড়ান সুমন্তনারায়ণ।

যাও, ঘরে যাও, ছেলেমানুষি করে না। ঘরে একা ঘুমুচ্ছে রাধারাণী।

তবে কি বুঝবো সুরো যে অতীতের সেই তুমি—

সহসা প্রদীপের আলোয় রাধারাণী দেখলো, সুরধুনীর দু চোখের কোলে জল এসে গিয়েছে। সে কান্না-ঝরা সুরে বলে, না, না—এ উচ্ছিষ্ট দেহ—দেবপূজায় আর এর কোন অধিকার নেই। কোন অধিকার নেই।···

সুরো—

না, না রায়মশাই, তুমি যাও, তুমি যাও।

সুরো ! সুরধুনী···

মুহূর্তের দুর্বলতায় সুরধুনীর মধ্যে একটা ভাবাবেগের চাঞ্চল্য আবর্তিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ততক্ষণে সে সেটা যেন সামলে নিয়েছে।

ধীর মৃদু কণ্ঠে এবারে বলে সুরধুনী, যাও—। ভুলো না তুমি রাধারাণীর স্বামী। হেমাঙ্গিনীর ছোট বোন, সে আমারও ছোট বোন।

দরজার দিকে এবারে সুমন্তনারায়ণ এগিয়ে গেলেন।

ঐ একটি, একটি মাত্র রাত। আর কোনদিন কখনো রাধারাণী তাঁর স্বামীর দিক থেকেও যেমন সুরধুনীর প্রতি দুর্বলতা দেখেনি, তেমন সুরধুনীর দিক থেকেও কোন অসংযম দেখেনি তার স্বামীকে কেন্দ্র করে।

তবু আশ্চর্য ! কোনদিন যেন সুরধুনীকে সহ্য করতে পারেনি। একটা চাপা আক্রোশ যেন চিরদিন তার বুকের নিভৃতে বিষের জ্বালার মত ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন, কেন যে এ আক্রোশ তার সুরধুনীর প্রতি হয়তো

নিজের কাছেও সেটা কোনদিন স্পষ্ট ছিল না রাধারাণীর।

অথচ তাঁর স্বামীর অনুগৃহীতা ফিরিঙ্গী মেয়ে ক্যাথারিন ও নাচনেওয়ালী মুন্না বাঈয়ের জন্য তো কোনদিন সে বিদ্বেষ রাধারাণীর বুকে অমন করে জ্বালা ধরায়নি!

শেষের দিকে তো সুমন্তনারায়ণ রাত্রে শয়নকক্ষে আসাই ছেড়ে দিয়েছিলেন একপ্রকার বলতে গেলে। হয় নিশি তাঁর ভোর হয়ে যেতো বন্ধু ইয়ার বক্সীদের নিয়ে বহির্মহলে নাচঘরে, নচেৎ হালসীবাগানে ক্যাথারিনের গৃহে।

হালসীবাগানে প্রচুর অর্থব্যয় করে সুমন্তনারায়ণ ফিরিঙ্গী মেয়ে ক্যাথারিনের জন্য এক সুরম্য অট্টালিকা তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে। দাসদাসী জুড়িগাড়ি সহিস কিছুরই অভাব ছিল না সেই ফিরিঙ্গী রমণীর সুমন্তনারায়ণের কৃপায়।

অথচ সুরধুনী, সুরধুনী যেন ছিল তার চোখের বালি। অতখানি ঘৃণা বুঝি জীবনে কখনো আর কাউকে করেনি রাধারাণী।

॥ ৪ ॥

বলতে গেলে যে কয়টা বছর আলিবর্দী বাঙ্গলার মসনদে বসেছিলেন, তার বেশির ভাগ সময়টাই মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে যুদ্ধক্ষেত্রে বর্গীদের পিছনে পিছনে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে হয়েছিল নবাব সাহেবকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর নবাবীর দিন প্রায় ফুরিয়ে আসবার মুখে বর্গীদের তেজ ও দাপাদাপিটাও যেন কিছুটা ঝিমিয়ে এলো—তোষামোদ ও ঘুষ দিয়ে। যে দেবতা যে মন্ত্রে বা উপাচারে তুষ্ট!

ওদিকে আবার বর্গীর হাঙ্গামা মিটলো তো শুরু হলো আদরের উচ্ছৃঙ্খল দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে নানান বিভ্রাট। আদর দিয়ে দিয়ে দৌহিত্রটির মস্তিষ্ক একেবারে চর্বণ করেছিলেন নবাব বাহাদুর। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয়ে এবং সেই অপদার্থ কতকগুলো মোসাহেবের নিরন্তর চাটুবাক্যে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিটা সিরাজের যে ক্রমশ বেড়েই উঠেছিল তাই নয়, রীতিমত উদ্ধত হয়ে উঠেছিল তার স্বভাব ও আচরণ।

সিরাজ অবিশ্যি বিশেষ কোন ব্যতিক্রম নয়। ঐ যুগে লাম্পট্য ও অনাচার নবাব ও তাঁর আত্মীয়বর্গদের চরিত্রের একটা বিশেষত্বই যেন হয়ে উঠেছিল। কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য কোন প্রকার কুৎসিত জঘন্য কাজই তাদের রুচিতে বাধতো না। রুচিবোধটা অত্যন্ত নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল সিরাজ।

অপদার্থ কতকগুলো তোষামোদ-প্রিয় সহচর কর্তৃক পরিবৃত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার যত প্রকার কুক্রিয়া কোনটাই তার বাদ ছিল না এবং সর্ব ব্যাপারে দাদু আলিবর্দীর প্রশ্রয় ও দৌর্বল্যের ক্ষমা পেয়ে সেটা ক্রমশ সীমাকেও যেন

ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কোন প্রকার নিষ্ঠুরতাতেই সিরাজের দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। চরমতর নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের মধ্যেও ক্ষমতার স্বৈরাচারের পাশবিক আনন্দ উপভোগ করাটা বোধ হয় সিরাজ-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

নচেৎ যে জঘন্য কুৎসিত যৌনাচার তার নিত্যক্রিয়ার অন্যতম ছিল, সেই দুষ্কৃতির অপরাধেই হতভাগ্য হোসেন কুলী খাঁকে সিরাজের হাতে নিষ্ঠুর মৃত্যুকে বরণ করতে হবে কেন?

কালো দেখতে হলেও ঢাকার দেওয়ান হোসেন কুলীর চেহারাটা ছিল সত্যকারের পুরুষোচিত ও সুঠাম।

আলিবর্দীর বংশের প্রত্যেকেরই চরিত্র ছিল যেমন কুৎসিত তেমনি জঘন্য।

সিরাজের মাতৃষ্বসা নোয়াজিস-পত্নী ঘসেটি বেগম হোসেন কুলীর দীর্ঘদিনের প্রেমের পাত্রী। সেই হোসেন কুলী যখন আবার সিরাজমাতা আকেশ বেগমের প্রতিও প্রেমাসক্ত হয়ে উঠলো, স্বভাবতই ঘসেটির সহ্য না হবারই কথা।

ওদিকে চির-লম্পট সিরাজেরও মাতৃষ্বসাজনিত প্রেমঘটিত ব্যাপারটা নবাব-বংশের আভিজাত্যের ও কৌলীন্যের অপমান বলে বোধ হওয়ায় সে হোসেন কুলীর ধ্বংসসাধনে তৎপর হয়ে উঠলো। এবং অচিরেই একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের উপর হতভাগ্য হোসেন কুলীকে টুকরো টুকরো করে কাটা হলো। ক্ষমতার স্বৈরাচারের এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

বাঙ্গলার মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী সিরাজের স্বৈরাচার ও যথেচ্ছাচার একদিকে, অন্যদিকে চলেছে তখন সিরাজ-কনিষ্ঠ একরামউদ্দৌলার এক অপোগণ্ড শিশুর নামে মসনদ অধিকারের এক গোপন কুৎসিত চক্রান্ত ঘসেটি বেগম ও রাজা রাজবল্লভের দলবলের—মতিঝিল প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে। রাজবল্লভ-পুত্র কৃষ্ণবল্লভ পিতার পরামর্শমত কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ওয়াট্‌স সাহেবের সুপারিশে।

চারিদিককার এই ডামাডোলের মধ্যে অবশেষে কলকাতায় সংবাদ এলো দীর্ঘ দুই মাস রোগশয্যায় শুয়ে থেকে ১০৫৬, ১০ই এপ্রিল তারিখে, ১১৬৯ হিঃ সালের ৯ই রজব্‌ ভোর পাঁচটার সময় কলমা আওড়াতে আওড়াতে মহব্বত জঙ্গ্‌ বাহাদুর আলিবর্দী খাঁ আশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন।

খুশবাগে তাঁর মায়ের কবরের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

আর ঠিক বোধ হয় সেই সঙ্গেই ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর সহাস্য আননখানি ফিরিয়ে তাকালেন ইংরাজ বণিকদের প্রতি।

বিনা বাধায় বাঙ্গলার অভিশপ্ত মসনদে বসলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। এবং গত কিছুকাল ধরে যে গোপন ষড়যন্ত্রের আগুনটা ছাই-চাপা হয়ে ধিকি ধিকি জ্বলছিল রাজা রাজবল্লভ ও ঘসেটি বেগমকে কেন্দ্র করে, মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের কক্ষে,—এবার সেটা ক্রমশ যেন একটা বিষাক্ত বাষ্পের মত বাঙ্গলার

ভাগ্যাকাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো অনিবার্য নিয়তির মত। কিন্তু বয়সে বালক ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হলে কি হবে, সিরাজ রীতিমত চতুর ছিল। অকস্মাৎ একদিন সে মতিঝিল চড়াও হয়ে ঘসেটি বেগমের লোকজন ও সৈন্য-সামন্তদের কয়েদ করে, তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ জোর করে অধিকার করে নিল। বেগমসাহেবা বন্দিনী হলেন সিরাজের অন্দরে।

ভাগীরথীর তীরভূমিতে তখন ফিরিঙ্গীদের হাতে তৈরী নয়া শহর কলকাতা ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠছে শনৈঃ শনৈঃ। নানা দিক থেকে নানা শ্রেণীর লোক এসে ক্রমশ শহরের মধ্যে ভিড় জমাচ্ছে।

বর্গীর হাঙ্গামায় অনেক দেশ উচ্ছন্নে গেলেও সাক্ষাৎভাবে ইংরাজদের কোন ক্ষতিই হয়নি। বর্গীর হাঙ্গামা ক্রমশঃ ঝিমিয়ে আসায় উত্তরে বাগবাজার থেকে দক্ষিণে কুলির বাজার পর্যন্ত যে খাত কাটবার পরিকল্পনাটা হয়েছিল সেটার অর্ধেকটা খোঁড়া হবার পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী কালের মারাঠা ডিচ্। পরে অবিশ্যি একসময় ঐ ডিচ্টা এণ্টালি মার্কেট থেকে বেক্বাগান পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তো পরের কথা। বর্তমানে ঐ আধ-খোঁড়া ডিচ্টা যেন আপনা থেকেই শহরের সীমানাটা চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

কন্দর্পনারায়ণের বয়স তখন বছর তিনেকের হবে।

মিত্তির মশাইয়ের দৌলতে সুমন্তনারায়ণের আর্থিক অবস্থাটা তখন অনেকটা সচ্ছল হয়ে এসেছে। কাজকারবার বেশ জমে উঠেছে।

সামান্য মেটে খড়ের বাড়ি ক্রমশ ইটের গাঁথুনিতে কিছুটা পাকা হয়ে উঠেছে। আভিজাত্যের পলেস্তারা লাগছে রায়-ভবনের দেওয়ালে দেওয়ালে।

ভবিষ্যৎ-রায়েদের বোলবোলাও ও গৌরবের বীজটা অঙ্কুরিত হচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ।

চতুর সুমন্তনারায়ণ ইতিমধ্যেই শহরের গণ্যমান্যদের সঙ্গে কিছু কিছু আলাপ ও দোস্তি পাতিয়েছেন। বিশেষ করে ফিরিঙ্গী কোম্পানির কাউন্সিলে যাদের প্রতিপত্তি ছিল তাদের নজরানা দিয়ে ও তোষামোদ করে করে।

লালটুপির প্রতিপত্তি একদিন যে সত্যিকারের আশ্রয়স্থল হবে সেটা সুমন্তনারায়ণ বুঝতে পেরেছিলেন।

কয়েকদিন ধরেই শহরে একটা থমথমে ভাব দেখা দিয়েছে। চারিদিকে একটা চাপা ফিসফিসানি, কেমন যেন একটা আতঙ্কের আভাস।

সন্ধ্যার দিকে গিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ গোবিন্দ মিত্তিরের বহির্মহলের আড্ডায়। সেখানেই ব্যাপারটা জানতে পারলেন।

নবীন নবাব সিরাজ নাকি একেবারে ক্ষেপে লাল হয়েছেন কলকাতার ফিরিঙ্গী কোম্পানির উপরে।

কড়া চিঠি এসেছে।

ইতিপূর্বে নারায়ণ সিংহের হাতে নবাবের এক জরুরী নির্দেশপত্র এসেছিল কলকাতার ইংরেজ প্রেসিডেণ্টের নামে, অন্যায়ভাবে তারা যে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠাবার জন্য।

ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে নারায়ণ সিংহ কলকাতায় এসেছিল এবং উমিচাঁদের গৃহে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন গভর্ণর সে সময় কলকাতায় উপস্থিত না থাকায় উমিচাঁদ তখনকার কলকাতার শহর-কোতোয়াল ও জমিদার হলওয়েলের কাছে নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

পরের দিন যখন গভর্ণর ড্রেক কলকাতায় ফিরে এলেন, তাঁর কাছে নারায়ণ সিংহকে উপস্থিত করা হলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, নারায়ণের দৌত্যের ব্যাপারটা ফিরিঙ্গী কোম্পানি একেবারে আমলই দিল না। তারা ভাবলে বুঝি সবটাই উমিচাঁদের একটা কারসাজি। কারণ উমিচাঁদ ঐ সময় ফিরিঙ্গী কোম্পানির নেকনজরে না থাকায় তারা মনে করলো, উমিচাঁদ ঐভাবে একটা জাল পত্র খাড়া করে আবার বুঝি তাদের নেক্‌নজরে পড়তে চায় নবাবের নামে একটা মিথ্যে ভয় দেখিয়ে।

অতএব গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল নবাবের প্রেরিত দূত নারায়ণ সিংহ।

একে উদ্ধত ফিরিঙ্গীরা তারই আশ্রয়ে থেকে তার মসনদে উপবেশন বা অভিষেককে সম্মান জানিয়ে নজরানা বা উপঢৌকন প্রেরণ করেনি বলে একটা অপমান ও আক্রোশের জ্বালা ছিল, তার উপর ফরাসীদের সঙ্গে এক অত্যাসন্ন সংঘর্ষের অজুহাতে শেষের দিকে নবাব আলিবর্দীর অসুস্থতার দরুন অব্যবস্থার সুযোগে ইংরাজরা কলকাতায় তাদের যে ভাঙ্গাচোরা দুর্গটাকে সংস্কার করে নিয়েছিল ও বাগবাজার পেরিংপয়েণ্টে দুর্গপ্রাকার ও কেলশাল সাহেবের বাগানের মধ্যে গড়বন্দী, সব কিছু মিলে উদ্ধত দাম্ভিক ও চপলমতি তরুণ নবাবের মনে এক প্রচণ্ড আক্রোশের আগুন যেন জ্বালিয়ে দিল। আলিবর্দীর সুখের পায়রা হঠাৎ যেন ডানা ঝাড়া দিয়ে পালোট খেল। এবং পূর্ণিয়া থেকে শওকৎজঙ্গকে উৎখাত করবার অভিযানের আগের দিনই কলকাতায় কোম্পানির প্রেসিডেণ্টের কাছে এক পত্র প্রেরিত হলো নবারের. দুর্গ ভেঙ্গে ফেল।

কিন্তু কি জানি কেন সিরাজবাহিনী পূর্ণিয়া অভিযানের পথে রাজমহল পর্যন্ত গিয়েই পুনরায় রাজধানীর দিকে মুখ ফেরাল। এবং রাজমহলে এসেই নবাবের দূত যে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে কলকাতা থেকে—সংবাদটা নবাবের কানে এলো।

কি, এতবড় স্পর্ধা ফিরিঙ্গীদের! বহুৎ আচ্ছা—চলো মুর্শিদাবাদ। এবং ২৪শে মে বিকালের দিকে নবাবী জমাদার ওমরবেগের নেতৃত্বে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য বারো হাজার অশ্বখুরের আঘাতে আঘাতে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চললো ফিরিঙ্গীদের কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করতে নবাবের আদেশে।

শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব নবারের কাছে এক মুচলেকাপত্র লিখে দিয়েও রেহাই পায়নি। কুঠি ও দুর্গ তো নবাবের হাতে তুলে

দিতেই হয়েছে, সেই সঙ্গে কালট্, ব্যাটসন ও ওয়াটস্ সাহেবকে নবাবশিবিরে নজরবন্দী হতে হয়েছে।

অপমানের জ্বালায় কুঠির তরুণ কর্মচারী লেঃ ইলিয়ট্ সাহেব আত্মহত্যা করেছে।

কুঠি বর্তমানে তালাবন্ধ ও লুণ্ঠিত এবং কামান গোলাগুলি বারুদ সব নবাবের হস্তগত।

কলকাতার ফিরিঙ্গী কোম্পানির কাউন্সিলাররা পরামর্শ করে নবাবকে একটা পত্র পাঠিয়েছে।

কিন্তু ব্যাপার যে সুবিধার নয় সেটা বুঝতে আর কারো বাকি নেই। ব্যাপারটা যে সত্যি সত্যিই সুবিধার নয় কিছুদিনের মধ্যেই সেটা জানা গেল।

সমস্ত শহরে একটা থম্‌থমে ভাব। আশঙ্কার একটা কালো ছায়া যেন চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে।

সুমন্তনারায়ণও শহরে নেই, সুন্দরবন গিয়েছেন। এমন সময় একদিন দ্বিপ্রহরে রাধারাণী যখন অলিন্দে বসে পাড়ার একটি মহিলার সঙ্গে গল্প করছিলো, দাসী গোলাপী এসে সামনে দাঁড়ালো।

চোখেমুখে তার একটা ভীতির কালোছায়া যেন।—কত্তাবাবু কবে আসবে বৌ-ঠাকরুন? গোলাপী শুধায় রাধারাণীকে।

কেন রে?

না, তাই শুধাচ্ছি!

কাল-পরশুই তো ফিরবার কথা। রাধারাণী বলে।

এদিকে যে ভীষণ ব্যাপার বৌ ঠাকরুন!

কেন, কি হল আবার?

হাজার হাজার সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে যে নবাব আসছে গো, এ শহর নাকি একেবারে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে।

যা, যা—

না বৌ-ঠাকরুন, সত্যি গো! সরকার মশাই যে সব শুনে এসেছে!

প্রতিবেশিনী মহিলাটিও যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন!

তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, আমাদের কত্তাও ঐরকম বলছিলেন গো বৌ। ঐ যে কেষ্টবল্লভ না কে তাকে নাকি কোম্পানির সাহেবরা কেল্লার ভিতরে নিয়ে আটকে রেখেছে। উনি বলছিলেন ঐসব লালটুপিওয়ালাদের বজ্জাতি দেখে নবাব নাকি ভীষণ চটে গেছে। সেপাই লস্কর কামান নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা আসছে—

সত্যি?

ওমা, সত্যি নয় তো কি মিথ্যে! দেখো না নবাব এসে ঐসব লালমুখো সাহেবদের এক এক করে কামানের মুখে দাঁড় করাবে আর উড়িয়ে দেবে। কত্তা বলছিলেন কেল্লায় নাকি সব তোড়জোড় লেগে গেছে। যাকে কাছে পাচ্ছে সেপাই বানিয়ে নিচ্ছে।

বল কি !

এবার রাধারাণীর কণ্ঠস্বরেও যেন কেমন একটা আশঙ্কার সুর জাগে।

দাসী বলে, হ্যাঁ বৌ-ঠাকরুন, সরকার মশাই বলছিলেন সাহেব-বিবিরা সব দলে দলে কলকাতা ছেড়ে চুঁচড়ো চন্দননগর চলে যাচ্ছে।

তা নবাবের ঐ সাহেব-বিবিদের ওপরেই রাগ যখন, তখন ওদেরই গুলি করে মারবে, কি বলো দিদি ?

কথাটা বলে রাধারাণী প্রতিবেশিনীর মুখের দিকে তাকায়। নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই হয়তো কথাটা বলে রাধারাণী।

কিন্তু প্রতিবেশিনী বলেন, যুদ্ধ হলে গোলাগুলি চললে কে কোথায় বাঁচবে মরবে তার কিছু ঠিকঠিকানা আছে বৌ !

যুদ্ধ !

কথাটা বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় রাধারাণী প্রতিবেশিনীর মুখের দিকে।

শুধু কি যুদ্ধ, কত্তা বলছিলেন, সেই সঙ্গে ঐসব সৈন্যদের লুঠতরাজ বেলেল্লাপনা চলবে না ?

চকিতে মুর্শিদাবাদের সেই ভয়াবহ স্মৃতিটা মনের পাতায় ভেসে ওঠে রাধারাণীর। সেই বর্গী দস্যুর বেপরোয়া লুণ্ঠন, অত্যাচার। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি শিউরে ওঠে রাধারাণী।

পরের দিন ঘটে গেল এক বিষম কাণ্ড !

উমিচাঁদকে কোম্পানির সাহেবরা ধরে নিয়ে গিয়ে কেল্লায় বন্দী করেছে। উমিচাঁদকে কেল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেই তারা সন্তুষ্ট হলো না, কুবেরের ঐশ্বর্য উমিচাঁদের, পাছে উমিচাঁদ তার সমস্ত ঐশ্বর্য তাদের ফাঁকি দিয়ে কোথাও সরিয়ে ফেলে সেই আশঙ্কায় কোম্পানির কুড়িজন সশস্ত্র প্রহরী তার বাড়ির দরজায় নিযুক্ত করে রেখে দিল তারা। কিন্তু যে আশায় প্রহরী নিযুক্ত করা হলো তার কোন সুরাহাই দেখা গেল না। উমিচাঁদের এক আত্মীয়, হুজারিমল্লই ছিল তার প্রধান কার্যাধ্যক্ষ। কোম্পানির লোকেরা ভাবলে, তাকে পাকড়াও করতে পারলেই বোধ হয় উমিচাঁদের ঐশ্বর্যের চাবিকাঠিটা হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যাবে। ফলে বাড়ির ভিতর থেকে ধরবার চেষ্টা করতে যেতেই কোম্পানির লোকদের সঙ্গে উমিচাঁদের আমলা ও কর্মচারীদের লেগে গেল প্রচণ্ড এক হাতাহাতি ও লাঠালাঠি।

সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার।

উমিচাঁদের অন্দরে স্ত্রী ও শিশুদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল ভয়ে।

ওদিকে লালমুখো বাঁদরগুলো তখন অন্দরে প্রবেশের উদ্যোগ করছে।

উমিচাঁদের প্রধান বরকন্দাজ জমাদার জগমন্ত সিং দেখলে ঐ লালমুখো শয়তানগুলোকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, ওরা ঢুকবেই অন্দরে। অন্তঃপুরিকাদের লাজ সম্ভ্রম কতকগুলো ম্লেচ্ছ বিধর্মী কুত্তার হাতে লাঞ্ছিত হবে সে বেঁচে থাকতে ! না, না—তা সে হতে দিতে পারে না। মুক্ত কৃপাণ হাতে ছুটে গেল অন্দরে জগমন্ত সিং এবং নিষ্ঠুরের মতই অন্তঃপুরচারিণী ও

শিশুদের হত্যা করলো একের পর এক। সকলকে হত্যা করে নিজে যখন সেই কৃপাণ নিজের গলায় বসিয়ে আত্মহত্যা করতে চলেছে, মার মার কাট্ কাট্ করে লালমুখ সিপাইরা ভিতরে এসে ঢুকলো।

হাতের কাছে যা পেল লুঠ করে তারা চলে গেল হৈ-হৈ করতে করতে।

আর আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ আহত জগমন্ত সিং সেই রক্তস্রোতের মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো তারই হাতে দ্বিখণ্ডিত প্রাণহীন নারী ও শিশুদের দেহ-গুলোর দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইলো।

পরের দিন সংবাদ এসে পেঁছালো শহরে—ঝড়ের গতিতে বিরাট বাহিনী সহ নবাব হুগলীতে এসে পেঁাছেছেন।

দাবাগ্নির মতই নবাবের আগমন-সংবাদটা চরের মুখে শহরে পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই শহরে যেন হুলস্থূল পড়ে গেল।

পরের দিন সুমন্তনারায়ণ সুন্দরবন থেকে ফিরে এলেন।

অনিশ্চিত একটা বিভীষিকায় সমস্ত শহর থম্‌থম্ করছে—অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা চারিদিকে। সাহেবপাড়া একপ্রকার খালি বললেও হয়। বহু সাহেব তাদের বিবিদের নিয়ে চুঁচড়ো চন্দননগরে নৌকাযোগে পালিয়েছে। যাদের সঙ্গে কোম্পানির কর্তাদের দহরম-মহরম আছে, তারা স্থান পেয়েছে কেবল দুর্গের মধ্যে। যারা পায়নি তারাও দুর্গে প্রবেশ করবার জন্য ঠেলাঠেল চেঁচামেচি লাগিয়েছে।

শহরের দেশী অধিবাসীরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে যে যার ঘরে অর্গল তুলে।

মরতে মরণ তাদেরই তা কি আর তারা জানে না!

গৃহে পেঁছাতে সরকার উমাচরণের মুখেই সমস্ত সংবাদ অবগত হলেন সুমন্তনারায়ণ।

॥ ৫ ॥

এখন উপায়!

সুমন্তনারায়ণ তাকালেন প্রৌঢ় সরকার উমাচরণের মুখের দিকে। পাশেই দাঁড়িয়েছিল ব্রিজনন্দন পাঁচহাত প্রমাণ একটা চকচকে বাঁশের লাঠি হাতে। সে কেবল বারেকের জন্য লোহার মত শক্ত কব্জিতে লাঠিটা চেপে ধরে শান্ত গলায় বললে, ভাবছেন কেন হুজুর! ব্রিজনন্দনের হাতে যতক্ষণ লাঠি আছে, এ বাড়ির চৌকাঠ কাউকে ডিঙ্গোতে দেবো না।

উমাচরণ খিঁচিয়ে ওঠেন, বোকা মুখ্যু আর কাকে বলে, বন্দুক আর গোলা-গুলি তুই লাঠি দিয়ে ঠেকাবি, না?

কিন্তু পালাবার তো এখন আর কোন পথ নেই উমাচরণ। মাঝিমাল্লাদেরও কি এখন আর কাউকে পাবে! কথাটা বললেন সুমন্তনারায়ণ।

ভেবে ভেবে আমিও এ কয়দিন কোন পথ খুঁজে পাইনি কত্তা।

গভর্ণর ড্রেক সাহেবটা একটা মুখ্যু। গোঁয়ারগোবিন্দ। তখন মিত্তির মশাই বার বার করে বললেন মিটিয়ে নিতে! বুঝবে এখন ঠেলা। মরুকগে

বেটা। কিন্তু আমি ভাবছি, যুদ্ধ একটা হবেই। আর যুদ্ধ যদি একবার বাধে তো সৈন্যরা সব শুরু করবে লুঠ।

হুঁ, আমিও তাই ভাবছি।

দাসী এসে ঐ সময় জানালো অন্দর থেকে ঠাকরুন একবার ডাকছেন।

ঠাকরুন অর্থাৎ সুরধুনী।

প্রায় একমাস বাদে সুন্দরবন থেকে ফিরে এখনো তিনি অন্দরে পা দেননি। কথাটা মনে হতেই আর দেরি করলেন না সুমন্তনারায়ণ, তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন। যাবার আগে কেবল উমাচরণকে বলে গেলেন অপেক্ষা করতে।

অন্দরের মুখেই দরজার গোড়াতে দাঁড়িয়েছিল সুরধুনী।

কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব কেন? মৃদু হাস্যে কথাটা বলে তাকালেন সুমন্তনারায়ণ সুরধুনীর মুখের দিকে।

ব্যাপার আবার কি! ঘরের কথা বুঝি মনে পড়ে না! এতদিন বাদে ঘরে এলে বৌ-ছেলের মুখটাও তো একবার দেখতে সাধ যায় মানুষের!

বৌ-ছেলের কথা মনে না হলেও একটি মুখের কথা মনে হয়েছিল বৈকি।

ছিঃ ছিঃ, তুমি কি বল তো রায়মশাই! মুখের লাগামও কি নেই—

তা কি বলবো বলো? মন যাকে অহরহ চায়—

থাক, থাক—এখন ঘরে যাও। বৌয়ের কাল রাত থেকে জ্বর।

জ্বর!

হ্যাঁ যাও। বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না, তার নিজের কক্ষের দিকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো সুরধুনী।

শোন, শোন সুরো—

সুরধনী কিন্তু সে ডাকে সাড়াও দিলে না, ফিরে দাঁড়ালোও না। বারান্দার থামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তকাল সেখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন সুমন্তনারায়ণ, তারপর স্ত্রী রাধারাণীর শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

কয়েক পা এগুতেই স্ত্রীর শয়নকক্ষের ঠিক কাছাকাছি বারান্দার একধারে কালীচরণ ও তাঁর পুত্র কন্দর্পনারায়ণকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন। বাপ-মা-মরা হতভাগা ছেলেটা ইতিমধ্যে কৈশোরের কোঠা প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে। বছর চোদ্দ বয়স হতে চললো প্রায়, কিন্তু দেখতে এর মধ্যেই এমন ষণ্ডাগুণ্ডা হয়ে উঠেছে যে, কে বলবে তের-চোদ্দ বছর বয়স ছেলেটার মাত্র। কালো কষ্টিপাথরে নিটোল দেহের সবটাই যেন প্রায় ভরাট ভরন্ত।

চার বৎসরের শিশু কন্দর্পনারায়ণকেই বসে বসে খেলা দিচ্ছিল কালীচরণ।

কন্দর্পের মতই স্বর্ণকান্তি কন্দর্পনারায়ণের।

দু'হাতে ধরে দোলাচ্ছিল চার বছরের বালক কন্দর্পনারায়ণকে কালীচরণ, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন একটা কৃষ্ণবর্ণ সরীসৃপ কন্দর্পকে আষ্টেপৃষ্ঠে পাক দিয়ে রয়েছে। সুমন্তনারায়ণের পায়ের সাড়া পেয়েই কালীচরণ তাকালো প্রভুর

দিকে। সাদা দাঁতগুলো বের করে নিঃশব্দে হাসলো।

একটা কথা হঠাৎ সুমন্তনারায়ণের মনে পড়ে গেল, বিবাহের পর মুর্শিদাবাদের গৃহে আসবার মাসখানেক বাদে একদিন রাত্রে তাকে কথাটা বলেছিল রাধারাণী।

রঘুর ঐ ছেলেটা. কালী না কি নাম, ওর চোখ দুটোর দিকে কখনো চেয়ে দেখেছো ?

কেন রে!

আমাদের ভিটেতে একটা বাস্তু কেউটে ছিল। ক্বচিৎ কখনো কালেভদ্রে দেখা যেতো। একবার ভাদ্র মাসের দুপুরে ঘর থেকে বেরিয়ে আঙ্গিনায় নেমেছি, হঠাৎ দেখি সেই সাপটা এঁকেবেঁকে চলেছে আঙ্গিনা দিয়ে খিড়কির দরজার দিকে, ভয়ে একটা অস্ফুট চিৎকার করে দাওয়ার উপরে থমকে দাঁড়াতেই সাপটাও তার চলা থামিয়ে ফণা তুলে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। সাপটার সঙ্গে আমার মাত্র হাতিতিনেকের ব্যবধান, কালো কুচ্‌কুচে গায়ের রং। ফণাটার উপরে একটা চক্র। আমার দিকে চেয়ে সাপটা ফণা দোলাতে লাগলো। ভয়ে আমি তখন বোবা হয়ে গিয়েছি। চলবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। একদৃষ্টে চেয়ে আছি সাপের চোখ দুটোব দিকে। জীবনে কোনদিনও ভুলব না সে চোখের দৃষ্টি। ঐ কালীর চোখের দিকে তাকালে মনে পড়ে যায় আমার সেই চোখের কথা।

মৃদু হেসে সুমন্তনারায়ণ বলেছিলেন, পাগলী! যতসব উদ্ভট কথা!

ক্ষণেকের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ। আবার সামনের দিকে তাকাতেই দেখলেন নিঃশব্দে কালীচরণবারান্দা থেকে নেমে পশ্চিম দিককার ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে, আর পুত্র কন্দর্পনারায়ণ তাকে অনুসরণ করছে।

নারায়ণ! সুমন্তনারায়ণ ছেলেকে ডাকলেন। নারায়ণ বলে সুমন্তনারায়ণ ছেলেকে ডাকতেন।

ছেলে বাপের দিকে ফিরে তাকালো, আর হাত বাড়ালেন ছেলের দিকে সুমন্তনারায়ণ।

কন্দর্প কিন্তু বাপের দিকে এগোয় না। যেমন দাড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে তার কি একপ্রকার ভীত অসহায় দৃষ্টি!

সুমন্তনারায়ণ বড় একটা ছেলের ধারেকাছেও যেতেন না। নিজের কাজকর্ম নিয়ে সর্বদা এত ব্যস্ত থাকতেন যে, ছেলেকে আদব করবার সময়ই হতো না কখনো তাঁর। আর হবেই বা কি করে ? সেই কোন্‌ ভোরে কাকপক্ষী ডাকবার আগে শয্যা থেকে উঠে সোজা গঙ্গাস্নানে চলে যেতেন। ফিরে গিয়ে ঢুকতেন পূজার ঘরে।

গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজা সেরে যখন বের হতেন বেলা তখন প্রায় আটটা-সাড়ে-আটটা। তাবপর চারটি জলপান খেয়ে চলে যেতেন বহির্মহলে। ফিরতেন অন্দরে আবার বেলা দেড়টা-দুটোয়। আবার বের হতেন চারটে নাগাদ এবং ভিতরে আসতেন রাত এগারটার পর। অতএব পুত্রের সঙ্গে পিতার দেখা

হবেই বা কখন।

পিতাও যেমন পুত্রের কাছে আসতেন না, পুত্রও পিতার কাছাকাছি যাবার কোন সুযোগ তেমন পায়নি জীবনে। সেই কারণেই পিতা ও পুত্রের পরস্পরের মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সংসারে, সেটা গড়ে ওঠবার কোন অবকাশই ঘটেনি।

আসল কথা স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার এসবের প্রতি কোন আকর্ষণই যেন আর ছিল না সুমন্তনারায়ণের। কেবল ঐশ্বর্য, আর ঐশ্বর্য! কেমন করে আবার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরিয়ে ইন্দ্রের ঐশ্বর্যকে করায়ত্ত করবেন, এই ছিল তাঁর দিবা-রাত্রের একমাত্র স্বপ্ন। নেশাও বুঝি বলা যায়।

জীবনে যে নারী এনেছিল তাঁর মনে প্রথম প্রেমের স্বপ্ন, যাকে ঘিরে পুরুষ-মন তার আনন্দের পাখা মেলেছিল জীবন-আকাশে, সেই হেমাঙ্গিনীকে হারিয়ে অবধি নারী মাত্রেই তাঁর আর যেন তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না।

কতকটা তাও বটে, আবার অনায়াসলব্ধ যা, হাতের মুঠোর মধ্যে ইচ্ছা করলেই যা যে কোন মুহূর্তেই পাওয়া যেতে পারে, চিরদিনই সে সব কিছুর উপরে সুমন্তনারায়ণের আকর্ষণটা যেন কেমন ঝিমিয়ে যেতো।

ঘরণী ও সহধর্মিণী হয়েও তাই কোনদিন রাধারাণী তার মনের আশ মিটিয়ে যেমন স্বামীকে পায়নি, তেমনি স্বামীর প্রতি যে অভিমানের জ্বালাটা তার বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে মরছে, তারও প্রশমন কোনদিন হয়নি।

কন্দর্পনারায়ণ বাপের দিকে চেয়ে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

সুমন্তনারায়ণ আর ছেলেকে কাছে আসবার জন্য ডাকলেন না, স্ত্রীর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

রাধারাণী শয্যার উপর শুয়েছিল। স্বামীর পদশব্দে শয্যার উপর উঠে বসবার চেষ্টা করতেই বাধা দিয়ে সুমন্তনারায়ণ বলে উঠলেন, থাক থাক—

স্ত্রীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ—তোর ছেলেকে কাছে ডাকলাম, সে এলো না! স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কথাটা বললেন।

আসবে কি, কখনো কি কাছে ডেকে আজ পর্যন্ত আদর করেছো?

তাই বলে ডাকলে আসবে না!

না। শুধু ও কেন, কেউই যেতো না।

সুমন্তনারায়ণ কোন জবাব দেন না স্ত্রীর কথার, কেবল মৃদু একটু হাসেন।

বোস না একটু! রাধারাণী বলে।

বল্ না কি বলতে চাস্?

কেন, আমার শয্যায়ও কি একটিবারের জন্য বসলে তোমার জাত যাবে!

সুমন্তনারায়ণ সহসা হাত বাড়িয়ে অভিমান-স্ফুরিত রোগতপ্ত রাধারাণীর গালটা একটু টিপে দিয়ে বললেন, পাগলী—

থাক, হয়েছে ! বলে গালটা সরিয়ে নেয় রাধারাণী।

রাধারাণীর অভিমানটা ঠিক তার দিদি হেমাঙ্গিনীর মতই। রাগলে বা অভিমান হলে তার মুখটাও ঠিক এমনি রাঙা হয়ে উঠতো। এমনি থম্‌থম্‌ করতো।

কিন্তু তফাৎ ছিল একটু, রাগলে বা অভিমান হলে হেমাঙ্গিনী স্বামীকে তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে দিত না। সাপের মতো ফোঁস করে উঠতো।

সত্যি, রাগ আর অভিমান হেমাঙ্গিনীর দুটিই ছিল যেন দুর্জয়।

কিন্তু রাধারাণীর রাগ বা অভিমান তার দিদি হেমাঙ্গিনীর মত হলেও এবং দু'চারবার হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেও, শেষ পর্যন্ত কেন জানি সে আত্ম-সমর্পণ না করে পারতো না স্বামীর কাছে।

সুমন্তনারায়ণ সেটুকু জানতেন বলেই নিশ্চিন্ত মনে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। বললেন, শুনলাম যুদ্ধ করতে আসছে শুনে তুই নাকি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিস !

কে বললে ?

কেন, বলবার লোকের অভাব আছে নাকি ?

তা জানি, এ বাড়িতে বানিয়ে দশটা মিথ্যে বলবার লোকের অভাব নেই : কিন্তু তাদের তুমি বলে দিও, জুজুর ভয় নেই রাধারাণীর। সে তার দাদুর কাছে শুধু শাস্ত্রপাঠই নেয়নি, লাঠি ধরতেও শিক্ষা করেছে।

কথাটা মিথ্যে বলেনি রাধারাণী। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই সে তার দাদু সার্বভৌমের কাছে লাঠিচালনা শিক্ষাও পেয়েছিল। ভয় বস্তুটা তার চিরদিনই একটু কম ছিল।

কিন্তু সুমন্তনারায়ণ হেসে বললেন, তাই বুঝি বীরাঙ্গনা বর্গীর ভয়ে সেদিন ঘরের দোরে খিল এঁটে বসে বসে কেঁপেছিলি !

আজ্ঞে না মশাই, সেজন্য নয়।

তবে কি জন্য রে ?

শয়তানগুলো একসঙ্গে যদি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আমার ইজ্জত নষ্ট করতো, কতক্ষণই বা তাদের সঙ্গে যুঝতে পারতাম ! সেই দুশ্চিন্তাতেই তো—

দরজায় খিল তুলে বসেছিলি ! তা বেশ করেছিলি—কিন্তু হ্যাঁরে, এতই যদি তোর সাহস তো একা গঙ্গাস্নান করতে যেতেই বা পারিস না কেন, আর কোথাও বেরুতে হলে একগলা ঘোমটাই বা টেনে দিস কেন ?

ওমা, তাও জানো না বুঝি ! দাদুই তো বলতেন—ওটা যুগের প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ শেখানো বুলিটাই আওড়ে যায় রাধারাণী। দাদু হরিহর সার্ব-ভৌমের কাছেই তার শোনা কথাটা। আগেকার দিনে বাংলাদেশের কুলললনারা স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ছিল। ঘোমটার বালাই ছিল না মুখচন্দ্রিমার উপরে। ওটার প্রচলন হয়েছে নবাবী আমল থেকে। নবাব বাদশা ওমরাহ ও মুসলমান রাজ-কর্মচারীদের লোলুপ দৃষ্টিপথ থেকে নিজেদের সতীত্ব, নারীত্ব ও মর্যাদাকে বাঁচাবার জন্যই একপ্রকার বাধ্য হয়ে কুলকামিনীদের মুখচন্দ্রিমার উপরে টেনে

দিতে হয়েছিল সেদিন অবগুণ্ঠন।

কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে? অবগুণ্ঠনের রহস্য আরো তাদের দৃষ্টিকে লোলুপ করে তোলে!

রাধারাণীর অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিবাদ জানাতে পারেন না সুমন্তনারায়ণ। তা সে রাধারাণীর শেখানো বুলিই হোক বা অন্য কিছুই হোক।

রাধারাণী আরো বলে, তোমাদের পুরুষগুলোর মত হ্যাংলা আছে নাকি! অল্পবয়সের মেয়েছেলে দেখলেই সাপের মত তাকাবে!

তাই বুঝি! আর তোরা মেয়েরা একেবারে নির্লোভ নিষ্পাপ! কাম জিনিসটা একেবারে জয় করে বসে আছিস চিরদিনের মত! মনের মত পুরুষ দেখলে তাকাস না তোরা, না রে?

বহুদিন বাদে সুমন্তনারায়ণ যেন কেমন রহস্যপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

রাধারাণীও তার শরীরের অসুস্থতার কথাটা যেন ভুলে যায়।

কিন্তু তাদের আলাপে ছেদ পড়লো। সুরধুনী এসে ঐ সময়ে ঘরে ঢুকলো।

কি ব্যাপার বল তো রায়মশাই, স্নান-আহ্নিক সেরে মুখে কিছু দিতে হবে না, না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—দিতে হবে বৈকি। তাছাড়া একবার মিত্তির মশাইয়ের ওখানে যেতে হবে।

সুমন্তনারায়ণ যেন সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বোধ হয় একটু লজ্জাও মনে মনে অনুভব করেন। সমস্ত শহরের উপরে যে বিপদের কালো-মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, সে কথাটা যেন মুহূর্তের জন্য ভুলেই গিয়েছিলেন।

একটু দ্রুতপদেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

রাধারাণীর আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা সহসা যেন থমথমে হয়ে ওঠে।

সুরধুনী রাধারাণীর শয্যার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলে, জ্বরটা বেড়েছে? দেখি—হাতটা বাড়িয়ে সুরধুনী কপালটা স্পর্শ করবার চেষ্টা করে রাধারাণীর।

কিন্তু চকিতে মাথাটা সরিয়ে নেয় রাধারাণী। গম্ভীর কণ্ঠে বলে, জ্বর ছেড়ে গেছে।

তবে এক বাটি দুধ পাঠিয়ে দিই, খেয়ে নাও। কাল থেকে তো কিছু খাওনি।

না, খিদে নেই।

তা বললে কি চলে! শরীরকে বেশি উপোস দিলে যে কাহিল হয়ে পড়বে।

রাধারাণী আর কোন জবাব দেয় না।

মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

॥ ৪ ॥

আলিনগর

নবাব বাহাদুরকা ফৌজ
বৈসি খোলা তলোয়ার।
ঘড়ি ভরমে জিত লিয়া
কেল্লা কলকাতা বাজার॥

॥ ১ ॥

দুম্ দুম্ দুড়ুম !…

ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধ ও কর্ণবিদারী গোলাগুলির শব্দ সমানে চলেছে সেই বেলা তিনটে থেকে।

মাঝখানে খাল, তার পাশেই একটি সেতু একেবারে পেরিং পয়েণ্টের গা ঘেঁষে। আর খালের উত্তরপাশে ঝোপ জঙ্গল, সেইখানেই অগ্রবর্তী নবাববাহিনী চারিটি কামান সাজিয়ে মুহুর্মুহু তোপ দেগে চলেছে।

ফিরিঙ্গী সৈন্যরাও জলস্থল উভয় দিক থেকেই গোলাবর্ষণ করে নবাব সৈন্যর আক্রমণকে প্রতিরোধ করে চলেছে।

ক্রমে দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

নবাবসৈন্যরা যুদ্ধে বিরতি দেয়।

কত আর পরিশ্রম করবে, কত করবে আর যুদ্ধ চির-আয়াসী নবাবসৈন্য !

রাত্রে শিবিরে শিবিরে নিশ্চিন্ত আরামের শৈথিল্য। দু' চোখ ভরে নেমে আসে নিদ্রা। সহসা মধ্যরাত্রে নিশ্চিন্ত সেই নিদ্রা ফিরিঙ্গী সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলাগুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে টুটে গেল।

পালা, পালা—পালা !

ওদিকে নবাব-শিবিরে গোপনে এসে প্রবেশ করল উমিচাঁদের আহত অপমানিত জমাদার জগমন্ত সিংহ। সে বললে, ওভাবে আক্রমণ চালালে কোন দিনই নবাবসৈন্য নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক ছাড়া অন্য সব দিক দিয়েই নগর সুরক্ষিত। নগরে যদি নবাব সসৈন্যে প্রবেশ করতে চান তো ঐ পথ দিয়েই প্রবেশ করতে হবে।

জগমন্ত সিংহের কাছে আরও অনেক মূল্যবান সংবাদই নবাব পেলেন।

নবাব-সৈন্যরা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে প্রস্তুত হলো।

পরের দিন পঙ্গপালের মত বিরাট নবাব-বাহিনী অরক্ষিত পূর্ব দিক দিয়ে প্রচণ্ডবেগে নগরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে দেখতে দেখতে দেশীয় মহাজনদের আবাসস্থল বড়বাজার পর্যন্ত ভাগীরথীর সমস্ত তীরভূমি অধিকার করে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো লুঠ আর অগ্নিসংযোগ। বেপরোয়া লুঠ আর অগ্নিসংযোগে সমস্ত নগর তছনছ হতে লাগল।

সে এক বীভৎস ভূতের তাণ্ডব!

ক্রমে রাত্রি এলো আবার ঘনিয়ে। দাউ দাউ করে এদিকে-ওদিকে আগুন জ্বলছে। রাতের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

সুমন্তনারায়ণের কাঠের গোলাতেও আগুন লেগেছে। সংবাদ পেয়ে ছুটে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন সুমন্তনারায়ণ। কিন্তু সুরধুনী এসে পথ আগলালো, তোমার মাথা খারাপ হল রায়মশাই? কোথায় চলেছো এই ডামা-ডোলের মধ্যে?

পথ ছাড়ো সুরধুনী, যেতে আমাকে হবেই।

না।

বুঝতে পারছো না তুমি, আমার যথাসর্বস্ব সেখানে!

তা হোক, তবু তোমাকে আমি যেতে দেবো না। কঠিন ইস্পাতের মতই দৃঢ় সুরধুনীর কণ্ঠস্বর।

কি বলছো তুমি সুরো! সর্বস্ব আমার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর ঘরের মধ্যে নিরুপায় হাত-পা কোলে করে আমি বসে থাকবো!

ভাগ্যে থাকলে সব আবার হবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর কিছুই হবে না। সুরধুনী বলে।

জানি না হবে কিনা, কিন্তু সর্বস্ব খুইয়ে ভিক্ষুক হয়ে বেঁচে থাকতে আর যেই পারুক আমি পারবো না। সরো পথ ছাড়ো।

না। সুরধুনী পথ ছাড়ে না তবু।

কি পাগলামি করছো সুরো—একেবারে নিঃস্ব হাতে আজকের যা কিছু এত কষ্টে গড়ে তুলেছি আমি—আবার নতুন করে গড়ে তুলবার আমার আজ সময়ও নেই, বয়সও নেই—সর—

তবু সুরধুনী পথ আগলে দাঁড়ায়, কিন্তু সুমন্তনারায়ণ বাধা মানলেন না। একরকম জোর করেই ঠেলে অতঃপর সুরধুনীকে সরিয়ে দিয়ে সুমন্ত-নারায়ণ অন্ধকার রাস্তায় গিয়ে নামলেন।

নগরবাসীরা ভয়ে যে যার ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দিয়েছে।

কেবল লোভী সৈন্যর দল নগরের পথে হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে হাতিয়ার হাতে। এই তো মওকা! যা কিছু হাতিয়ে নেওয়া যায় এই বেলা!

কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে গোলায় এসে পৌঁছলেন সুমন্তনারায়ণ। গোলার কিয়দংশ অগ্নিতে ভস্মীভূত হলেও কিছুটা বেঁচেছে। লোকজন কর্মচারীরা সব পালিয়েছে।

চারিদিকে পোড়া কাঠের গন্ধ আর ধোঁয়া চাপ বেঁধে স্থানটাকে যেন নরকের মতই করে তুলেছে।

অন্ধকারে ভূতের মত চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে

লাগলেন সুমন্তনারায়ণ।

অল্প দূরেই তখনও একজন দেশীয় মহাজনের বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

বড় বড় সুন্দরী কাঠগুলো যেখানে স্তূপীকৃত করা ছিল, সহসা এক সময় তার পাশে সুমন্তনারায়ণের নজর পড়লো সঞ্চরণশীল একটা সাদা মূর্তির উপরে।

কে? কে ওখানে?

সাড়া নেই।

কে? ওখানে কে? কথা বলছো না কেন?

তবু সাড়া নেই।

এবারে কৌতূহলে এগিয়ে গেলেন সুমন্তনারায়ণ।

অদূরে প্রজ্বলিত আগুনের আলোয় এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন, কুড়ি-বৎসর বয়স্কা একটি শ্বেতাঙ্গিনী নারী, পরিধানে সাদা গাউন, পায়ে জুতো, স্তূপীকৃত কাঠের এক পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

ভীতিবিহ্বল বোবাদৃষ্টিতে শ্বেতাঙ্গিনী সুমন্তনারায়ণের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কে!

I—I am Catherin ·

ক্যাথারিন!…

তারপর অনেক কষ্টে সেই ভীত-ত্রস্তা শ্বেতাঙ্গিনীর কাছ থেকে সামান্য যে ইতিহাসটুকু উদ্ধার করতে পারলেন সুমন্তনারায়ণ, সেটা হচ্ছে—স্বামীর সঙ্গে সে দুর্গের মধ্যে স্থান না পাওয়ায় এখানেই এক পরিচিত দেশীয় মহাজনের গৃহে স্বামী-স্ত্রী তারা স্থান নিয়েছিল। কিন্তু নবাব-সৈন্যের আক্রমণে তার স্বামী কখন এক সময় পালায় এবং সে কোনমতে সেই সৈন্যদের আক্রমণের হাত থেকে এক ফাঁকে পালিয়ে বেঁচে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সুমন্তনারায়ণের হাত ধরে কেঁদে ফেলে ক্যাথারিন তাকে বাঁচাবার জন্য।

বলে, Save me!

সুমন্তনারায়ণ তাকে আশ্বাস দেন, ভয় নেই তোমার, তোমাকে বাঁচাবো।

কিন্তু বাঁচাবো বললেই তো হয় না, কেমন করে তিনি ঐ শ্বেতাঙ্গিনীকে সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচাবেন? সৈন্যরা কোনক্রমে তার খোঁজ পেলে দুজনকেই একসঙ্গে হয়তো হত্যা করবে!

ওদিকে রাত্রিও তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অগ্নি-আভায় রক্তিম আকাশের পূর্ব প্রান্ত ফিকে হয়ে আসছে। এ সময় বাড়ির দিকে রওনা হলে পথে সৈন্যদের হাতে পড়া বিচিত্র নয়।

যেমন করেই হোক এখানেই আপাতত আশ্রয় নিতে হবে। তারপর দিনের বেলা চারিদিক দেখেশুনে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।

সুমন্তনারায়ণ গোলাঘরেই গিয়ে প্রবেশ করলেন ক্যাথারিনের হাত ধরে।

কিন্তু দিনের বেলা পালাবার সুযোগ পাওয়া গেল না। নগরের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠলো।

দুর্গ-প্রাকারের অল্প দূরে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে সদর রাস্তার উপর ফিরিঙ্গীরা যে তিনটি তোপমঞ্চ তৈরি করেছিল—পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব-সৈন্য প্রচণ্ড বেগে মারাঠা খাদ অতিক্রম করে ঐ সদর রাস্তার দিকে এগুতে লাগলো গোলাবর্ষণ করতে করতে।

ফিরিঙ্গী সৈন্যরাও সমানে চালাতে লাগলো গোলাগুলি।

বিস্ফোরণের শব্দে বারুদের গন্ধে ও ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে।

ক্রমশ যত বেলা পড়ে আসে, ইংরাজদের অবস্থাও কাহিল হতে থাকে।

পূর্ব তোপমঞ্চের অধিনায়ক ক্যাপটেন ক্লেটন তাঁর সহকারী হলওয়েলকে দুর্গ-মধ্যে প্রেরণ করলেন আরও সৈন্য সাহায্যের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলওয়েলের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই বেগতিক বুঝে তোপমঞ্চ ত্যাগ করে পালালেন।

নবাব-সৈন্যরা হৈ-হৈ করে তোপমঞ্চ অধিকার করে নিল।

বিজয়গর্বে নবাব এসে ছাউনি ফেলেছেন সসৈন্যে হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে।

একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতই নবাব-সৈন্যরা নগর চষে বেড়াচ্ছে।

সুমন্তনারায়ণ যা মনস্থ করেছিলেন—গোপনে এক সময় পরের দিন সুযোগ মত ক্যাথারিনকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে তুলবেন, তা আর হয়ে উঠলো না।

ঐ নারকীয় হল্লার মধ্যে রাস্তায় বের হওয়া আদৌ বিবেচনার কাজ হবে না ভেবে চুপচাপ রইলেন আপাতত।

আতঙ্কে অনাহারে উত্তেজনায় ক্যাথারিন তখন ঝরা ফুলের মতই শুকিয়ে উঠেছে। বেচারীর মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

আবার এক সময় সন্ধ্যার পর যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা কিছুটা কমে এলো।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপচাপ দুজনে বসে পাশাপাশি। পরস্পরের নিশ্বাসের শব্দও বুঝি শুনতে পাচ্ছে। সে রাত্রি যে কোথা দিয়ে কোন্ পথে কেটে গেল দুজনার, একজনও জানতে পারলো না।

পরের দিন সকাল হতেই শুরু হয়ে যায় আবার আক্রমণ।

ওদিকে ইংরাজদের গোলাগুলিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কেল্লার ভিতরে উঠছে আর্ত-কান্না। মৃত্যুভয়ে সকরুণ চিৎকার নারীশিশুদের মধ্যে তো বটেই, সৈনিকদেরও কণ্ঠে।

ক্ষুধিত হায়নার মত নবাব-সৈন্যরা সব ছুটে আসছে দলে দলে। ইংরেজরা দেখলে মৃত্যু দ্বারে।

একে একে তখন গঙ্গায় নৌকা ভাসাতে লাগলো। যদি কোনমতে প্রাণ

বাঁচানো যায়। নৌকার মধ্যে শুরু হলো প্রাণভয়ে ভীত নর-নারীদের ধস্তাধস্তি। ফলে নৌকা উল্টে গিয়ে কেউ জলে ডুবলো, কেউ বা আহত হলো।

আর ঐ ফাঁকে গভর্ণর বাহাদুর ড্রেক সাহেব নৌকায় চেপে—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। গভর্ণরের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে দলের নেতা ও চাঁইরাও সব পালাতে লাগলো।

কেবল রইলো হলওয়েল সাহেব। বেচাবী তখনও তার সাকরেদদের নিয়ে চালিয়ে চলেছে। আশা নেই, তবু শেষ চেষ্টা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদল ডাচ পল্টন প্রাণভয়ে কেল্লার ভিতর থেকে গঙ্গার দিকে যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তার প্রান্তে ফটক ভেঙ্গে পালাতে গিয়ে নবাবসৈন্যদের সুযোগ করে দিল।

পঙ্গপালের মতই সেই ভাঙ্গা ফটক দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নবাব-সৈন্য কেল্লার মধ্যে ঢুকতে শুরু করলো।

সর্বনাশ! এখন উপায়?

ধ্বংস অবধারিত।

অস্থায়ী গভর্ণর ও যুদ্ধের সর্বাধ্যক্ষ হলওয়েল উপাযান্তর আর না দেখে কয়েদখানার মধ্যে তখনই বন্দী উমিচাঁদের কাছে গিয়ে সক্রন্দন তার হাত দুটো চেপে ধরে বললে, বাঁচাও! Save us!

লাঞ্ছিত অপমানিত বন্দী উমিচাঁদ সরোষে গর্জে উঠলো, না—কখনও না, তোমরা মর।

কিন্তু তোষামোদ বড় সাংঘাতিক চিজ। এবং শেষ পর্যন্ত ড্রেক পালিয়েছে শুনে উমিচাঁদ বললে, ঠিক আছে, বাঁচাবো।

মানিকচাঁদকে দূত করে উমিচাঁদ নবাবের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো।

আপাতত মিটে গেল গোলমাল।

আলিবর্দীর আদরের দুলালের রাগ জল হয়ে গেল। চতুর্দোলায় চেপে রাজকীয় সমারোহে নবাব কেল্লায় প্রবেশ করলেন এবং কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে গদগদ হয়ে বুকে টেনে নিলেন।

ইতি যুদ্ধপর্ব সমাপ্ত। অথ কলিকাতা বিজয়পর্বও সমাপ্ত।

জার্মান ও পর্তুগীজ বন্দীদের মুক্তি দিয়ে তখন কোষাগারের মধ্যে সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে মহামান্য নবাব চতুর্দোলায় চেপে পটমণ্ডপে গমন করলেন।

মানিকচাঁদ হলো দুর্গের সর্বময় কর্তা।

॥ ২ ॥

আকাশে কালো চাপ চাপ ধোঁয়া, বাতাসে বারুদের গন্ধ। নগরের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কলস্বনা ভাগীরথী ঠিক পূর্বের মতই।

রাত্রি নেমে এলো ধীরে ধীরে সেই বিপর্যস্ত ছিন্ন রক্তাক্ত নগরের উপরে।

অন্ধকার আরও একটু ঘন হলে সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের হাত ধরে রাস্তায় বের হলেন। দুই দিনের অনাহারে ভয়ে আশঙ্কায় অবসন্নপ্রায় অর্ধমৃতা শ্বেতাঙ্গিনী ক্যাথারিন।

রাত্রির কালো আকাশপটে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগুলি মিটি-মিটি জ্বলছে। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য বললেও চলে।

Where we are going!

ক্ষীণ অবসন্ন কণ্ঠে ক্যাথারিন প্রশ্ন করে সুমন্তনারায়ণকে। কেমন যেন বিহ্বল বিমূঢ় ক্যাথারিন।

আমার বাড়িতে। জবাব দেন সুমন্তনারায়ণ।

শ্বেতাঙ্গিনী কি বোঝে তা সেই জানে। তবে ভয় পায় না। নির্ভয়েই চলে ক্লান্ত পা দুটো কোনমতে টেনে টেনে সুমন্তনারায়ণের পাশে পাশে।

একটা দিন ও দুটো রাত্রির সাহচর্যে ক্যাথারিন এইটুকু অন্তত বুঝেছিল, আর যাই হোক সুমন্তনারায়ণ যতক্ষণ তার পাশে পাশে আছে, তার ভয়ের বা বিপদের কোন আশঙ্কা নেই।

তা ছাড়া সুমন্তনারায়ণের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহও ক্যাথারিনের মনের ভয় অনেকটা ঘুচিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ক্যাথারিনের মনের অবস্থাটাও তখন কোন কিছু স্থির হয়ে ভাববার মতও ছিল না। সমস্ত চৈতন্য কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল। মূক হয়ে গিয়েছিল।

সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনকে নিয়ে সোজা এনে ওঠালেন নিজের গৃহেই।

ওদিকে তাঁর ঐ দুই দিনের অনুপস্থিতিতে রাধারাণী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে কান্নাকাটি শুরু করেছিল।

সরকার মশাইকে পরের দিন প্রত্যূষে সুমন্তনারায়ণের খোঁজে পাঠানো হয়েছিল, তিনিও ফেরেননি। তাতেই দুশ্চিন্তার কারণটা একটু বেশি হয়েছিল সকলের।

কিন্তু দুশ্চিন্তা হলেও সুরধুনীই শুধু একমাত্র ভেঙ্গে পড়েনি।

একমাত্র ভরসা ঐ বেহারী ভৃত্যটি।

সুমন্তনারায়ণ পথে বেরুবার আগেই কি ভেবে তাঁর গায়ের উত্তরীয়টা ক্যাথারিনের গায়ে মাথায় ঢেকে দিয়ে মুখে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছিলেন। উত্তরীয়টা গায়ে মাথায় দিয়ে গুণ্ঠন টেনে দেবার সময় একবার মাত্র নিঃশব্দে তাকিয়েছিল ক্যাথারিন সুমন্তনারায়ণের মুখের দিকে, কোন বাধাই দেয়নি।

ভৃত্য প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে সদর খুলে দিতেই সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু অন্দরে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ।

শ্বেতাঙ্গিনী ক্যাথারিনকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলেন না। অন্দরে হিন্দুর আচারনিষ্ঠার মধ্যে, বিশেষ করে ঘরের গৃহ-দেবতা শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার অবকাশ

পেলেন না।

সুরধুনী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সুমন্তনারায়ণের আসা-পথ চেয়ে কান পেতেই ছিল।

সুমন্তনারায়ণের প্রত্যাবর্তনের কথাটা সে জানতে পেরে সোজা বহির্মহলেই আসছিল। এবং ঘরে প্রবেশ করে ঘরের আলোয় সুমন্তনারায়ণের পাশে অর্ধগুণ্ঠনবতী ক্যাথারিনকে দণ্ডায়মান দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

সুমন্তনারায়ণও ঘরের মধ্যে সুরধুনীকে প্রবেশ করতে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

এই যে সুরধুনী!—

কিন্তু সুরধুনী সুমন্তনারায়ণের কথার কোন জবাব না দিয়ে নির্নিমেষ কৌতূহলী দৃষ্টিতে ক্যাথারিনের মুখের দিকেই চেয়ে আছে তখন।

ক্যাথারিনও চেয়ে ছিল সুরধুনীর দিকে।

এত কাছাকাছি অবগুণ্ঠিতা কোন হিন্দু নারীকে ইতিপূর্বে ক্যাথারিনেরও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি যেমন, সুরধুনীরও কোন সাহেবের বিবিকে এত কাছাকাছি তেমনি দেখবার সুযোগ হয়নি। উভয়েই বোধ হয় তাই পরস্পরের মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

অবগুণ্ঠন তখন খসে পড়েছে অনভ্যস্তা ক্যাথারিনের মাথা থেকে কাঁধের উপর।

ক্যাথারিনের দেহের রঙটাই যে শুধু সাদা মার্বেল পাথরের মত ছিল তাই নয়, চোখ-মুখের গঠনও ছিল তার ভারি চমৎকার। গুচ্ছ গুচ্ছ স্বর্ণকেশ দু'পাশে এসে পড়েছে।

অসহায় নীল দুটি আঁখির তারায় কি এক সকরুণ বোবা মিনতি।

এ কে! মৃদু কণ্ঠে এক সময় প্রশ্ন করে সুরধুনী।

ও ক্যাথারিন। · বলে সংক্ষেপে জানালেন সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের ইতিহাস সুরধুনীকে এবং বললেন, কি করি, বেচারীকে তো আর ফেলে আসতে পারি না! তাই ভাবলাম এখানেই নিয়ে আসি। গোলমাল যতদিন না মেটে থাক ও এখানেই। তারপর গোলমাল মিটলে ওর আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ যদি পাই তো তখন তাদের হাতে তুলে দিলেই হবে, কি বলো!

বেশ করেছো, কিন্তু থাকবে কোথায় এ বাড়িতে? অন্দরে পূজার ঘরে তোমাদের বিগ্রহ রয়েছে—

তাই তো ভাবছি। কি ব্যবস্থা একটা করা যায় বল তো?

কি করবে?

তুমিই বলো না!

বাইরের এই মহলেই পদ্মমাসীর পাশের ঘরটায় ওর থাকবার বন্দোবস্ত করে দিই।

সুরধুনীর প্রস্তাবে ভারি খুশী হয়ে ওঠেন সুমন্তনারায়ণ। এতক্ষণে যেন অন্ধকারে সত্যি সত্যিই আলো দেখতে পান। সানন্দে বলেন, তাই করো

সুরধুনী !···

তা যেন হলো, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—

মুশকিল ! আবার কি মুশকিল হলো ?

ও আমাদের কথা বুঝবে না, আমরাও ওর কথা বুঝব না।

তাই তো ! তাহলে কি করা যায় ?

সুরধুনী মুহূর্তকাল যেন কি ভাবলো, তারপর সহসা মৃদু হেসে বললে, তা আর কি কর' যাবে ! ইশারাতেই সব কথা সারতে হবে ! বলে সুরধুনী এগিয়ে গিয়ে ক্যাথারিনের একখানি মার্বেল পাথরের মত সাদা বরফের মত ঠাণ্ডা হাত ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করে বললে, এসো গো !

ক্যাথারিন কি বুঝলো সে কথার সে-ই জানে। নিঃশব্দে সুরধুনীর আকর্ষণে তার সঙ্গে সঙ্গে চললো। যেতে যেতে একবার পশ্চাতে সুমন্তনারায়ণের দিকে ফিরে তাকালো। সুমন্তনারায়ণ চোখের ইশারায় তাকে এগিয়ে যেতে বললেন।

ওদিকে পরদিবস প্রত্যূষে নবাব সিরাজদ্দৌলার আদেশে অন্যান্য বাকী জীবিত বন্দীদের সহ হলওয়েলকে যখন তাঁর সামনে এনে দাঁড় করানো হলো, তাকে নবাব জিজ্ঞাসা করলেন, কুঠির গুপ্ত কোষাগারটি কোথায় সাহেব ?

হলওয়েল জানালো, কোন গুপ্ত কোষাগারই তার জানা নেই।

কিন্তু নবাব তার কথা বিশ্বাস করলেন না। নবাবের সহচর ও চেলা-চামুণ্ডারা তোলপাড় করে খুঁজলো কেল্লার সর্বত্র, কিন্তু ইংরাজদের গুপ্তধন কিছুই পাওয়া গেল না।

নবাব জানতেন না যে বর্ষার আগেই মজুত টাকাকড়ি সব ইংরেজদের বিলাতে পাঠানো হয়ে গিয়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন নবাব। বললেন, সব আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দাও।

গভর্ণর ড্রেক সাহেবের বাড়িটা ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হলো।

কেল্লার ভিতরেই হুকুম দিলেন একটা মসজিদ গাঁথবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত হলওয়েল তার তিনজন সহচরসহ বন্দী হল মীরমদনের অধীনে। বাকী সব ইংরেজদের মুক্তি দেওয়া হলো।

বিজয়ী নবাব-বাহিনীর হৈ-হল্লায় কলকাতার আকাশ-বাতাস ও ভাগীরথীর তীরভূমি সচকিত হয়ে উঠতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে।

ইংরাজদের ভাঁড়ারে প্রচুর মদ সংগ্রহ করা ছিল। ভাঁড়ারের দরজা ভেঙ্গে লুঠ করে বেপরোয়া সব মদ্যপান শুরু করে দিল।

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। হঠাৎ কি কারণে কে জানে ফিরিঙ্গী সৈন্যদের সঙ্গে নবাব-সৈন্যদের বচসা শুরু হয়ে ক্রমশ হাতাহাতি লেগে যায়।

একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নবাবের কানে সেই কথা তুলতে তিনি আদেশ দিলেন, সব আপাতত বন্দী থাকুক, প্রত্যূষে বিচার হবে।

হৈ-হৈ করে নবাব-সৈন্যরা সেই সব গোরা সৈন্যদের নিয়ে তখন সেই রাত্রে

ইংরেজ-কুঠির অপ্রশস্ত কারাকক্ষে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখে দিল।

ওদিকে গভর্ণর ড্রেক কিন্তু তখনো পালায়নি। কুলির বাজারে সুরম্যান সাহেবের যে বাগানবাড়ি, তার সামনে ভাগীরথীর বক্ষে জাহাজে বসে আত্মগোপন করেছিল দলবলসহ।

নবাব কেল্লা জয় করে তাঁর মুঠোয় নিয়েছেন খবরটা পেতেই ড্রেক বুঝলো, আপাতত নবাবের ধার-কাছ থেকে পলায়নই শ্রেয়। অতএব আর কালবিলম্ব না করে ড্রেক জাহাজের কাপ্তেনকে হুকুম দিল, নোঙ্গর তোল।

একেবারে সে তল্লাট ছেড়ে ড্রেক দলবলসহ জাহাজ ভাসিয়ে গিয়ে উঠলো ফলতায়।

কোন্নগরের ঘোষবংশজাত একদা বর্ধমান-রাজের গোমস্তা ও পরবর্তীকালে নবাব আলিবর্দীর বেহালা ও ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে তাঁর যে জমিদারি ছিল তার ম্যানেজার, নবাব সিরাজের প্রাণের বন্ধু, অনেক বড় বড় আমীর-ওমরাহের আশায় ছাই দিয়ে রাতারাতি কলকাতা নয়, নবাবের আলিনগরের নতুন গভর্ণরের পদে রাতারাতি আসীন হলো।

একেই বলে বরাত! খোদা যব দেতা ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা!

রাত্রি আরও গভীর হয়।

ভাগীরথী তীরের মাটির বুকে এক নয়া ইতিহাসের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। কলনাদিনী ভাগীরথী কুলু কুলু রবে বুঝি তাই বলতে চায়।

নতুন মানুষ, নতুন সভ্যতা, নতুন কৃষ্টি, নয়া দৃষ্টিভঙ্গীর এক সম্ভাবনায় কলকাতা ভাগীরথীর তীরভূমি কি শুনছিল, ভাগীরথীর কলকল নাদে, সেই ধোঁয়া বারুদের গন্ধে আকীর্ণ বাতাসে তারই পদসঞ্চারের অস্পষ্ট শব্দ!

ঘুম ছিল না সে রাত্রে সুমন্তনারায়ণের দুই চক্ষেও। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিল। অন্ধকার অলিন্দে নিশাচরের মতই পায়চারি করে ফিরছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

নবাব-সৈন্যের হৈ-হল্লায় বিজয় ঘোষণা তাঁরও শুনতে বাকি নেই।

কলকাতার মাটিতে এই কয়বৎসর ধরে যাদের মালিকানা-স্বত্ব ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তারা আজ এদিক-ওদিক পলাতক। অনির্দিষ্ট এক অবশ্যম্ভাবী অরাজকতার পূর্বাভাস।

বর্গীর হাঙ্গামায় কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন তিনি এবং ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন, এখন চাকা কোন্‌দিকে ঘুরবে কে জানে!

হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দ যেন নিশিথরাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সুমন্তনারায়ণের কানে এসে প্রবেশ করে।

কে কাঁদে?…

আপনা থেকেই পরিক্রমণরত চরণের গতি যেন থেমে আসে সুমন্তনারায়ণের।

ক্ষীণ অস্পষ্ট কান্নার শব্দটা। অন্ধকারেই কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বহির্মহলের দিক থেকেই যেন আসছে কান্নার চাপা শব্দটা।

নেশাগ্রস্তের মত পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন সুমন্তনারায়ণ অন্ধকারেই।

ভেজানো দরজার কপাট দুটো ধীরে ধীরে ঠেলে ফাঁক করলেন হাত দিয়ে নিঃশব্দে সুমন্তনারায়ণ।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালগিরি জ্বলছে, সেই আলোতেই ঘরের অভ্যন্তরস্থিত সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে সুমন্তনারায়ণের দৃষ্টিগোচর হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টি ঘরের মধ্যে বিশেষ একটি বস্তুর প্রতি স্থিরনিবদ্ধ হয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত নিজের অজ্ঞাতেই যেন নিঃশব্দে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন গিয়ে সুমন্তনারায়ণ।

অনুজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ঘরখানি যেন স্বপ্নতন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঘরের পশ্চিমদিকে পালঙ্কে শয্যার উপরে লুটিয়ে আছে এক স্তবক শ্বেতপদ্ম। ঘুমিয়ে আছে ক্যাথারিন।

গ্রীষ্মের জন্যই বোধ হয় বক্ষবাস ঢিলে করে দিয়েছে। অনুজ্জ্বল আলোয় পরিপূর্ণ দুটি সুধাভাণ্ড সেই ঢিলে বক্ষবাসের আবরণোম্মোচিত হয়ে নিদ্রাজনিত মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে।

শ্বেতশঙ্খ শুভ্র গ্রীবা। এলানো শিথিল দেহবল্লরীর সৌন্দর্য-লাবণ্য যেন শতধারে উপচে পড়ছে। অবিন্যস্ত স্বর্ণ-কেশগুচ্ছ গ্রীবা ও কপালের দুপাশে ছড়িয়ে আছে।

কয়েকদিনের ব্যবহৃত ময়লা দেহবাস বদলিয়ে বোধ হয় সুরধুনীই ক্যাথারিনকে একটি শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অনভ্যস্ত দেহে সে শাড়ি শিথিল এলোমেলো হয়ে গিয়ে এলানো ঘুম-ভারানত দেহের বর্ণসুষমাকে যেন আরও প্রকট করে তুলেছে।

চেয়ে থাকেন নিদ্রিত সেই সৌন্দর্যের দিকে নির্নিমেষে সুমন্তনারায়ণ। চেয়ে চেয়ে আশ যেন আর মিটতে চায় না। ক্রমশ মনের মধ্যে যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন সুমন্তনারায়ণ। সম্মুখের ঐ অপরূপ দেহসুষমা, ঐ মন-মাতাল-করা দেহসুধা সম্পূর্ণ তাঁর করায়ত্ত। তাঁর একান্ত নাগালের মধ্যে।

ইচ্ছা করলেই তো এই মুহূর্তে তিনি হাত বাড়িয়ে ঐ শিথিল এলানো দেববল্লরী আপন বক্ষের উপরে টেনে নিয়ে বাহুর পেষণে ভোগ করতে পারেন!

কেউ নেই কোথায়ও। বিশ্বচরাচর গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন।

ঘুরে গিয়ে নিঃশব্দে ঘরের ভিতরের অর্গলটা তুলে দিলেন সুমন্তনারায়ণ।

নিশীথের সেই স্তব্ধ নির্জন মুহূর্তে মানবদেহের আদিম এক পশু যেন ক্ষুধার ধারালো নখর বিস্তার করছে। নারীদেহ-লোলুপ চিরন্তন কামার্ত

পুরুষ যেন সুমন্তনারায়ণের দেহের পেশীতে পেশীতে আগুন ছড়াতে থাকে।

এগিয়ে চলেছেন সুমন্তনারায়ণ পালঙ্ক-শয্যায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে নিদ্রিত ক্যাথারিনের দিকে এক পা দু পা করে করে। হঠাৎ কি মনে হতে এগিয়ে গিয়ে সুমন্তনারায়ণ ঘরের দেওয়ালগিরির আলোটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলেন।

মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন বিরাট একটা হাঁ করে সব কিছুকে গ্রাস করে নিল এবং তারপর পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গিয়ে আন্দাজেই সুমন্তনারায়ণ পালঙ্কের এক পাশে উপবেশন করলেন। অন্ধকারে একটা ক্ষুধার্ত সরীসৃপ এগিয়ে গিয়ে ক্যাথারিনের দেহ স্পর্শ করলো আলতোভাবে যেন অতি সন্তর্পণে।

নরম একদলা মাখন যেন।

কিন্তু নিষ্পেষণের পূর্বমুহূর্তেই তীক্ষ্ণ অর্ধস্ফুট একটা চীৎকার ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়ে সুমন্তনারায়ণকে পালঙ্কের উপর থেকে যেন অতর্কিতে ছিটকে ফেলে দিল ক্যাথারিন।

ছিঃ ছিঃ, এ কি করলেন সুমন্তনারায়ণ! নিঃশব্দে দ্রুতপদে অন্ধকারেই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সুমন্তনারায়ণ।

॥ ৩ ॥

মিনিট দশেক বাদে একটা প্রজ্বলিত বাতি হাতে নিঃশব্দে সুমন্তনারায়ণ এসে যখন ঘরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করলেন, ক্যাথারিন তখনও জেগে শয্যার উপর বসেছিল। চোখেমুখে একটা অসহায় বোবা আতঙ্ক। ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে ক্যাথারিন তাকালো সুমন্তনারায়ণের মুখের দিকে।

কি হয়েছে ক্যাথারিন? এখনও ঘুমাও নি?

সুমন্তনারায়ণের বিশাল বলিষ্ঠ দেহটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে ক্যাথারিন। তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। জবাব দেবে কি, সে কি তাঁর প্রশ্নের একটি বর্ণও বুঝতে পেরেছে?

কিন্তু বুঝতে না পারলেও ক্যাথারিন নাকি ধারণাও করতে পারেনি যে, নিশাচর পশুর মত সে রাত্রে সুমন্তনারায়ণই অন্ধকারে তার ঘুমন্ত দেহটার উপরে কুৎসিত লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গিয়ে। অনেক দিন পরে কথায় কথায় ক্যাথারিনই বলেছিল কথাটা সুমন্তনারায়ণকে।

বলেছিল, আমি তো ভেবেছিলাম প্রথমে বুঝি তুমিই—

সত্যি!

হুঁ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, ছিঃ ছিঃ, এ আমি কি ভাবছি! যার মন এতখানি উদার, যে আমাকে দু রাত হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও স্পর্শ পর্যন্ত করেনি, সে তার নিজের গৃহে আমাকে স্থান দিয়ে এত বড় অপমান করবে!

প্রত্যুত্তরে সেদিন সুমন্তনারায়ণ একটি কথাও বলতে পারেননি। শুধু সেই দশ বৎসরের আগেকার এক রাত্রির তাঁর সেই পশুবৎ আচরণের কথাটি ভেবে

লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু তুমি তো অন্ধকারে দেখতে পাওনি সত্যি সত্যি সে লোকটাকে ক্যাথারিন! আমিই যে না কেমন করে স্থির-নিশ্চিত হলে?

জানি জানি—তুমি নও, তুমি হতে পারো না। তাছাড়া—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ক্যাথারিন মুখ নীচু করেছিল। লজ্জায় কপাল ও কপোল তার রঙিন হয়ে উঠেছিল।

তাছাড়া কি ক্যাথারিন?

তাছাড়া অমন করে চোরের মত তুমি আমাকে আক্রমণ করতে আসবেই বা কেন, তুমি যদি সোজাসুজি আমাকে এসে বুকে নিতে চাইতে আমি কি ধরা দিতাম না।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন সেদিন সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের মুখের দিকে। প্রথমটায় কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়নি।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতেও পারেননি। প্রশ্ন করেছিলেন, ধরা দিতে?

নিশ্চয়ই। তা যদি না হতো, তবে কি সে রাত্রে এক কথায় তোমার হাত ধরে এসে তোমার ঘরে আমি উঠতে পারতাম?

তাই বুঝি?

নিশ্চয়ই। ব্রিটিশ মেয়ে আমরা, জোর করে আমাদের পাওয়া যায় না। জানো, রিচার্ডকে আমি ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম কিন্তু সেই রিচার্ড যখন বিপদের মুখে ফেলে অমন ভীতুর মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো, একটি বারের জন্য আমার কথা ভাবলো না, তখন আমিই বা কেন তার কথা ভাবতে যাবো! অথচ তুমি কে? বিদেশী তো বটেই, সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার, তুমি আমাকে দুটো রাত একটা দিন বুক দিয়ে আগলে রাখলে!

শুধু কি সেই জন্যই আমার কাছে তুমি ধরা দিয়েছিলে ক্যাথারিন?

না, তোমায় আমি ভালবেসেছিলাম।

ভালবেসেছিলে!

নইলে আমার সমাজ আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে তোমারই আশ্রয়ে আমি কি আমার জীবনটা কাটাতে পারতাম?

সত্যি আশ্চর্য ভালবাসা ছিল সুমন্তনারায়ণের প্রতি ঐ বিদেশিনী নারীর।

নিজের রোজনামচার পাতায় ক্যাথারিন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুমন্ত-নারায়ণের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশীমাত্রায়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও হয়তো একেবারে মিথ্যে বলেননি। সৌভাগ্যের সূচনার প্রারম্ভেই হতভাগ্য সিরাজকে চরমতম দুর্ভাগ্যের মধ্যে লীন হয়ে যেতে হয়েছিল সত্যি, তবু তাঁর সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনের দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে, চির-উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল এমন একটি নারীর স্নেহ, প্রীতি ও গভীর প্রেম, যে প্রেম দীর্ঘকাল

ধরে ঐ হতভাগ্যের কবরের উপরে জ্বালিয়ে গিয়েছে একটি প্রেমের প্রদীপশিখা। যদি ইহলোকের পরে পরলোক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সত্যই থেকে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই উচ্ছৃঙ্খল আত্মা খুশবাগের কবরের ধারে প্রজ্বলিত সেই প্রদীপ শিখাটির দিকে চেয়ে চেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছে। দুটি চক্ষু অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

ঠিক তেমনি করেই হয়তো সান্ত্বনা পেয়েছিল সেই বিদেশিনী নারী। যে একদা তার সমস্ত সংস্কার, শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি ভুলে গিয়ে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল সুমন্তনারায়ণকে। অথচ যে সুমন্তনারায়ণ একটি দিনের জন্যও তার সেই প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি। যার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যে আরো দশটি নারীর মতই ক্যাথারিন তাঁর জবীতিকালে মাত্র খানিকটা কামনার উত্তাপই যুগিয়েছিল। কিন্তু ক্যাথারিনের মৃত্যুর পর সুমন্তনারায়ণ জানতেও পারেননি, কখন এক সময় সেই কামনার উত্তাপ থেকেই অন্তরের নিভৃত প্রদেশে তাঁর জ্বলে উঠেছিল একটি সকরুণ প্রেমশিখা। তাইতেই পরবর্তীকালে হালসীবাগানে তাঁর যে বাগানবাড়ির মধ্যে ক্যাথারিন থাকতো, তারই পশ্চাতে উদ্যানমধ্যে বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে শান্ত ছায়ায়, যেখানে সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের মৃত্যুশীতল দেহটা মাটির তলায় শুইয়ে রেখে দিয়েছিলেন একান্ত গোপনে, সেখানে প্রতি রাত্রে কি অদৃশ্য দুর্নিবার শক্তি যেন তাঁকে তাঁর নাচঘর থেকে টেনে নিয়ে যেতো।

সুরার নেশায় ঢুলু ঢুলু আঁখি। সহসা মধ্যরাত্রে আসর ছেড়ে উঠে পড়তেন সুমন্তনারায়ণ। তারপর শ্লথচরণে টলতে টলতে গিয়ে বসে পড়তেন কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে অন্ধকারে সেই মাটির ঢিপিটার পাশে। জীবনে যাকে কেউ কখনও কোন দুঃখ বা আঘাতে চোখ দিয়ে জল ফেলতে দেখেনি, বিরাটকায় দানব-সদৃশ সেই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পুরুষটির দুই চোখ বেয়ে নিঃশব্দে নেমে আসতো ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু সেই নিশিরাত্রির স্তব্ধ প্রহরে।

আর নিঃশব্দে অন্ধকারে রাত্রির শিশিরের সঙ্গে ঝরে ঝরে পড়তো কৃষ্ণচূড়ার লাল পাপড়িগুলি। তারপর রাত্রির শেষের দিকে আবার একসময় সুমন্তনারায়ণ যখন নাচঘরে ফিরে আসতেন, নাচঘরের বিস্তৃত গালিচার উপরে তবলচী-সারেঙ্গীরা ও ইয়ার-বকসীর দল বিশৃঙ্খল এলোমেলো ভাবে নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন।

মুন্নাবাঈ একদিন প্রশ্ন করেছিল, কোথায় যাও প্রতি রাত্রে নাচ আর গানের আসর থেকে উঠে?

চমকে উঠেছিলেন যেন সুমন্তনারায়ণ। বলেছিলেন, কে বললে তোমাকে?

কেন, প্রতি রাত্রেই তো দেখি!

কি দেখো?

সুরাপাত্র ফেলে রেখে উঠে চলে যাও বাইরে!

ও কিছু না। ঘরের মধ্যে বড্ড গরম বোধ হয়, তাই একটু বাইরে যাই।

প্রতি রাত্রেই ?

সুমন্তনারায়ণ আর জবাব দেননি। বোতল থেকে বেলোয়ারী সুরাপাত্রে খানিকটা সুরা ঢেলে ঢক্‌ ঢক্‌ করে গলায় ঢেলে দিয়েছিলেন।

অবিশ্যি ঐ একদিনই।

দ্বিতীয়বার মন্নাবাঈ আর ও-প্রশ্ন করেনি সুমন্তনারায়ণকে।

সেই রাত্রেই সুমন্তনারায়ণের প্রথম কন্যাটি জন্মায়।

কঙ্কাবতী।

ক্যাথারিনের ঘর থেকে বের হয়ে আসছেন সুমন্তনারায়ণ, অলিন্দপথে সুরধুনীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

কোথায় ছিলে রায়মশাই ? ঘরে গিয়ে খুঁজে এলাম।

সুমন্তনারায়ণ সুরধুনীর প্রশ্নের কোন জবাব দেন না। সোজা নিজের শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুরধুনীও একটু যেন আশ্চর্য হয়েই সুমন্তনারায়ণকে অনুসরণ করে তাঁর শয়নকক্ষে পিছনে পিছনে গিয়ে প্রবেশ করে।

একটা সুখবর ছিল—

এবারে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালেন সুমন্তনারায়ণ সুরধুনীর মুখের দিকে।

তোমার ঘরে লক্ষ্মী এলো।

লক্ষ্মী !

হ্যাঁ। তোমার একটি কন্যা হয়েছে।

কন্যা !

সুমন্তনারায়ণ জানতেন বটে রাধারাণী অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং ভরা মাস চলছিল তার।

কখন হলো ?

এই কিছুক্ষণ, মুখ দেখবে না ?

এবারে সুমন্তনারায়ণ হেসে ফেললেন। বললেন, লক্ষ্মী-সন্দর্শনের এটা তো সময় নয় সুরো। কাল প্রত্যূষে তোমার লক্ষ্মী দর্শন করবো।

প্রথমা কন্যার জন্ম-তারিখটি কোন দিনই বিস্মৃত হননি সুমন্তনারায়ণ। কারণ পরের দিন শুনেছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা শহরটার নামটা পর্যন্ত পাল্টে তার নূতন নাম দিয়েছিলেন—আলিনগর। বোধ হয় দাদু আলিবর্দীর স্মৃতিটাকেই চিরস্মরণীয় করে রাখতে।

আলিনগরই বটে। বরং খালিনগর নামটা দিলেই বোধ হয় সত্যিকারের নাম দেওয়া হতো। সার্থক হতো নবাবের নতুন নামকরণ। শূন্য হাটে কাড়া দেওয়ার মতই নবাবের 'আলিনগর' নাম-ঘোষণাটি ভাগীরথীর তীরভূমিতে, কলিকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুরে পরিহাসের মতই একটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে শূন্যে বোধ করি মিলিয়ে গিয়েছিল।

কারণ, শুনবে কারা ?

ইংরেজ—যারা তৈরী করেছিল মনের মত করে এতদিন ধরে শহরটা, তারা তো প্রায় সকলেই এদিক-ওদিক 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' তখন। কিছু গোলার ঘায়ে কুপোকাৎ। কিছু প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে নৌকা উল্টে ভাগীরথী-তীরে মগ্ন।

আর দেশী লোকেরাও প্রায় অনেকেই মহাজনেরা যে পন্থা নিয়েছিলেন সেই পথেই অদৃশ্য হয়েছিলেন। অতএব আলিনগর নয়, হলো খালিনগর।

অন্ধকূপ হত্যার এক কল্পিত ভয়াবহ কাহিনী শুনেও পরদিন হলওয়েলের কথায় নবাব কান দিলেন না।

শোকাতুর হলওয়েলকে বরং আসন জল দিয়ে সুস্থ করে, সান্ত্বনা দিয়ে বাকী সব ইংরেজ বন্দীদের চালোয়া মুক্তির হুকুম দিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষদের আদেশ দিলেন, জিত্‌লিয়া যব কলকাত্তা বাজার, ফির্ চলো মুর্শিদাবাদ !

কলকাতার, ভুল হলো, আলিনগরের নবনিযুক্ত গভর্ণর মানিকচাঁদের হাতে শহর রক্ষণাবেক্ষণের সর্বভার অর্পণ করে, তিন শত রক্ষী মোতায়েন করে নবাব পুনরায় মুর্শিদাবাদের পথ ধরলেন।

॥ ৪ ॥

লোক-পরম্পরায় শোনা যায়. বিজয়গর্বে যুদ্ধশেষে ইংরেজদের কেল্লায় প্রবেশ করবার পর এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে সব দেখতে দেখতে নবাব নাকি খেদোক্তি করেছিলেন হলওয়েলের কাছে, তোমাদের গভর্ণর ড্রেকটা একটা আকাট মুখ্যু। জেদ করে আমাকে বাধ্য করলো এমন সুন্দর শহরটাকে কামান দেগে আগুন জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিতে !

কিন্তু অপরিণামদর্শী চপলমতি নবাব সেদিন কি স্বপ্নেও বুঝেছিলেন কামান দেগে আগুন জ্বালিয়ে কলকাতা শহরটাকে তিনি পোড়াননি, তিনি সেদিন তাঁর নিজের কপালেই আগুন দিয়েছিলেন, এবং সে আগুনে নিজে পুড়ে ছাই হয়ে তো গেলেনই, গোটা ভারতবর্ষের কোটি কোটি জনসাধারণের কপালেও সুদীর্ঘ প্রায় দুই শত বছরের জন্য সে আগুনের ছাই লেপে দিয়ে গেলেন।

চাটুকার ও কতকগুলো মূর্খ পার্শ্বচরের প্ররোচনায় হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে আত্মম্ভরিতায় বিচক্ষণ হিতাকাঙ্ক্ষী সুধী ব্যক্তিদের, এমন কি মাতার পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও, হুট করে যদি কলকাতা আক্রমণ না করে বসতেন, হয়তো আরো কিছুকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে নবাবের গদিতে বহাল-তবিয়তে কায়েমী হয়ে থাকতে পারতেন। কে বলতে পারে, ভাগীরথীর তীর-ভূমির ইতিহাস মায় সারা ভারতের ইতিহাসটাই পালটে যেতে পারতো কিনা !

মিত্তির মশাইয়ের বহির্মহলের ফরাসে অনেকেই সন্ধ্যার পর এসে জমায়েত হতো। তার মধ্যে আসতেন মৌলিক কায়েত নীলমণি দত্ত। রসিক পুরুষ ছিলেন নীলমণি দত্তমশাই। চমৎকার সুর করে ছড়া কাটতে পারতেন।

বুড়ো থুরথুরে হয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।

পরবর্তীকালে সুর করে তাঁকে প্রায়ই একটা ছড়া কাটতে শোনা যেতো।

কি হলো রে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
মীরজাফরের দাগাবাজি নবাব ধরতে পারল মনে
সৈন্যসামন্ত মারা গেল পলাশী ময়দানে।

কলকাতা শহরটার নাম পালটে আলিনগর রাখায় হো হো করে হেসে-ছিলেন দত্তমশাই। বলেছিলেন, নীলমণি রে নীলমণি, আরো কত দেখবি বিকিকিনি,—

কিন্তু দত্তমশাইয়ের কথা থাক। ফিরে আসা যাক নবাবের সেই আলি-নগরে, নতুন নামাঙ্কিত আদিশহর কলকাতায়।

কলকাতা জয় করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে তৈমুরলঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে সভাসদদের কাছে নবাব আস্ফালন করছেন, এদেশ থেকে টুপীওয়ালাদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে আমার একপাটি চটিজুতোতেই কাজ চলবে। সেই সময় কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল মাত্র দূরে দক্ষিণে ভাগীরথীর কূলেই ছোট্ট একটি গ্রাম ফলতায় প্রাণভয়ে পলাতক ইংরেজরা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

অবিশ্যি তাকে আশ্রয় নেওয়া বলে না। সেখানে ঐসময় কতকগুলো ভাঙ্গা গুদামঘর আর আধখানা একটা পুরানো মাটির কেল্লা ছিল। তারই মধ্যে গিয়ে মাথা গুঁজেছে সবাই কোনমতে।

আজকের ফলতা তো নয়, সেই অতীতের ফলতা গ্রাম। চারিদিকে ঘন বন জঙ্গল। জঘন্য আবহাওয়া, খাবার-দাবার জিনিসও কিছু নেই। তার উপরে আরো এক বিপদ। তাড়াহুড়ো করে কলকাতা থেকে প্রাণভয়ে কোনমতে সব পালিয়ে এসেছিল একবস্ত্রেই। দিনের পর দিন সেই সব নোংরা একবস্ত্রে থাকতে গিয়ে মশামাছির মতই সব লোক মরতে লাগলো।

কিন্তু তার মধ্যেও পলাতক গভর্ণর ড্রেক সেখানে বসেই তাঁর কাউন্সিল খুলে বসলেন।

কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তখন নবাবের করতলগত, মালিক সেখানকার মানিকচাঁদ। ফোর্ট উইলিয়ম নামে তাদের একটি জাহাজ ছিল, সেটাই হলো গভর্ণরের গভর্ণমেন্ট হাউস।

তবু আশায় দিন গনে সব।

মাদ্রাজে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে, কবে সেখান থেকে আসবে সৈন্যরা গোলাগুলি হাতিয়ার নিয়ে, আবার তারা তাদের এত সাধের কলকাতা উদ্ধার করে জাঁকিয়ে বসবে এই স্বপ্নেই সব তখন মশগুল।

কিছুদিন পরে মাদ্রাজ থেকে একদল সৈন্য এলো বটে কিন্তু তারাও দুদিনেই ফলতার আবহাওয়ার গুণে আধমরা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

তারপর আবার সেই আশায় আশায় দিন গণনা।

বিনা তারে সংবাদ-প্রেরণের কোন ব্যবস্থা বা দ্রুতগামী রেলপথে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংবাদ-প্রেরণের কোন বিলি-ব্যবস্থা তখন না থাকলেও, রাজধানীর যাবতীয় গরম গরম সংবাদ ফলতার পর্যন্দস্ত ইংরাজদের কানে মধ্যে মধ্যে নিয়মিতই এসে পৌঁছচ্ছিল।

হামবড়াই নেশাখোর পূর্ণিয়ার নবাব, সিরাজের মাসতুতো ভাই শৌকত-জঙ্গ লম্ফঝম্প শুরু করেছেন। এক কোটি টাকা ঘুষের প্রতিশ্রুতিতে দিল্লীর বাদশাহের উজীর সাহেব খাজিউদ্দীনের কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবীর এক ফরমান করতলগত করে গরম মেজাজে সিরাজকে এক পত্রাঘাত করেছেন, মানে মানে মসনদ ছেড়ে সরে পড়ো ভায়া।

চপলমতি সিরাজও একদিন সভার মধ্যেই দশজনের সামনে জগৎশেঠের গণ্ডে এক চপেটাঘাত কষিয়ে দিয়েছেন।

হঠকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার জমা খরচের খাতার পাতাগুলো ভরে উঠেছে একটি দুটি করে। ইঁট দিয়ে গাঁথা রাজপ্রাসাদের নিভৃত বায়ুলেশহীন কক্ষের মধ্যে ফৈজীর যন্ত্রণাকাতর দীর্ঘশ্বাসে সিরাজের গোনা দিন একটি দুটি করে ফুরিয়ে আসছে।

উর্বর ভাগীরথীর তীরভূমিতে এক নয়া জমানার অঙ্কুরের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

ওদিকে কলকাতা শহরটাকে দখল করবার ঠিক দু মাস পরেই সুদূর ইউরোপ থেকে সাত সাগর পাড়ি দিয়ে মাদ্রাজের মাটিতে পা দিল এক শ্বেতকায় পুরুষ।

শুধু কলকাতা নয়, বাংলা বিহার উড়িষ্যাও নয় কেবল, সারা ভারত— হিমালয় হতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত তীরভূমি বোধ করি সেদিন শিউরে উঠেছিল এক নতুন যুগের সম্ভাবনায়! সুদূর অতীতে কবে একদিন কালিকটের মাটিতে পর্তুগীজ ক্রেস্তান ভাস্কোডাগামার পদসঞ্চার, তারপর এই দ্বিতীয় পদসঞ্চার বুঝি।

জলের বণিক বহুকাল আগেই অবিশ্যি ডাঙ্গায় নেমে আস্তানা গেড়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল তাদের নিছকই বণিক-বৃত্তি, এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্যও এখানে সেখানে দু-একটা কুঠি তৈরী চলেছে। তখন সারা ভারত জুড়ে এক মাৎস্যন্যায়ের যুগ।

প্রবলের হাতে দুর্বলের অশেষ লাঞ্ছনা, রাজার হাতে প্রজার চরম নিগ্রহ, অসাধুর হাতে সাধুর চরম অপমান। দেশের যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক।

নরহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা জনগণের একমাত্র নীতি। ঘুষের লোভে যে কোন নীচ কাজ করিয়ে নেওয়া যায় যে কোন লোককে দিয়ে।

দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা যারা ও তাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ যারা, তারা হচ্ছে একদল ঘুষখোর সুবিধাবাদী অপদার্থ।

আর ওদিকে দিল্লীর তখ্‌ত-তাউস নিয়ে চলেছে জঘন্য ছোরা-ছুরি চালনা ও রক্তারক্তি। মুঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের ইতিহাস শেষের পৃষ্ঠায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

সম্রাট ফররুকশিয়ারের ফরমানের জোরে মাত্র তিন হাজার টাকা মাশুল দিয়ে ইংরাজরা সর্বত্র ঢালাও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে ও কলকাতার আশেপাশে আটত্রিশখানা গ্রামও কিনতে পারবে, এ অনুমতিটা আদায় করে নিয়েছে।

জমিদারি। জলের বণিক ডাঙ্গায় নেমে শুধু থাকবার মত বাসস্থানই নয়, মাটি কিনে করবে জমিদারি।

জমিদারির এলাকাটা হচ্ছেঃ চিৎপুর, সিমলে, মির্জাপুর, আরপুলি, কলিঙ্গা, চৌরঙ্গী ও বির্জিতলা।

জমিদারি রাখতে গেলে কিছু লোকলস্করের প্রয়োজন তো বটেই, সৈন্য — সেই সঙ্গে দুর্গ, কামান, গোলাগুলি আনুষঙ্গিকেরও প্রয়োজন।

অতএব ভাগীরথীর তীরভূমি কলকাতা জুড়ে এক নয়া জমানার পত্তন।

আলিনগর—নয়া কলকাতার নতুন ইতিহাস লেখা হবে মসী দিয়ে নয়, অসিমুখে। তাই বোধ হয় যে মসী নিয়ে একদা মাদ্রাজের তীরভূমিতে শ্বেতাঙ্গ ক্লাইভ অবতীর্ণ হয়েছিল, তার হাতের সেই মসীই রূপান্তরিত হলো অসিতে।

কেরানী ক্লাইভ হলো যুদ্ধবিদ ক্লাইভ। কর্নেল ক্লাইভ।

হলওয়েলের রঙফলানো, তাতানো, কলকাতায় পরাজয়ের ও দুর্গতির সংবাদে মাদ্রাজে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

যুদ্ধ! যুদ্ধ!···

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন ও কর্নেল ক্লাইভের নেতৃত্বে ভাসলো রণতরী।

তারপর একদিন ভাগীরথী তীরে ফলতায় এসে নোঙর ফেললো তারা।

ঝটিতি পত্র গেল আলিনগরের নতুন গভর্ণর মানিকচাঁদের কাছে। কিন্তু মানিকচাঁদের কাছ থেকে সে চিঠি যখন ফিরত এলো, কর্নেল সদম্ভে বললে, নবাব বাহাদুরের পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইতে মাদ্রাজ থেকে এতদূর ছুটে আসিনি।

অতএব এবারে সোজা চিঠি চলে গেল নবাবের দরবারে।

প্রাণভয়ে কলকাতা থেকে যারা পালিয়েছিল, ইতিমধ্যে তারা আবার সুড়-সুড় করে শহরে ফিরে আসতে শুরু করেছে তখন। অরাজকতার মধ্যেই একটু একটু করে আবার কাজ-কারবার শুরু হচ্ছে।

অনন্যোপায় হয়ে সে রাত্রে ক্যাথারিনকে এনে নিজের গৃহে তুললেও, বিদেশিনী বিধর্মী নারীর আগমনে হিন্দুগৃহের সংস্কার ও শুচিতায় যে বিরোধ ঘটতে পারে, বিশেষ করে রাধারাণী যে ব্যাপারটা সস্নেহ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে না, তা চিন্তা করে সুমন্তনারায়ণের মধ্যে যে একটা দ্বিধা

জেগেছিল, সেটার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল দিন কুড়িকের মধ্যেই!

রাধারাণীর তো বটেই, সুরধুনী নিজে বৈশ্যকন্যা হলেও সামাজিক সংস্কারের শুচিবাই তার ছিল। সুমন্তনারায়ণের গৃহে আশ্রয় পেলেও সে যতদূর সম্ভব নিজেকে ঐ গৃহের সকল প্রকার আচার ও সংস্কার থেকে সযতনে বাঁচিয়েই চলতো। ভুলক্রমেও পূজার ঘরে বা রন্ধনশালায় সে কখনও প্রবেশ করতো না।

যদিও সুমন্তনারায়ণ নিজে ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না এবং প্রথম প্রথম দু-একবার সুরধুনীকে স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে সে কথা বলেও ছিলেন।

কিন্তু মৃদু হেসে সুরধুনী বলেছিল, জোর করে কোন কিছু করতে নেই রায়মশাই। তাতে করে বিরোধই বাড়ে। খুঁচিয়ে ঘরের শান্তি নষ্ট করে লাভ কি!

লাভ-অলাভ বুঝি না সুরো, তবে এটা অন্যায়। বলেছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

কি অন্যায়—ঠাকুরঘরে ও রন্ধনশালায় না যাওয়াটা?

নিশ্চয়ই। মানুষকে তাতে করে ছোট করাই হয়।

না।

কেন নয়?

এটা তর্কের কথা তো নয় রায়মশাই। তাছাড়া শুধু আমার যে জাতেরই অধিকার নেই তা নয়, ধর্মও যে আমার নেই।

ধর্ম নেই!

তা বইকি, আর সে কথা তুমি তো ভাল করেই জান রায়মশাই।

কিন্তু যা হয়েছে সে তো তোমার ইচ্ছায় হয়নি। সে তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র।

দুর্ঘটনা!

হাঁ, দুর্ঘটনার ওপরে মানুষের তো কোন হাত নেই।

তা নেই বটে, তবু সে দুর্ঘটনাকে অস্বীকারও তো করতে পারবো না—আমিও না, তুমিও পারবে না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সুমন্তনারায়ণকে চুপ করে যেতে হয়েছিল। সুমন্তনারায়ণের গৃহে সুরধুনী থেকেও যেন ছিল না।

যাহোক, ক্যাথারিন সম্পর্কে প্রতিবাদ তুললো রাধারাণীই।

ক্যাথারিন পূর্বের মত বহির্মহলেই ছিল এবং সুরধুনীই তার দেখাশোনা করতো।

সেদিন রাত্রে দাসী এসে জানালো, বৌমা সুমন্তনারায়ণকে বিশেষ করে একবার ডেকেছে।

সুমন্তনারায়ণ রাধারাণীর ঘরে এসে প্রবেশ করে বললেন, আমাকে ডেকেছিলি?

হাঁ, এসব কি শুনছি ? স্পষ্টাস্পষ্টিই বক্তব্য শুরু করে রাধারাণী।

কেন, কি হলো আবার ?

কোথাকার কে এক অজাতের আপদ ঘরে এনে তুলেছো !

বিপদে পড়েছে—

বিপদ তো আমাদের কি ! ওসব রাখা এখানে চলবে না বলে দিচ্ছি।

কিশোরী, ভীরু, লাজুক সে রাধারাণী আর নেই এখন। ভয়ে ভয়ে স্বামীর দিকে মুখ তুলে আর আজকাল রাধারাণী কথা বলে না।

বিপদে পড়েছে, আশ্রয় দিয়েছি, তাছাড়া সে তো বাইরের মহলেই আছে !

না। একে তো এক আপদ ঘাড়ে আছে, তার উপরে আবার নতুন করে—

ছিঃ রাধা !

কেন, ছিঃ কেন শুনি ? গৃহস্থের ঘরে যত সব অনাচার !

কিন্তু ও যাবেই বা কোথায় ?

যেখানে খুশি যাক। আমার কি তাতে ! আমি স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, কাল সকালের মধ্যেই যেন ও আপদ এখান থেকে বিদায় হয়।

॥ ৫ ॥

হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়ির পশ্চাতেই বন্ধু কিনু চাটুয্যের একটা ছোট বাড়ি ছিল।

সংসারে একা মানুষ কিনু চাটুয্যে। বার বার দু'বার বিবাহ করেও সংসার গড়ে তুলতে পারেন নি, দু'বারই এক বৎসরের মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছিল, সেই দুঃখে আর সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। তাঁরই বাড়ির একটা খালি ঘরে বন্ধুকে বলে দিন দুই পরে সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন। আরো বছর পাঁচেক বাদে কিনু চাটুয্যের কাছ থেকেই তাঁর বাড়িটা ক্রয় করে ও আশেপাশের কিছু জমি কিনে ক্যাথারিনের থাকবার জন্যে একটা বাগানবাড়ি করে দিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

রাধারাণীর ভয়েই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, ব্যাপারটা গোপন করে গিয়েছিলেন সকলের কাছেই সুমন্তনারায়ণ। একমাত্র সুরধুনী ব্যতীত বাড়ির আর সকলের কাছেই ব্যাপারটা গোপন ছিলও দীর্ঘদিন ধরে।

রাধারাণী জেনেছিল প্রায় সাত বছর পরে।

কিন্তু ফাঁকি দিতে পারেননি সুমন্তনারায়ণ সুরধুনীর চোখকে।

ক্যাথারিনের জন্য একজন ভৃত্য ও একজন দাসী রেখে দিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ। তারাই তার দেখাশোনা করতো।

সুমন্তনারায়ণের প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে ঢের বেশী পরিচয় ছিল সুরধুনীর, রাধারাণীর চাইতে।

সুরধুনীর মত বোধ করি যত নারী সুমন্তনারায়ণের জীবনে এসেছিল, তাদের কেউ সমস্ত প্রাণ দিয়ে অমন করে তাঁকে ভালবাসতে পারেনি। আর

সেই ভালবাসায় নিজেকে সমর্পণের মধ্যে দিয়েই সুমন্তনারায়ণের মনের খবরটি সুরধুনী যত তাড়াতাড়ি জানতে পারতো আর কারো পক্ষেই তা সম্ভব ছিল না।

নিজের ভালবাসা দিয়েই সুরধুনী সুমন্তনারায়ণকে জয় করে নিয়েছিল বলেই এবং সুমন্তনারায়ণের প্রতি সুরধুনীর সেই ভালবাসার কোন বহির্প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস ছিল না বলেই হয়তো ঐ গোপন তথ্যটি কোনদিনই কারো কাছে ধরা পড়েনি।

অত্যন্ত কম কথা বলতো সুরধুনী।

সঞ্চরণশীল একটা ছায়ার মতই ছিল সুরধুনী সুমন্তনারায়ণের সংসারের মধ্যে এবং প্রথম দিকে যেমন, শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন ও সাচ্ছল্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন সুমন্তনারায়ণের সংসার ভরাভর্তি জমজমাট হয়ে উঠেছিল, লোকজন পাইক লস্কর পেয়াদা দাসদাসীতে গম্‌গম্‌ করতো, তখন ঐ সংসারে সুরধুনীর উপস্থিতিটা যেন বোঝবারও উপায় ছিল না। স্বল্পবাক সুরধুনীকে যেমন কেউ কোনদিন উচ্চকণ্ঠে একটি কথা বলতে কখনও শোনেনি, তেমনি আনন্দ-বেদনায়-উৎসবে হৈ-হল্লায় কাঁদতে বা হাসতেও কেউ দেখেনি।

একদিন মাত্র তার চোখে অশ্রু দেখা গিয়েছিল। অবিরল ধারায় নিঃশব্দ অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিয়েছিল—সুমন্ত-নারায়ণ যেদিন মারা যান।

ঐ কাহিনী অবিশ্যি সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতায় পাওয়া যায়নি। শোনা কথা বিভূতির। সদু ঠাক্‌রুন, সৌদামিনী দেবীর মুখেই শোনা সে কাহিনী।

সুমন্তনারায়ণ যখন পরলোক গমন করলেন, পুত্র কন্দর্পনারায়ণের বয়স তখন একুশ বৎসর। বলিষ্ঠ যুবা কন্দর্পনারায়ণ।

কঙ্কাবতী, রূপবতী ও হৈমবতী তিন কন্যা। কঙ্কাবতী ও রূপবতীর বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

হৈমবতীর হয়নি। পুত্রবধূ রাজেশ্বরীও ঘরে এসেছে।

মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

বিরাট ধনী সুমন্তনারায়ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, কন্দর্পনারায়ণ ও আমলা-গোমস্তারা সকলেই সেই ব্যাপারে ব্যস্ত। রাধারাণী মৃত স্বামীর শিয়রের ধারে উপুড় হয়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে। মেয়েরাও কাঁদছে উচ্চৈঃস্বরে।

সুরধুনী কেবল নিঃশব্দে বসে আছে মৃত সুমন্তনারায়ণের পায়ের ধারটিতে। পাথরের মত নিশ্চুপ। দরদরধারায় অশ্রু গড়িয়ে তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে দিয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

তারপর ঘটা করে এক সময় মৃতদেহ গঙ্গাতীরে হরিধ্বনি করে নিয়ে যাওয়া হলো। বিরাট সুগন্ধী চন্দনকাষ্ঠে সাজানো হলো চিতা। মৃতদেহ চিতায় তুলে কন্দর্পনারায়ণ মুখাগ্নি করে চিতায় অগ্নিসংযোগ করতেই দাউ দাউ করে

জ্বলে ওঠে চিতা।

সহসা ঐ সময় দেখা গেল রক্তলালপাড় শাড়ী পরিধানে, অর্ধাবগুণ্ঠনবতী এক নারী এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে সেই চিতার দিকে, গভীর বিষাদের একটি সঞ্চরণশীল ছায়ার মত।

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি সেই নারীকে। সহসা সেই নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তখন সকলেই যেন চমকে ওঠে।

গুণ্ঠনের দু পাশ দিয়ে বক্ষের দুপাশে কালো নিবিড় কেশভার নেমে এসেছে। সমস্ত কপাল ও সিঁথি সিন্দুরে লালে লাল। মণিবন্ধে একগাছি করে মাত্র দুগ্ধধবল শাঁখা। দু পায়ে রক্তলাল আলতা।

বিস্মিত নির্বাক সকলে। স্পন্দনহারা মূক। কি বলবে, কি করবে কেউ যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না ঐ মুহূর্তটিতে। পাথরের মত শুধু সকলে দাঁড়িয়ে।

চিতার লক্ লক্ শিখাগুলি কাঁপছে যেন ঊর্ধ্ববাহু প্রণামের ভঙ্গিতে।

সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। পশ্চিম আকাশ ও ভাগীরথী-বক্ষে কে বুঝি ছড়িয়ে দিয়েছে মুঠো মুঠো রাঙা আবীর।

মাথায় ও কপালে সিন্দুর, পায়ে আলতা সেই নারী ধীর শান্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। হাওয়ায় এলানো রুক্ষ কেশ উড়ছে।

এতক্ষণে কন্দর্পনারায়ণ যেন সংবিৎ ফিরে পান। ছুটে এগিয়ে এসে একেবারে সেই নারীমূর্তির সামনে দাঁড়ান। চিনতে পেরেছেন তখন তিনি সুরধুনীকে।

চিৎকার করে ডাকেন, ঠাকরুন!

কিন্তু সাড়াও দিল না, তাকালও না ফিরে কন্দর্পনারায়ণের দিকে সুরধুনী।

আবার চিৎকার করে ডাকলেন কন্দর্পনারাযণ, ঠাকরুন!

এবারে সুরধুনী একবার অস্তগমনোন্মুখ রক্তিম দিবাকরের দিকে তাকালেন, করজোড়ে বুঝি প্রণাম করলেন দিনমণিকে ও জাহ্নবীকে। তারপর প্রণাম করলেন প্রজ্বলিত চিতাগ্নিকে।

ঠাকরুন!

আমি যাচ্ছি কন্দর্প।

মাত্র ঐ তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে শান্ত দৃঢ় পদে সুরধুনী গিয়ে প্রজ্বলিত চিতার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এক অস্ফুট চিৎকার বের হয়ে এলো কন্দর্পনারায়ণের কণ্ঠ থেকে।

কাহিনীটা বলতে বলতে নিজের অজ্ঞাতেই গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলেও পরক্ষণেই কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বদলে ব্যঙ্গোক্তি করে বলতেন আবার কত্তা-মা, সতীলক্ষ্মী আমার সহমরণে গিয়েছেন! সারাটা জীবন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, রাক্ষুসী ডাইনী সহমৃতা হয়েছেন—কুলটার আবার কত ঢং!

॥ ৬ ॥

সে সব তো অনেক অনেক পরের কাহিনী।

সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতাই তো এখনও শেষ হয়নি। সুমন্ত-নারায়ণের নিজের হাতে তৈরী রায়বাড়ি ও তাঁর নিজের সেই সব বিচিত্র কাহিনী।

ক্লাইভের যুগে, হেস্টিংসের যুগে সেই অম্ভিত ভাগীরথী তীরে শহর কলকাতার আদিপর্বে নতুন যে সমাজ ও নতুন যে মানুষের ইতিহাস, সুমন্ত-নারায়ণ ইত্যাদির ইতিকথা তা।

বনজঙ্গল-ঘেরা ভাগীরথীরই দক্ষিণ কূলে ফলতার সেই নগণ্য গ্রামের মধ্যে বসে বসে অদূর ভবিষ্যতে পলাশীর প্রান্তরের যে বিষবৃক্ষের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিল, মুর্শিদাবাদে বাংলার মসনদে বসে হতভাগ্য নবাব বা তাঁর দেশবাসীরা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন সেদিন যে, তা তার সুদূর ভিত্তিটাকে তলে তলে ঝাঁঝরা করে দেবে!

তা যদি ভাবতে পারতেন তা হলে বোধ হয় নবাব ভুলেও আস্ফালন করতে পারতেন না তাঁর সভাসদ ও পার্শ্বচরদের কাছে যে, তাঁর এক পাটি জুতোই এদেশ থেকে ঐ ফিরিঙ্গী কোম্পানিকে তাড়াতে যথেষ্ট।

কিন্তু যাক সে কথা।

চিঠি-চাপাটির চালাচালি দেখে ইতিমধ্যেই আলিনগরের গভর্ণর মানিকচাঁদ শিবপুরের থানা-দুর্গটা ঝালিয়েঝুলিয়ে ঠিকঠাক করে রেখে, হাজার দুই সৈন্য নিয়ে বীরদর্পে অগ্রসর হলো বজবজের দিকে।

ওদিকে ইংরেজরাও অগ্রসর হয়েছে তখন স্থলপথে ও জলপথে। জলপথে গোরা সৈন্যদের নিয়ে ক্লাইভ আর ওয়াটসন। বহুপূর্বেই ওদিকে নবাবের নজরবন্দী থেকে মুক্তি পেয়ে ওয়াটসন ফলতায় এসে হাজির হয়েছিলো।

বজবজে পৌঁছাবার আগেই মায়াপুরে জাহাজ থেকে সৈন্যদের ডাঙ্গায় নামিয়ে দিল ক্লাইভ।

স্থলপথে দেশী সৈন্যবাহিনীও তখন এসে পৌঁছে গিয়েছে।

মিলিত বাহিনী এবারে অগ্রসর হলো বজবজের দিকে।

সারাটা রাত ধরে পদব্রজে সকলে বজবজের মুখে এসে পৌঁছাল পরের দিন সকালে।

চারিদিকে বনজঙ্গল। মাইল দুয়েক দূরে মানিকচাঁদ আস্তানা গেড়েছে।

ক্লাইভের সঙ্গে ঠিক পরিচয়টা ছিল না মানিকচাঁদের ও তার ফৌজের। তাই হুড়মুড় করে তারা সসৈন্য ক্লাইভকে আক্রমণ করে বসবার আধঘণ্টার মধ্যেই শ'দুই সৈন্য হতাহত হয়ে, চারজন জাঁদরেল সৈন্যাধ্যক্ষ মাটি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল।

মানিকচাঁদ তো প্রায় গুলি খেতে খেতে কোনমতে প্রাণটা নিয়ে সেযাত্রা সোজা একেবারে চোঁচা দৌড় দিয়ে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছালো।

বাব্বাঃ আর একটু হলেই পৈতৃক প্রাণটা গিয়েছিল আর কি!

ওদিকে দুর্গমধ্যস্থিত ফৌজরাও ওয়াটসনের দুই গোলা খেয়ে চুপ।

দুম্ দুম্ দড়াম্ সে কি আওয়াজ!

আক্কেল একেবারে গুড়ুম সবার!

সেই রাত্রেই নবাবের বজবজের কেল্লাটা প্রায় বিনা লড়াইয়েই ইংরাজের করতলগত হয়েছিল।

তারপর আবার 'কুইক মার্চ'।

মাঝপথে ভাগীরথীর একদিকে মেটেবুরুজের মাটির কেল্লা আলিগড় ও অন্যদিকে শিবপুরের থানা-দুর্গও বলতে গেলে প্রায় বিনা যুদ্ধেই ইংরাজদের অধিকারে চলে গেল।

একটা বছরও নয়, মাত্র ছয় মাস এগার দিন পরেই ভাগীরথীর বুকে ভাসমান জাহাজ থেকে গোটা দুই গোলা কলকাতার ফোর্টের উপর ছুঁড়তেই ফোর্ট একেবারে খালি হয়ে গেল, আলিনগরের গভর্ণর বাহাদুর মানিকচাঁদ আলিনগরের গভর্ণরগিরি ফেলে টেনে দৌড় দিয়ে গিয়ে একেবারে হুগলীতে নিঃশ্বাস নিলেন। এবং শুধু আলিনগরের গভর্ণর বাহাদুর মানিকচাঁদই নয়, সেই সঙ্গে বেশীর ভাগ অধিবাসীরাই যে যেদিকে পারলো পালিয়ে বুঝি আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলো। আলিনগর হলো খালি নগর।

ক্রমশ আবার একদিন কলকাতা শহরে সাড়া পড়ে গেল। ফিরে এসেছে রে, আবার ইংরেজরা, ফিরিঙ্গীরা এসেছে!

গভর্ণর পালালো তো আর কি, কলকাতার মালিক আবার ইংরাজ বণিক!

অতএব প্রথমেই আলিনগর নামটি মুছে ফেলে কলকাতার পুরাতন নাম ঘোষণা করে দেওয়া হলো—কলকাতা কলকাতাই! এর আর অন্য নাম হতে পারে না!

পলাতক গভর্ণর ড্রেকই আবার তাঁর পূর্বপদে বহাল হলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসন ও ক্লাইভ দুজনেই নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল।

যুদ্ধং দেহি!

একে একে আবার ফলতা থেকে, চন্দননগর থেকে যে সব ইংরেজরা পালিয়েছিল, তারা তাদের তল্পিতল্পা নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে শুরু করলো। কলকাতায় প্রবেশ করে তারা খেদোক্তি করে, হায়, হায়—এমন চমৎকার শহরটা ছিল, মাত্র ছয় মাসে কি করে দিয়ে গিয়েছে!

ফোর্টটা তো একটা ধ্বংসস্তূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। আসবাবপত্র সব লোপাট।

আলিনগরের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আবার নতুন কলকাতা শহর গড়ে তোলবার তোড়জোড় চলতে লাগলো।

॥ ৫ ॥

অঙ্কুর

কি হল র জান
পলাশী ময়দানে ওড়ে কোম্পানী নিশান

॥ ১ ॥

দুর্দান্ত সিংহপুরুষ ছিলেন সুমন্তনারায়ণ। যেমন দশাসই চেহারা তেমনি অমিত শক্তিধর। শুধু লম্বা-চওড়াই নয় সত্যিকারের সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু সর্বকিছুর উপরে তাঁর যে আর একটি পরিচয় ছিল সেটার সন্ধান তাঁর জীবিতাবস্থায় একমাত্র মুন্নাবাঈ আর সামান্য বোধ করি কিছুটা সুরধুনী ছাড়া বোধ হয় আর কেউই পায়নি।

অর্থের অদম্য লালসা ও সেই সঙ্গে মদ্য-প্রীতি ও নারীদেহের প্রতি পাশবিক একটা লোলুপতাই কিন্তু সুমন্তনারায়ণের চরিত্রের একটিমাত্র বিশেষত্ব ছিল না। ঐ সব কিছু ছাপিয়ে সেই দুর্দান্ত পুরুষসিংহের অন্তরের নিভৃতে ছিল একটি অপরূপ রসস্নিগ্ধ কবিমন। কাব্যরসিক মন। এবং যে কবিমনটি তাঁর শতদলের মত পাপড়ির পর পাপড়ি মেলেছে তাঁরই রোজনামচার পাতায় পাতায় অত্যাশ্চর্য ভাবে।

বিভূতি যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, রায়বাড়ির কোন এক নিভৃত কক্ষে, অর্থ মদ ও নারীদেহের সমস্ত চিন্তা ও কুশ্রী লোলুপতাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সারাটা দিনের পরিশ্রমের পর কোন কোন রাত্রির নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একাকী কবি সুমন্তনারায়ণ প্রদীপের আলোয় বসে খাগের কলমে লম্বা একটা মোটা খাতার পাতায় একাগ্রচিত্তে লিখে চলেছেন তাঁর রোজনামচা।

দৈনন্দিনের লিপি। তাঁর বিচিত্র জীবনের হাসি কান্না ব্যথা বেদনা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের টুকরো টুকরো সব কাব্যকথা যেন রোজনামচার জীর্ণ লালচে পাতায় ছড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রথম নিজে লিখতেন এবং নিজেই পড়তেন। নিজের জীবনস্মৃতির নিজেই ছিলেন একমাত্র নীরব শ্রোতা।

হেমাঙ্গিনীর কথা, সুরধুনীর কথা, রাধারাণীর কথা, ক্যাথারিনের কথা, মুন্নাবাঈয়ের কথা। আর কবিবন্ধু প্রাণের দোসর শ্রীনরোত্তম দাসের কথা।

কেউ না জানলেও মুন্নাবাঈ কিন্তু জানতো সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার কথা।

কি করে যে সে-কথা সে জানতে পারলো, সুমন্তনারায়ণ প্রশ্ন করলে মৃদু মৃদু হাসতো মুন্নাবাঈ। কিছুতেই বলতো না।

সুমন্তনারায়ণ কতবার জিজ্ঞাসা করেছেন সেই প্রথমদিন মুন্নার মুখে আকস্মিক প্রশ্নটা শোনবার পর থেকেই। শুধিয়েছেন বারে বারে সেই একই প্রশ্ন।

আশ্চর্য! কি করে জানলে বল তো মুন্নী, যে আমার জীবনকথা আমি একটা খাতায় লিখি! কেউ তো জানে না!

কিন্তু আমি জানি।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, জানলে কি করে?

বলবো না। বলে মিটি মিটি দুষ্টু হাসি হেসেছে মুন্নাবাঈ।

কেন?

কেন আর, মনে করো এমনি—

আশ্চর্য!

তারপর হঠাৎ একদিন মুন্নাবাঈ বলেছিল, শোনাবে খাতাটা পড়ে? পড় না, শুনি কি লিখছো তুমি?

কি হবে জেনে?

বাঃ, জানতে হবে বৈকি!

কি জানতে হবে?

তোমার জীবনের সব কথা।

কিন্তু তুমি শুনে তা কি করবে?

কি আবার? শুনবো! তুমি শোনাবে?

কিন্তু তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কি হবে সে কথা শুনে?

বললাম তো শুনবো।

বেশ তো, শোনাবো একদিন পড়ে—

শোনাবো নয়, কবে শোনাবে বল?

শোনাবো—কিন্তু হঠাৎ এত আগ্রহই বা কেন?

নাই বা সে কথা জানলে! বল কালই শোনাবে?

আচ্ছা। আচ্ছা।

ঠিক পরের দিনই নয়। তবে কয়েকদিন পরে।

শুনিয়েছিলেন পড়ে মুন্নাবাঈকে তাঁর রোজনামচা থেকে সুমন্তনারায়ণ।

সেই প্রথম আরম্ভটি যার—

বিষ্ণুনারায়ণ রায়, বাস সপ্তগ্রাম,
যথা সপ্ত ঋষি স্থান
ঘাট ত্রিবেণী নাম,
তাঁর পুত্র সুমন্ত রায়—

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়েছিল মুন্নাবাঈ।

বলেছিলো, না, না—ও সব নয়, সেই মেয়েটির কথা বলো।

মেয়ে! কোন্ মেয়ে? অবাক হয়ে চেয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ মুন্নার

মুখের দিকে।

কেন, লেখোনি তোমার খাতায় কিছু তার কথা ?

কার কথা ?

সেই একটি মেয়ে—

মেয়ে ?

হাঁ—সেই যে গো হেমাঙ্গিনী না কে !…

ভূত দেখার মতই যেন চম্‌কে উঠেছিলেন সেরাত্রে সুমন্তনারায়ণ বাঈজী মুন্নার মুখে হেমাঙ্গিনীর নামটি শুনে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে চাপা কম্পিত কণ্ঠে শুধিয়েছিলেন, ও নাম—ও নাম তুমি জানলে কি করে বাঈজী !

বাঈজী মুন্নাও প্রথমটায় যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল কথাটা বলে, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে বলেছিল, কেন, তোমার মুখেই শুনেছি !

আমার মুখে ? অবাক বিস্ময়ে আবার তাকিয়ে ছিলেন সুমন্তনারায়ণ মুন্নাবাঈজীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ।

হ্যাঁ, তোমারই মুখে। মদের নেশার ঘোরে কতবার তুমি ঐ নাম করেছো। তারপর সহসা কণ্ঠস্বর অনুরাগে আব্দারে খাদে নামিয়ে এনে বলেছে, কে গো হেমাঙ্গিনী তোমার, বল না ?

হেমাঙ্গিনী ?

হ্যাঁ।

জবাব দিতে গিয়ে কেমন যেন সহসা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছেন সুমন্ত-নারায়ণ।

কই শোনাও না হেমাঙ্গিনীর কথা ! থামলে কেন, পড় ! আবার অনুরোধ জানিয়েছে মুন্নাবাঈ আদরে অনুরাগে।

সুমন্তনারায়ণ কিন্তু তখনও একদৃষ্টে পলকহারা তাকিয়ে আছেন মুন্না-বাঈয়ের মুখের দিকে।

দেওয়ালগিরির উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে মুন্নাবাঈয়ের মুখের উপরে।

আশ্চর্য মিল !

কিন্তু কপালের বামদিকে ঐ লম্বা ক্ষতচিহ্নটা ? অধর থেকে বাঁদিককার চিবুক পর্যন্ত বিশ্রী পোড়া দাগটা, রাহুর মতই যে দাগ দুটো মুন্নাবাঈয়ের সমস্ত মুখচন্দ্রিমাকে কলঙ্কিত করে রেখেছিল, আর কেবল ঐ দুটি কলঙ্ক-চিহ্নরই যেন কিছুতেই মনের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে খুঁজেও সন্ধান পেতেন না।

অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে যেতো সব। কেমন যেন সব অতীত ও বর্তমান গুলিয়ে ফেলতেন।

কে—কে ঐ মুন্নাবাঈজী ? আচমকাই যেন মনের ভিতর তাঁর প্রশ্নটা জাগছে।

কি গো, অমন করে চেয়ে চেয়ে দেখছো কি নাগর ? বলতে বলতে খিল-

খিলিয়ে হেসে উঠেছিল বাঈজী।

না, কিছু না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে যেন জবাব দিয়েছেন সুমন্তনারায়ণ।

পরক্ষণেই আবার বাঈজীর কাছ থেকে তাগিদ এসেছে, কই নাগর, পড়ে শোনাও তোমার হেমাঙ্গিনীর কথা!

সুমন্তনারায়ণ পড়তে শুরু করেছেন, কণ্ঠে যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ সমস্ত প্রেম অপূর্ব এক সুরের সঙ্গীতের মূর্ছনা তুলেছেঃ ঋষিশাপে নিমজ্জিতা লক্ষ্মী যেমন একদিন মন্থনশেষে সুধাভাণ্ডটি নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তেমনি করেই যেন হেমাঙ্গিনীর আবির্ভাব ঘটেছিল আমার জীবনে —আহা, কি রূপ, কি রূপ—মরি, মরি—

সুমন্তনারায়ণ পড়ে চলেছেন, বিভূতি যেন স্পষ্ট শুনতে পায়, তবে ঐ সুললিত ভাষায় নয়। তাঁর ভাষাটা ছিল কেমন কটমটো, শতেক ভুলভ্রান্তিতে ভরা, হ্রস্ব-দীর্ঘ ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই।

হবেই বা কোথা থেকে? সুমন্তনারায়ণের দোষ নেই। শুধু শেখবার জন্য, কেবল জ্ঞানের খাতিরে কিছু শিক্ষা করা তো সে যুগের ধর্ম ছিল না। বাংলা পাঠশালে তো শেখানো হতো সেদিন খানিকটা বর্ণপরিচয় মাত্র। আর তাব সঙ্গে কিছু শুভঙ্করীর আঁক। অবিশ্যি সংস্কৃত টোলে কিছুটা ব্যাকরণ, খানিকটা কাব্য, দু-চার পাতা স্মৃতি আর ন্যায়ের চুলচেরা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রচুর কূটতত্ত্বও ঐ সঙ্গে শেখানো হতো।

আর লোকে শিখবে যে তাদের সে শিক্ষা দেবেই বা কে? ইংরেজ যারা সে সময় এদেশে আসতো, তাদের নিজেদেরই কিছু কি শিক্ষাদীক্ষা ছিল? সব তো বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ওঁচা মাল। তাছাড়া সেদিন তারা তাদের নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু পর্যন্ত ভুলে এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা ভাষা আচার ব্যবহার রীতি-নীতির সঙ্গে যেন নিজেদের চাল-ডালের মত মিশিয়ে দিয়েছিল অর্থোপার্জনের ষোলআনা স্বার্থটাকেই কেবল জীইয়ে রাখবার জন্য। এমন কি এদেশের পোশাক-আশাক, খানাপিনা, নেশা হুঁকো গাঁজা থেকে শুরু করে, এই দেশেরই মেয়েদের নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলেছে ঘরণীর মর্যাদায়। নিজেদের ভাষাটুকুকে পর্যন্ত ভুলে এদেশেরই ভাষাকে সেদিন রপ্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এবং সব কিছুরই পিছনে ছিল একটি মাত্র ধ্যান—টাকা আর টাকা! হাঁ—কেবল জানতো তারা টাকা রোজগারের ফিকির। কেমন করে দু পয়সা রোজগার করা যায়। সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান দিবারাত্র।

আর তাদের আগে যারা এদেশে এসে পা দিয়েছিল—পর্তুগীজরা, তারাও তো এদেশে এসে এক হাতে কৃপাণ আর এক হাতে ক্রশ কাঠ নিয়ে পা দিয়েছিল। তারপর সোনার এই ভারতবর্ষে অজস্র হীরে মুক্তো মাণিক্যের খোঁজ পেয়ে, এক হাতের ক্রশ কাঠটা ফেলে দিয়ে থলি ভরাট করতে লাগলো এবং তাতে যখন কুলালো না, অন্য হাতের কৃপাণটাও দিলে টান মেরে ফেলে। তারপর দু হাতে

ভরাতে লাগলো কেবল থলি। কাজেই ব্যবসায়ী হিসাবে নবাগত ইংরেজদের চাপে তাদের মরতে বেশি দেরি হয়নি সেদিন। মন্তব্যটা শাহজাদা সুজার মিথ্যা নয় পর্তুগীজদের সম্পর্কে।

তবে ব্যবসায়ী হিসাবে ধীরে ধীরে তারা লুপ্ত হয়ে গেলেও, জাত হিসাবে কিন্তু তারা একেবারে লুপ্ত হলো না এদেশ থেকে। কারণ এদেশের রক্তের সঙ্গে যে তারা তাদের রক্ত মিশিয়ে দিয়েছিল আগেই।

আর তারই ফলে এই দেশের আচার-ব্যবহার খানাপিনা এমন কি ভাষার মধ্যেও তারা ছড়িয়ে গিয়েছিল। সেদিনকার মানুষের ইতিকথায়, ঘরের জানালায়, বসবার কেদারায়, পিরানের বোতামে, তুফানের বজরায়, কামান, পিস্তল, লোকলস্কর এমন কি মেয়েদের ফিরিঙ্গী খোঁপার বাংলাভাষার ব্যবহারিক শব্দে শব্দে পর্যন্ত তারা তখন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে।

তাই সুমন্তনারায়ণের সেদিনকার রোজনামচাকে যদি আজকের সুষ্ঠুভাষায় রূপান্তরিত করা যায় তো বলতে হয়, হেমাঙ্গিনী যেন একটি কামনার অগ্নিশিখা! জ্বলে কিন্তু জ্বালায় না!

মনে পড়ে আজো তার সেই অভিমানের ভঙ্গীটি। মনে পড়ে তার বঙ্কিম-গ্রীবা, ঈষৎ উত্তোলিত যুগ্ম-ভ্রূ, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুট। সুডৌল দেহবল্লীর মনোলভা সুষমা।

কতদিন চমকে উঠেছেন সুমন্তনারায়ণ মুন্নাবাঈজীর চোখেমুখে, ভ্রূতে-ওষ্ঠে ঠিক সেই বহুকালের অতি পরিচিত অভিমানের বিশেষ ভঙ্গীটিই দেখে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছেন।

কবিয়াল নরোত্তম দাস মুন্নাবাঈজীর অভিমানের সেই অপূর্ব ভঙ্গীটির চমৎকার ব্যাখ্যানা করতো।

আহা মরালীর গ্রীবা,
বাঁকা ভুরু কিবা,
স্ফুরিত অধর শোভা—
বাখানি দিতে যে নারি,
কহে নরোত্তম, ও মুখলাবণী
পাইলে বুকেতে
জনম জনম ধরি।

কিন্তু থাক মুন্নাবাঈয়ের কথা। তার কথা সময়ে সে-ই শোনাবে। এখনও শেষ হয়নি গড়ার মুখে কলকাতা শহরের সেদিনকার কথা।

সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার জীর্ণ পাতায় পাতায় লেখা সেই কলকাতা শহরের আদ্যিকালের কাহিনীতেই আবার ফিরে আসা যাক।

ভাগীরথী বহে ধীরে। আর তার তীরভূমিতে এক নতুন ইতিহাসের অঙ্কুর কালপ্রবাহের রসসিঞ্চনে সিঞ্চনে শিহরিত হতে থাকে।

ভাগীরথীর বুকে যেমন জাগে জোয়ার-ভাঁটা, তেমনি তার তীরভূমিতে,

কলকাতা থেকে হুগলী পর্যন্ত দূরদেশাগত লালমুখো, ইয়া লম্বাচওড়া, হুমদো হুমদো যে মানুষগুলো বিচরণ করে, তাদের ঘর বাঁধা, জমিদারি ক্রয়, ব্যবসা ও দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, দ্বেষ-হিংসা ও চক্রান্তের জোয়ার-ভাঁটায় ভরাট হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ নতুন এক পরবর্তী দুইশত বৎসরের ইতিবৃত্ত পাতার পর পাতায়। এবং যে পাতার পর পাতাগুলোতে অদৃশ্য এক কাহিনীকারের কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে লেখা হতে থাকে এক নয়া নীতি, নয়া অগ্রগতি ও এক নয়া যুগের সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এবং যে ইতিহাস শুধু ঐ ভাগীরথীর সংকীর্ণ তীরভূমিরই ইতিকথা নয়, ঐ সংকীর্ণ তীরভূমিকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতবর্ষেরই পরবর্তী এক নতুন অধ্যায়।

নতুন সমাজ, নতুন কৃষ্টি ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির এক নতুন অধ্যায়।

নবাবের ছয়মাসের আলিনগর ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে।

আবার সেই ইংরাজ কোম্পানির কলকাতা শহর।

কথাটা মিথ্যা নয়। সেদিনকার কলকাতা শহর তো ইংরাজদেরই।

জব চার্ণকের স্বপ্নভূমি কলকাতা শহর তো ইংরাজদেরই নিজ হাতে গড়ে তোলা একা নয়া শহর।

দুদিনের জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে এসে হুটপাট করে পড়ে নবাব সব তছনছ করে দিয়ে গিয়েছিল বলেই বা কি এসে গেল, আবার তো তারা তাদের শহর কৌশলে করায়ত্ত করেছে।

একটু একটু করে আবার ভাঙ্গাচোরা বিধ্বস্ত শহর কলকাতার রূপ পাল্টাচ্ছে।

ওদিকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বটে, তবে সে যুদ্ধ যখন হবে তখন হবে।

মুর্শিদাবাদও কিছু আর কলকাতা থেকে এক দিনের পথ নয়।

এদিকে চুপচাপ বরাহনগরের এক মাঠের মধ্যে, চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গল, খানা-ডোবা, তারই মাঝখানে তাঁবুর তলায় বসে বসে কাঁহাতক আর ঝিমানো যায়।

অতএব করিৎকর্মা কর্নেল ক্লাইভ কাউন্সিলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে অকস্মাৎ একদিন তার জাহাজভর্তি গোরা সৈন্য নিয়ে, কামান বন্দুকের গর্জন তুলে হৈ-হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গিয়ে ভাগীরথী তীরবর্তী হুগলী শহরের উপর।

গোটাকতক কামানের জব্বর গোলা ছুঁড়ে হুগলীর দুর্গটাকে করায়ত্ত করে নিতে কর্নেল সাহেবের বেগ পেতে হলো না।

তার পরই মানোয়ারী গোরা সৈন্যদের শুরু হলো বেপরোয়া তাণ্ডব নর্তন ও লুঠতরাজ—হুগলী থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত সর্বত্র ভাগীরথীর তীরভূমিতে।

একটা পাকা বাড়িও আর গোলার ঘায়ে আস্ত রইলো না। সব আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ক্লাইভের মানোয়ারী গোরা চেলা-চামুণ্ডারা ছারখার করে দিল।

দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যেই দুঃসংবাদটা মুর্শিদাবাদে একেবারে

নবাবের কানে গিয়ে পেঁছালো। রুদ্ধ আক্রোশে ভ্রূ দুটি কুঁচকে গেল নবাবের।

অতএব সাজলো বাহিনী, কামান বন্দুক। চলো কলকাতা। এবং হুড়-মুড় করে নবাবের বিরাট বাহিনী একদিন এসে ত্রিবেণী পেঁছে গেল যেন দেখ্ দেখ্ করে।

কর্ণেল সাহেব ঠিক এতটা ভাবেননি। অতএব তিনি ও কোম্পানির চাঁই সব কাউন্সিলাররা দেখলেন বেগতিক। তড়িঘড়ি নবাবের কাছে পাঠানো হলো সন্ধির প্রস্তাব।

কিন্তু দুর্ভাগ্য নবাবের, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, সেধে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলেও এবারের ইংরেজদের দল গতবারের সেই ভেড়ুয়ারা নয়। তাই তাদের ল্যাজে খেলাতে লাগলেন।

হালসীবাগানের ধনকুবের উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে নবাবের ডেরা পড়েছে। সেইখানেই ডাক পড়লো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আগত ইংরাজ দূতের।

কিন্তু নবাবের সাঙ্গোপাঙ্গদের প্ররোচনায় ও আস্ফালনেকোন সুরাহাই হলো না। ইংরাজ দূত ফিরে গেল নিজের ডেরায় ব্যর্থ হয়ে।

পরবর্তী কাহিনী ইতিহাসের পাতাগুলো ওল্টালেই জানা যায়। দু পক্ষে খানিকটা যুদ্ধ হলো এবং শেষ পর্যন্ত সাময়িকভাবে সেবারও নবাবের জিত হলো।

সন্ধি করে ইংরাজদের সঙ্গে আবার নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের পথে নিজের দরবারে ইংরাজদের একজন প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করে গেলেন সেবারে। কিন্তু বুঝলেন না যে, তাঁর ঐ নির্বাচিত প্রতিনিধিই হবে অচিরে তাঁর নবাবী জীবনের পূর্ণচ্ছেদের কলকাঠি।

॥ ২ ॥

মাঘের শেষের দিক সেটা।

কথায় বলে মাঘের শীত। সন্ধ্যার একটু পরেই শীতের দাপটে শহর নিঝুম হয়ে আসে।

ঘরে বাইরে এখানে ওখানে আগুন জেবলে চারপাশে তারা গোল হয়ে বসে সব আর চলে খোশগল্প।

হঠাৎ নবাবের সঙ্গে ক্লাইভ কোম্পানির যুদ্ধ বাধায় একটা হৈ-হট্টগোল পড়ে গিয়েছিল যেমন, নবাব তাঁর দলবল নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আবার সব উপর-উপর মোটামুটি শান্ত হয়ে এল। তবে তখনকার দিনে এ দেশীয় শহরবাসী বলতে একদল প্রতিপত্তিশালী মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ও ধনিক সম্প্রদায়, তাদের ঘরে ঘরে একটা চাপা গুঞ্জন কিন্তু কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। কারণ কোম্পানি ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহেবসুবা আমলা কর্মচারীরা ব্যতীত শহরের চিহ্নিত বাসিন্দা বলতে মুষ্টিমেয় একমাত্র তো তারাই তখন। আর দেশীজনেরা সব তো নেহাৎই নগণ্য, অপরিচিত। এবং পরবর্তীকালের সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব তো তখনও ঘটেইনি।

কাজেই যুদ্ধ প্রভৃতি হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত যদি হতে হয় তো সে সময় তারাই। গড়ার মুখে নয়া কলকাতা শহরের রাষ্ট্র-চালনার ব্যাপারে সে সময় কোম্পানির সঙ্গে এদেশীয় লোকেদের সাক্ষাৎ যেটুকু যোগাযোগ ছিল, একমাত্র সেটা ঐ মুষ্টিমেয়দের সঙ্গেই। কারণ তারাই তাদের ধন-সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির জোরে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছুটা যুক্ত ছিল। ঐ সময়ে তাদেরই ঘরে ঘরে তাই আলোচনা আর গুঞ্জন।

অন্যান্য জনসাধারণ বলতে যারা, তাদের মনে সাময়িক খানিকটা উত্তেজনা ও ভীতির পর আবার একটু একটু করে ক্রমশ সেটা ঝিমিয়ে আসছিল।

শহরের মধ্যে প্রতিপত্তিসম্পন্ন ঐ মুষ্টিমেয়দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নবকৃষ্ণ দেব ও গোবিন্দ মিত্তিরমশাই। তাঁদের বাইরের ঘরে ঢালা ফরাসের উপর চারিদিকে সব গোল হয়ে বসে সন্ধ্যার পর আলাপ-আলোচনা চলে।

সেদিন সন্ধ্যার পর মিত্তিরমশাইয়ের বাইরের ঘরে যখন অনুরূপ আলাপ-আলোচনা চলছে, সুমন্তনারায়ণও একপাশে এসে বসেছেন।

ফরসির জরি মোড়া নলটা হাতে ধরে, সুগন্ধি তামুক সেবন করতে করতে ঐ আলাপের মধ্যেই একসময় মিত্তিরমশাই বললেন, যেতে দাও হে রাজেন্দ্র, ওসব কথায় আর কাজ কি! যুদ্ধ আবার বাধলে কেউ বাঁচবে কেউ মরবে। নবাব জিতলেও আমাদের উৎখাত করবে না আবার কোম্পানির সাহেবরা জিতলেও আমাদের না হলে এ দেশে তাদের ব্যবসা চলবে না, কি বলেন ভট্চাজ মশাই!

নরহরি ভট্টাচার্য মাথা হেলিয়ে চক্ষু মুদে মৃদু একটু হেসে বললেন, তা বৈকি। এখনও সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হচ্ছে না! তেমন বুঝি তো ব্রাহ্মণেরা তেজবহ্নি দিয়ে সব ছারখার করে দেবো না!

হাঁ হাঁ—এখন ওসব কথা থাক। তার চাইতে এদিকে যে দোল এসে গেল, তার কথা ভাবুন সবাই।

একজন তথাপি বলে ওঠে মাঝখান থেকে, এবারে কি আর দোল উৎসব জমবে মিত্তিরমশাই?

কেন, জমবে না কেন শুনি? বলেই হাঁক দিলেন হুঁকাবরদারকে, ওরে তামাকটা পাল্টে দিয়ে যা।

দোরগোড়াতেই তটস্থ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল হুঁকাবরদার। তাড়াতাড়ি এসে ফরসির মাথা থেকে কল্কেটা তুলে নিয়ে গেল।

মিত্তিরমশাই আবার মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন, জমবে হে জমবে। এবারে খুব বড় মিছিল বের করতে হবে।

নবকৃষ্ণ দেব বলে উঠলেন একধার থেকে, জমবে আবার না! আজই তো বিকেলের দিকে শ্যামরায়ের মন্দিরে গিয়েছিলাম—দেখলাম ইতিমধ্যেই দোলমণ্ড তৈরী হতে শুরু হয়েছে।

সত্যি! অন্য একজন শুধায়।

প্রেত্যয় না যায় দেখে এসো না গিয়ে স্বচক্ষে। অন্যান্যবারের মত এবারেও

উত্তরে-দক্ষিণে দু-দুটো মঞ্চ তৈরী হচ্ছে। এবারেও দেখো দীঘির জল আবীরে আর কুমকুমে লাল হয়ে উঠবে।

দোল-উৎসবের কথা মনে পড়ায় সুমন্তনারায়ণ যেন কেমন বিমনা হয়ে যান।

গতবছর ঐদিনে সুমন্তনারায়ণ ছিলেন না, কাঠ-চেরাইয়ের ব্যাপারে সুন্দরবনের দিকে গিয়েছিলেন। যাবার আগে বার বার রাধারাণী মাথার দিব্যি দিয়েছিল, দোলপূর্ণিমার আগেই যেন তিনি ফিরে আসেন।

কিন্তু ঠিক সময়মত পৌঁছোতে পারেননি, ঘাটে এসে নৌকা ভিড়েছিল সেই প্রায় মধ্যরাত্রে।

দোলপূর্ণিমার রাত্রেই রাধারাণী জন্মেছিল বলে সার্বভোম পৌত্রীর নাম দিয়েছিলেন রাধারাণী।

রাধারাণী বিবাহের পর একদিন কথায় কথায় স্বামীকে সেকথা বলতে বলতে সোহাগে আব্দার জানিয়েছিল, ঐ দিনটা তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থেকো না।

সুমন্তনারায়ণ প্রত্যুত্তরে স্ত্রীর নরম ডালিমের মতই রক্তাভ গালটি টিপে দিয়ে বলেছিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

পর পর দুই বৎসর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পালনও করেছিলেন। রাখতে পারেননি তৃতীয় বৎসর। মুখে অবিশ্যি সুমন্তনারায়ণ বলেছিলেন, দোলপূর্ণিমার দিনটার কথা বরাবরই তাঁর মনে ছিল, ফিরতি পথে ভাঁটির মুখে চড়ায় নৌকা আটকে যেতেই বিভ্রাট হয়েছিল। নচেৎ সময়মত ঠিক তিনি এসে ভোর নাগাদই পৌঁছতেন।

কিন্তু আসলে সত্যি সত্যিই প্রতিশ্রুতির ওই বিশেষ দিনটির কথা একেবারেই ভুলে বসেছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

একেবারেই মনে ছিল না কথাটা। সন্ধ্যার দিকে চলমান নৌকার গলুইয়ে বসে আকাশে বিরাট সোনার থালার মত চাঁদটা উঠতে দেখে যখন মাঝিকে শুধিয়েছিলেন, হ্যাঁ মাঝি, আজ বুঝি পূর্ণিমা ?

মাঝি জবাব দিয়েছিল, আজ্ঞে কর্তা। দোলপূর্ণিমা—আজ যে দোল।

দোলপূর্ণিমা ! দোল ! সর্বনাশ ! সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতির কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল সুমন্তনারায়ণের।

কিন্তু এখনও পথের অনেকটা বাকি, কাঠ-বোঝাই নৌকা এবং সর্বাপেক্ষা মুশকিল বিপরীত বায়ু। শহরের ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে তাই মধ্যরাত্রি হয়ে গিয়েছিল।

মনে মনে অবিশ্যি সুমন্তনারায়ণের আশা ছিল, রাধারাণীর অভিমানটা ভাঙতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁকে যাকে বলে সত্যিকারের নাজেহালই হতে হয়েছিল।

'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলে শেষ পর্যন্ত পায়ে ধরতে হয়েছিল সুমন্ত-

নারায়ণকে এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কখনওঐ দিনটিতে তিনি রাধারাণীর কাছ থেকে দূরে থাকবেন না।

আবার এক বৎসর পরে সেই দোলপূর্ণিমা আগত। আবীর কুমকুমে এবারে রাধারাণীর মনের সাধ তিনি মিটিয়ে দেবেন।

মাত্র একদিনেই দোলের উৎসবটা এখানে শেষ হলে কি হয়, ঐ একটি দিনেই শহর যেন একেবারে রঙিন আনন্দে মেতে ওঠে। দোলের পিচকিরির কাছে ছোট-বড়, মান্য-গণ্য, নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। রঙ দিলেই হলো। আবীর কুম্‌কুম্‌ মাখলেই হলো।

দলে দলে সব শহর জুড়ে মিছিল করে বের হয়। সকলের কণ্ঠেই গান।

এবারে শুধু খেলাই নয়, মনে মনে আরো স্থির করে রেখেছেন সুমন্ত-নারায়ণ, শ্যামরায়ের মন্দিরে দোলের উৎসব দেখতেও রাধারাণীকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

উত্তর দক্ষিণ দুদিকে দুটো দোল-মণ্ড। দক্ষিণে শ্যামরায়, উত্তরে রাধিকা।

রাখাল ছেলেরা, গ্রামের চাষাভুষাদের ছেলেরা এক পক্ষে সাজে শ্যাম অন্য পক্ষে সাজে রাধা। তারপর আবীর কুমকুমের ছড়াছড়ি, মাখামাখি।

মিত্তিরমশাইয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে, আপন মনেই ভাবতে ভাবতে সারাটা পথ অতিক্রম করে নিজগৃহে অন্দরে প্রবেশের মুখে বাধা পেলেন সুমন্তনারায়ণ।

রায়মশাই!

কে! এ কি সুরো—

বারান্দার অন্ধকারে একপাশে ছায়ার মতো সুরধুনী দাঁড়িয়েছিল। সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলো।

কি ব্যাপার?

ওদিকে তোমার সেই ফিরিঙ্গী মেয়েটার যে খুব জ্বর। গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য।

সে কি, কখন থেকে তার আবার জ্বর হলো!

বোধ হয় দুপুর থেকেই। বিকেলে খাবার নিয়ে গিয়ে দেখি আগেকার সব যেমনটি তেমন পড়ে আছে। মুশকিল, ও না বোঝে আমার ভাষা, না বুঝি আমি ওর ভাষা। ডেকে সাড়া না পেয়ে এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিতে দেখলাম, জ্বরে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে।

চল তো দেখি—

দুজনে বহির্মহলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালগিরি জ্বলছিল। সেই দেওয়ালগিরির আলোয় ঘরের মধ্যে তাকাতেই দেখতে পেলেন সুমন্তনারায়ণ পালঙ্কের উপরে শয্যায় চোখ বুজে পড়ে আছে ক্যাথারিন।

ধীরপদে এগিয়ে পালঙ্কের সামনে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ। ক্ষণকাল

শায়িত মুদ্রিত-চক্ষু নিঃসাড় ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে, কি ভেবে এগিয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে দেওয়ালগিরি নামিয়ে আবার পালঙেকর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সমস্ত মুখখানি যেন একেবারে রক্ত-আবীরের মতই লাল। বক্ষের বাস শিথিল হয়ে গিয়েছে। অসহায় রোদ-ঝলসানো একগুচ্ছ ফুলের মতই যেন ক্যাথারিন শয্যার উপর পড়ে আছে।

ক্যাথারিন! মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন সুমন্তনারায়ণ।

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

খানিকটা ঠাণ্ডা জল কোন পাত্রে করে নিয়ে এস তো সুরো—

সুরধুনী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দেওয়ালগিরিটা আবার যথাস্থানে রেখে এসে শয্যার আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ, মুহূর্তের জন্য বোধ হয় দ্বিধা জাগে।

তারপরই হাত দিয়ে নিঃসাড় ক্যাথারিনের রোগতপ্ত কপালটা স্পর্শ করতেই ক্যাথারিন চোখ মেলে তাকাল।

হু? রিচার্ড—ডিয়ার, হ্যাভ্ ইউ কাম ব্যাক্?

ক্যাথারিন!

নো, নো—ডোণ্ট্ টাচ্ মি, ডোণ্ট্ টাচ্ মি—তীক্ষ্ন আর্তকণ্ঠে পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলো ক্যাথারিন এবং নিজেকে সুমন্তনারায়ণের স্পর্শ থেকে সরিয়ে নিল।

সুমন্ত বুঝতে পারেন জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে ক্যাথারিন।

ঐ সময় সুরধুনী একটা কাঁসার পাত্রে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করলো।

তারপর পনেরটা দিন ধরে ক্যাথারিনের জ্বর-বিকাবের সঙ্গে সুরধুনী আর সুমন্তনারায়ণ দিবারাত্র যুদ্ধ ক'রে চললেন।

রাধারাণী ভুলেও কখনও বহির্মহলে ঐ কদিন পা দেয়নি। রুদ্ধ আক্রোশে সে কেবলই ফুলেছে। কোথাকার কে এক বিধর্মী নারী, তাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবার যে কি অর্থ হতে পারে সে ভেবেই পায় না।

দিনের বেলাটা বেশির ভাগ সময় ক্যাথারিনের রোগশয্যার পাশে থাকতো সুরধুনীই। কাজকর্ম শেষে সন্ধ্যার পর থেকে সারাটা রাত পালা করে শুশ্রূষা করতো সুরধুনী ও সুমন্তনারায়ণ।

প্রত্যূষে রোগিণীর ঘর থেকে বের হয়ে সুমন্তনারায়ণ স্নান-সমাপনান্তে পূজা-আহ্নিক সেরে একেবারে শয়নকক্ষে যেতেন।

স্ত্রী রাধারাণীর আক্রোশভরা থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সুমন্তনারায়ণ ব্যাপারটা মনে মনে বুঝতে পারলেও যেন নিরুপায় ছিলেন এবং রাধারাণীও মনে তার যে ঝড়ই বয়ে যাক, মুখে কিছুই প্রকাশ করতো না। আক্রোশের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা অভিমান যেন তার কণ্ঠরোধ করে রেখে দিয়েছিল।

একে মুর্শিদাবাদ থেকে আসবার সময় বিধবা ধর্মভ্রষ্টা সুরধুনীকে তাদের

সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে আসায় রাধারাণীর স্বামীর প্রতি বিরক্তির অন্ত ছিল না, তার উপরে কোথা থেকে নতুন এক আপদ এসে জুটলো ঐ ক্রেস্তান মেয়েটা!

হিন্দুর ঘরে এই যে সব অধর্ম আচরণ এ শুধু অন্যায়ই নয়, পাপ—অথচ সব জেনেশুনেও রাধারাণী এই পাপ থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় খুঁজে পায় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন মনের ঐ আগুনকে আর চাপা দিয়ে রাখতে না পেরে রাধারাণী স্বামীর পথ আগলে দাঁড়ালো।

সন্ধ্যা-রাত্রির পর সেদিন সুমন্তনারায়ণ বহির্মহলে ক্যাথারিনের ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আপন কক্ষ থেকে বেরুতে যাবেন, রাধারাণী সহসা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় যাচ্ছ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকালেন সুমন্তনারায়ণ স্ত্রীর মুখের দিকে।

গত বারো-তেরো দিন রাধারাণী তাঁর সঙ্গে একটি কথা পর্যন্ত বলেনি এবং তাতে করে সুমন্তনারায়ণ স্ত্রীর প্রতি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

একজন রোগগ্রস্তার সেবা করছেন, তাতে তো কোন অন্যায় করেননি তিনি। তবে রাধারাণী ব্যাপারটাকে অন্য চক্ষেই বা দেখবে কেন!

মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিলেন সুমন্তনারায়ণ, কেন, জান না কোথায় যাচ্ছি?

জানি বলেই জিজ্ঞাসা করেছি। ইহকালের ভয় তোমার কোনদিনই নেই, কিন্তু পরকালের ভয়ও কি তোমার নেই?

তীক্ষ্ন কণ্ঠে সুমন্তনারায়ণ এবারে ডাকলেন, রাধারাণী!

ছিঃ ছিঃ, একটা ক্রেস্তান বিধর্মী মাগীকে ঘরে এনে—

কি বলছো রাধারাণী, মানুষের চাইতেও কি তার ধর্ম বড়!

নিশ্চয়ই। তার পরেই একটু থেমে আবার রাধারাণী বলে, এসব চলবে না।

কি চলবে না, শুনি?

কেন, এত বড় শহরে কি আর জায়গা নেই যে আমারই ঘরে ওকে স্থান দিতে হবে? শহরে তো অনেক ওর জাতভাইরা আছে—

আছে কিনা জানি না, তবে এও তুমি জেনে রেখো রাধা, যতদিন ও আমার আশ্রয়ে থাকবে, আমার ঘরেই ও থাকবে—

বলে আর দ্বিরুক্তি না করে সুমন্তনারায়ণ দরজাপথে বের হয়ে বহির্মহলের দিকে অগ্রসর হলেন।

জানি, জানি—কেন এত দরদ বুঝি না—

চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে বাঘের মতই গর্জন করে উঠলেন সুমন্তনারায়ণ, রাধারাণী—এটা আমার বাড়ি, আমার ঘর। আমার খুশিমতই এখানে ব্যবস্থা হবে। যার না পোষাবে, বাকিটা আর শেষ করেননি সুমন্তনারায়ণ।

কাষ্ঠ-পাদুকার খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে বারান্দার অপর প্রান্তে অন্ধকারে

মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

দুদিন থেকেই ক্যাথারিনের জ্বরের উপশম হয়েছিল বটে তবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নড়বার-চড়বারও যেন শক্তি নেই।

ভাল করে জ্ঞান হবার পর নিজের রোগশয্যার পাশে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার রোগ-ক্লিষ্ট মুখের দিকে সুমন্তনারায়ণকে চেয়ে থাকতে দেখে বুদ্ধিমতী ক্যাথারিন বুঝেছিল, ঐ তার সম্মুখে উপবিষ্ট বিরাট পুরুষটি ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন ধর্মের হলেও, ওরই দয়ায় সে দ্বিতীয়বার প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠেছে।

জগতের সকল পুরুষই তার স্বামী রিচার্ড নয়।

এবং ক্ষণিক সেই দুর্বল মুহূর্তেই বিদেশিনী ক্যাথারিন সুমন্তনারায়ণকে বুঝি ভালবেসেছিল।

পরবর্তীকালে ক্যাথারিনকে যখন সুমন্তনারায়ণ বলেছেন, নিজের ধর্ম, আত্মীয়স্বজন সব কিছু ছেড়ে আমার ঘরেই থেকে গেলে ক্যাথারিন!

মৃদু সকৌতুক হাসি হেসে ক্যাথারিন জবাব দিয়েছে, তাই তো গেলাম।

কিন্তু কেন?

জান না? বুঝতে পারনি আজও?

বুঝতে পারিনি বললে মিথ্যাই বলা হবে। তবু যেন বিস্ময় লাগে।

পরমুহূর্তেই শঙ্খধবল ভুজবল্লরী দিয়ে ক্যাথারিন সুমন্তনারায়ণের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে তাঁর বিশাল বক্ষে মুখ রেখে বলেছে, কেন বল তো, ইংরাজ মেয়ে কি একজন ভিনদেশীকে ভালবাসতে পারে না!

এরপর আর সুমন্তনারায়ণের কণ্ঠে জবাব আসেনি।

সুমন্তনারায়ণ স্ত্রীর মুখের উপর কতকগুলো কঠোর জবাব দিয়ে বহির্মহলে এসে ক্যাথারিনের রোগ-শয্যার পাশে দাঁড়াতেই ক্যাথারিন চোখ মেলে তাকালো।

সুমন্তনারায়ণ জানতেন না যে ঠিক ঐ মুহূর্তে সুমন্তনারায়ণের পদ-শব্দের প্রতীক্ষাতেই চোখ বুজে শয্যার উপর পড়েছিল ক্যাথারিন।

ধীরে ধীরে সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের শয্যার পাশটিতে বসতেই ক্যাথারিন তার রোগশীর্ণ শঙ্খধবল একখানি হাত বাড়িয়ে সুমন্তনারায়ণের বলিষ্ঠ মাংসবহুল রোমশ হাতখানি চেপে ধরলো।

সুমন্তনারায়ণ তাকালেন ক্যাথারিনের মুখের দিকে।

ক্যাথারিন সুমন্তর ধৃত হাতখানি তার কোমল শীর্ণ বক্ষের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরলো।

ক্যাথারিনের মাথাটা উপাধান থেকে গড়িয়ে একপাশে পড়েছে। আঙ্গুরের মতই গুচ্ছ গুচ্ছ রুক্ষ স্বর্ণকেশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বর্ণকেশের মধ্যে ক্যাথারিনের মুখখানি ঢাকা পড়েছে।

ক্যাথারিন!

কোন জবাব নেই ক্যাথারিনের।

এবারে সুমন্তনারায়ণ দু হাতে ক্যাথারিনের মুখটা তুলে ধরবার চেষ্টা করতেই সহসা ক্যাথারিন উঠে বসে তার দুই শঙ্খধবল মৃণালসম ভুজবল্লরী দিয়ে সুমন্তনারায়ণের কণ্ঠ বেষ্টন করে, তাঁর মুখে-চোখে পাগলের মতই চুম্বন করতে লাগলো।

প্রথমটায় বিস্ময়ে, ঘটনার আকস্মিকতায় সুমন্তনারায়ণ যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

তার পরই সম্বিৎ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তনারায়ণ তাঁর শালপ্রাংশুর মত দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে নিজ বক্ষের মধ্যে টেনে নিলেন সেই বিদেশিনী নারীকে।

ঘরের মধ্যে সাক্ষী রইলো শুধু দেওয়ালগিরির স্নিগ্ধ ভীরু শিখাটি।

সুমন্তনারায়ণের বলিষ্ঠ বক্ষ-সংলগ্ন ভীরু কপোতীর বক্ষে কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে যেন দেওয়ালগিরির ভীরু শিখাটি থিরথির করে কাঁপতে লাগলো।

ক্যাথারিন!

ডার্লিং!

॥ ৩ ॥

৯ই ফেব্রুয়ারী প্রায় বলতে গেলে ইংরাজ পক্ষের সমস্ত দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েই নবাব যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে সীলমোহর দিয়ে দিলেন, তারই অন্যতম চুক্তি অনুসারে ইংরাজদের প্রতিনিধি হয়ে নবাব-দরবারে গিয়ে জাঁকিয়ে বসলো উইলিয়ম ওয়াট্‌স্ সাহেব।

দেখতে নাদুসনুদুস, হাবলা-গোবলা চেহারা ওয়াট্‌স্‌কে দেখে বয়সে ছেলেমানুষ অপরিণতবুদ্ধি নবাব ভেবেছিলেন বুঝি নেহাতই গোবেচারী, ভালমানুষ। তাই ওই গোবেচারী ওয়াট্‌স্ সাহেব যখন দিনের পর দিন রাজধানী ও নবাব-দরবারের যাবতীয় খুঁটিনাটি সংবাদ পত্র মারফৎ কলকাতায় লিখে পাঠাচ্ছিলেন, নবাব তখনও নিশ্চিন্তে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন।

আর চতুর ইংরেজরাও সেই সুযোগে নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছিল।

ধূর্ত ক্লাইভ চপলমতি অপরিণতবয়স্ক নবাবকে বেশ ভাল করেই চিনে নিয়েছিলেন।

তাই সুযোগ বুঝে আর কালবিলম্ব না করে বরানগর থেকে ডেরা তুলে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে মার্চ মাসের প্রথম দিকেই ক্লাইভ হুগলীর তদানীন্তন ফৌজদার নন্দকুমারের গোপন প্রতিশ্রুতির সমর্থনে একেবারে গঙ্গা পার হয়ে সোজা চন্দননগরের পাশেই পেরিটির বাগানে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন।

চন্দননগরের গর্ভনর তখন রেনো সাহেব। তাঁকে কেল্লা ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেকথায় তিনি কান না দেওয়ায় ক্লাইভ চন্দননগর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক ঘিরে ফেললেন।

ওদিকে নবাবের আদেশমত দুর্লভরাম, মানিকচাঁদ, মোহনলাল প্রস্তুত হয়ে রইলো।

চন্দননগরে একটা ছেলেখেলা যুদ্ধ হল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নন্দকুমারের এক চালেই ইংরাজদের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে মার্চ মাসের শেষাশেষি এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সনের যুদ্ধজাহাজগুলো চন্দননগরের উপরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাডমিরাল পোলক্‌ও ওয়াট্‌সনের পিছু নিলেন।

২৩শে মার্চ ক্লাইভের রণকৌশলের মুখে টিঁকতে না পেরে চন্দননগরের গভর্নর রেনো শান্তির পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

চন্দননগরের যুদ্ধ শেষ হলো।

ভাগীরথীর তীরভূমিতে সেদিন যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুন নিভতে আঠারোশো শতাব্দীর বাকী সময়টাতেও কুলায়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশটা বছরও পার হয়ে গিয়েছিল। আর আগুনে পোড়া সেই ভাগীরথীর তটেই বাঙ্গালার মাটিতে সেদিন যে অঙ্কুরোদ্‌গমের দেখা মিলল, তার বীজটি কিন্তু ঝরে পড়েছিল অনেক অনেক দিন আগে ১৪৯৮ সালের ২০শে মে, পর্তুগীজ সেনাপতি ভাস্কো-ডা-গামা যেদিন পদার্পণ করেছিলেন বাণিজ্যের আশায় কালিকটের মাটিতে।

হায় হতভাগ্য অপরিণামদর্শী কালিকট-অধীশ্বর জামোরিন !

কিন্তু সত্যিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিল পোপ।

জাহাজ-ভর্তি রত্ন বোঝাই করে ভারতবর্ষ থেকে ভাস্কো-ডা-গামা যেদিন আবার লিসবনে ফিরে গিয়েছিলেন, পোপ নাকি বলেছিলেন, ওহে পর্তুগাল অধীশ্বর, এতদিন তুমি ছিলে ইথিওপিয়া আরব আর পারস্যের রাজা, আজ থেকে তামাম ভারতবর্ষেরও মালিক হলে তুমি।

ভারতবর্ষ ! যেখানে শুধু বাণিজ্য আর বাণিজ্য।

লক্ষ্মী চির অচঞ্চলা। যেখানে পণ্য কিনেও লাভ, বেচেও লাভ। সোনার দেশ ভারতবর্ষ। রত্নপ্রসবিনী ভারত। মাটি তার ধুলো নয় সোনা। এবং এই সোনার দেশ ভারতবর্ষে বসে বাণিজ্য করতে হলে অনিশ্চয়তার মধ্যে সর্বক্ষণ ঝুঁকি নিয়ে বাণিজ্য করা চলবে না। চাই নিশ্চয়তা—যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে, সেই মাটিটা শক্ত হওয়া দরকার।

এই সত্যটিই বুঝেছিল ক্লাইভ, বোধ হয় সর্বপ্রথম ইংরাজদের মধ্যে।

অতএব যাক শত্রু পরে পরে।

কূটচক্রী ক্লাইভ বুঝেছিল নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি দেশের বহু গণ্যমান্য প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই সন্তুষ্ট নয় এবং বিরাট একটা ষড়যন্ত্র চলেছে গোপনে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে, ফলে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে ইংরাজদের উপরে।

মূলোচ্ছেদ করবার এত বড় একটা শাণিত অস্ত্র হাতের কাছেই যখন রয়েছে, কালাবিলম্ব না করে ক্লাইভ সেই অস্ত্রটিই হাতে তুলে নিল।

সুমন্তনারায়ণও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি তাঁর রোজনামচার পৃষ্ঠায় লিখে গিয়েছেন, আসলে সে অস্ত্রটি হচ্ছে হিন্দুদেরই ষড়যন্ত্র।

বাঙলা দেশের এমন কোন জমিদার ছিল না সেদিন যারা নবাব সিরাজের হাতে নাকানি-চোবানি খাননি।

আর মহাজনদের মাথা জগৎশেঠ—তাঁর তো কথাই নেই, অনেকভাবে অপমানিত হয়েছিলেন।

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও হিন্দু সরকারী কর্মচারীদের পাণ্ডা রায়দুর্লভ আর নন্দকুমার সকলে এসে একে একে ভিড়লো ইংরাজদের পাশে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের আসরে।

গোপন বৈঠকে মসনদের ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হয়ে গেল এবং নবাবী প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে সিপাহসালারও এসে যোগ দিল ঐ ষড়যন্ত্র-চক্রে।

তারপর যুদ্ধ। অবশ্য সেটা একটা ছেলেখেলা।

দীর্ঘদিনের রসসিঞ্চনে অঙ্কুরে তখন পল্লবোদ্গম দেখা দিয়েছে।

ইতিহাসের পাতা উল্টোলে তো জানা যায়ই, সুমন্তনারায়ণের রোজ-নামচাতেও ছিল ঃ অগ্রদ্বীপের কাছে ভাগীরথী পার হয়ে ক্লাইভ তার দলবল নিয়ে উঠেছিল পলাশীর আমবাগানে, লক্ষবাগে এবং সেইখানেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

সকাল আটটায় শুরু এবং বেলা পাঁচটায় ভাগীরথীর বক্ষে যখন সূর্য ডুবু ডুবু, ব্যাটল অব পলাশী খতম!

এবং বিজয়গর্বে তার পরদিন সন্ধ্যায় যখন ব্যারন অফ্ পলাশী রাজধানী মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রবেশ করেন দলবলসহ সিপাহসালারের পাশে পাশে, অনতিদূরে চলেছে নগরবাসীদের ঢপ গানের আসর।

তাদেরই পাশ দিয়ে সে রাত্রে যে পরবর্তী দুই শত বৎসরের পরাধীনতা ও লাঞ্ছনা, অপমান ও গঞ্জনা বুটজুতোর মচ্মচ্ শব্দ তুলে তাদের বুকের উপরে এসে পা তুলে দিল সে কেউ জানলো না।

সুমন্তনারায়ণ তখন কলকাতাতেই। কলকাতায় বসে বসেই একদিন শুনলেন তিনি, সিরাজের নবাবী শেষ হয়েছে, মসনদে বসেছেন মীরজাফর।

সিপাহসালার!

নিশ্চিত হলো কলকাতাবাসীরা। ইংরাজ তাহলে কেউকেটা নয়!

এদেশীয় লোকেরা যারা বছরখানেক আগে সব তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আবার তারা একে একে এসে ভিড়তে লাগলো কলকাতা শহরে।

নতুন উদ্যমে সুমন্তনারায়ণও তার ব্যবসা ও ধন-সম্পদকে বাড়িয়ে চলতে লাগলেন।

ক্রমশ এবারে কলকাতা শহরের বুকে নতুন এক হিন্দুসমাজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা দিতে লাগলো।

॥ ৪ ॥

কলকাতা শহরের সর্বেসর্বা এখন ইংরাজরাই। তারাই শহরের যাবতীয় ব্যাপারে হর্তাকর্তাবিধাতা ও মাথার উপর এখন আর তাদের সর্বদা উঁচিয়ে নেই খামখেয়ালী নবাবের খড়্গ।

বুদ্ধিমান তারা, দিয়ে-থুয়ে নিতে পারলে যে বেশি পাওয়া যায় এ নীতিটা তারা জানতো।

তাই ক্রমশ শহরে সর্বব্যাপারে এক নতুন রূপ নিতে লাগলো। এবং সেই নতুন রূপ-পরিগ্রহের মধ্যে সুমন্তনারায়ণের ভাগ্যের রূপটাও একটু একটু করে পাল্টাতে শুরু করেছে তখন।

কথায় বলে পুরুষস্য ভাগ্যং। দেখতে দেখতে ব্যবসায় প্রচুর উন্নতি করে বছরতিনেকের মধ্যেই সুমন্তনারায়ণ শহরের অন্যতম গণ্যমান্য, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী এক নাগরিক হয়ে উঠলেন। মিত্তিরমশাইকে ধরে নিজের বসতবাটির আশেপাশে আরো দশ বারো কাঠা জায়গা নিয়ে ধীরে ধীরে প্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা ফেঁদে বসলেন। ফটক, বাগান, দীঘি কিছুই বাদ থাকলো না। বাড়ির মধ্যে তিন-তিনটে মহল। পাইক বরকন্দাজ, দেউড়িতে দারোয়ান, সে এক বিরাট এলাহি কাণ্ড।

গৃহে গোপীবল্লভ তো ছিলই, এবারে জগজ্জননী বিশ্বরূপার প্রতিষ্ঠার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। অমাবস্যায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করবেন, লোক পাঠালেন ভাটপাড়ায় কুলগুরু করালীশঙ্করকে আনবার জন্য। কুলগুরু করালীশঙ্করকে দিয়েই মায়ের প্রতিষ্ঠা-পূজা করবেন।

ইতিমধ্যে রাধারাণীর পুত্র কন্দর্পনারায়ণের পরও আরো দুটি কন্যাসন্তান জন্মেছে। কঙ্কাবতী ও রূপবতী নাম রাখা হয়েছে তাদের।

রাধারাণীকে দেখলে এখন আর চেনবারও উপায় নেই। তিনটি সন্তানের মা হয়ে দেহে মেদবাহুল্য দেখা দিয়েছে। রীতিমত গিন্নীবান্নী চেহারা। রাধারাণী তার সংসার নিয়েই ব্যস্ত সর্বদা।

পরিধানে লাল কস্তাপাড় শাড়ী, ভারী নিতম্বে শোভা পায় গোট, গা-ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার—কঙ্কণ, হাঙরমুখো শাঁখা, চুড়ি ও লোহা হাতে, গলায় সাতনরী হার। নাকে নথ। মাথায় সিন্দুর।

আর রূপ! ভরা যৌবনে রূপ যেন একেবারে দুকূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে তখন রাধারাণীর।

প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে গোপীবল্লভের পূজা করে রাধারাণী রাত্রে শয়নের পূর্ব পর্যন্ত সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। পুত্র ও কন্যাদের প্রতি নজর দেবারও তার সময় নেই। এমন কি স্বামীর ব্যাপারেও যেন রাধারাণী কিছুটা উদাসীন।

পুত্র কন্যা ও স্বামীর যাবতীয় দায়িত্ব তাই এসে পড়েছিল আপনা হতেই যেন সুরধুনীর উপর।

সুরধুনী নিজেকে সংসার থেকে গুটিয়ে নিয়ে নিযুক্ত করেছিল যেন

সুমন্তনারায়ণ ও তাঁর সন্তানদের দেখাশোনা ও পরিচর্যার ব্যাপারেই সর্বতোভাবে।

রাধারাণীর সন্তানরাও নিজেদের মাকে ডাকত বৌ বলে সুরধুনীর দেখাদেখি, আর সুরধুনীকে ডাকত মা বলে।

আর সুমন্তনারায়ণ! সমস্ত দিনমান তাঁর ব্যবসা আর ব্যবসা। ইতিমধ্যে কিছু টাকা হাতে জমায় সে টাকা শহরের অন্যান্য মহাজনদের মত চড়া সুদে ধার দিতে শুরু করেছিলেন। সেই সব নিয়েও সময় কেটে যেতো অনেকটা।

সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সুমন্তনারায়ণ বড়বাজারের দোকানেই থাকতেন। লোকে লোকারণ্য ছিল তখন বড়বাজার। হরেকরকম দোকানপাট, ছোট বড় মাঝারি কত রকমের মালগুদাম ঘর।

আর শুধু কি এ-দেশীয় ও ইংরাজ ব্যবসায়ীরাই সেখানে জড়ো হতো? দেশ বিদেশের শেঠ সওদাগরেরাও এসে তো ঐ বড়বাজারেই জমায়েত হতো সে সময়।

আরবী, পারসী, মোগল, হাবসী, চীন, কাফ্রী, মালয়ী—এদেশ-ওদেশ বিভিন্ন প্রদেশের সব লোকেরা এসে সে সময় বড়বাজারে ভিড় করতো।

এক কথায় বড়বাজার তো তখন একেবারে যাকে বলে গুলজার।

ঐসময়কার সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার জীর্ণ পাতাগুলো ওল্টাতেই দেখা যায়, শ্বেতাঙ্গিনী ক্যাথারিনকে ছাড়তে পারেননি সুমন্তনারায়ণ। ক্যাথারিনকে ছাড়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ মাত্র মাস দুই তাঁর বহির্মহলে থাকলেও ক্যাথারিন সুমন্তনারায়ণের মনের অনেকখানিই অধিকার করে নিয়েছিল।

এমনই বুঝি হয়। মানুষের মনের—বিশেষ করে নারীমনের অন্ধি-সন্ধিগুলো এমন বিচিত্র বাঁকাচোরা যে সেপথে আনাগোনাও বিচিত্র।

কখন যে কার সে-পথে পায়ের চিহ্ন পড়ে, আবার কখন কার মুছে যায়—নর তো দূরের কথা, দেবতারও বোধগম্যের বাইরে।

যাই হোক, এদিকে স্বগৃহে আর ক্যাথারিনকে রাখা সম্ভবপরও ছিল না. যেহেতু বহির্মহল হলেও সেই একই গৃহের অন্দরে রাধারাণী ছিল। এবং ক্যাথারিনের প্রতি রাধারাণী যখন বিশেষ প্রীত নয় সে অবস্থায় নিত্য মন-কষাকষির ও অসন্তোষের ধোঁয়াটা একেবারে চাপা দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। আর সেকালের ধর্মের অনুশাসনটাও ছিল তো। সেই কারণেই অনেক ভেবেচিন্তে সুমন্তনারায়ণ হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাগান-বাড়ির কাছাকাছি, শেঠজীর কাছ থেকেই কিছুটা জায়গার বিলি-ব্যবস্থা করিয়ে একটা কাঁচা বাড়ি তুলে ক্যাথারিনের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সাময়িকভাবে।

সারাটা দিন কাজকর্মের পর দোকান থেকে সুমন্তনারায়ণ সোজা একেবারে ক্যাথারিনের গৃহেই চলে যেতেন।

ক্যাথারিনের বাসের পৃথক ব্যবস্থা করার ব্যাপারে প্রথমদিকে সুমন্ত-

নারায়ণের নিজের যে কিছুটা সংকোচ ছিল না তা নয়। কিন্তু ক্যাথারিনকে ঐ নতুন বাসস্থানে উঠে আসার পর অত্যন্ত আনন্দিত হতে দেখে তাঁর সে সংকোচটা কেটে গিয়েছিল।

সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের কাজকর্মের দেখাশোনা ও তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য দুজন ভৃত্য রেখে দিয়েছিলেন।

প্রথম দিন রাত্রে যখন সুমন্তনারায়ণ ক্যাথারিনের গৃহে পেঁছালেন, তাঁর পদশব্দ পেয়েই ছুটে এসে আনন্দে দিশেহারা হয়ে বালিকাসুলভ উচ্ছ্বাসে দু হাতে সুমন্তনারায়ণকে জড়িয়ে ধরে ক্যাথারিন বলেছিল, এ কদিন আসনি কেন ডার্লিং? আমার উপরে রাগ করেছ?

জবাব দেবেন কি সুমন্তনারায়ণ, বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

ক্যাথারিনের পরে এসেছিল মুন্নাবাঈ সুমন্তনারায়ণের জীবনে। এবং মুন্নাবাঈও সুমন্তনারায়ণের মনের অনেকখানিই অধিকার করে নিয়েছিল। আরও এক নারী সুরধুনী তো প্রথম দিকেই তাঁর জীবনের সঙ্গে জটিলভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিল।

আর প্রথম যৌবনের রঙিন দিনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল যে হেমাঙ্গিনী সেও সুমন্তনারায়ণের জীবনের আর এক নারী।

অবিশ্যি রাধারাণীও এসেছিল তাঁর জীবনে।

তবে হেমাঙ্গিনীর কথা বাদ দিলে আর কেউই বোধ হয় পুরুষ সুমন্ত-নারায়ণের সত্যিকারের ভালবাসাটুকু সম্পূর্ণ পায়নি। বাকী সকলে পুরুষ সুমন্তনারায়ণের জীবনে জড়িয়ে গিয়েছিল বেশির ভাগই আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে এবং সে আকর্ষণটা প্রতিটি পুরুষেরই নারীজাতির প্রতি সহজ ও স্বাভাবিক।

তথাপি তাদের মধ্যে যদি কেউ কিছুটা সত্যিকারের ভালবাসা পেয়ে থাকে সুমন্তনারায়ণের অজ্ঞাতেই তাঁর কাছ থেকে তো সে একমাত্র বোধ হয় সুরধুনীই। সুমন্তনারায়ণও তাঁর রোজনামচার পাতায় এক জায়গায় স্পষ্ট করেই লিখে গিয়েছেন সে কথাটি।

সুমন্তনারায়ণ লিখেছেন: সুরোর প্রতি যতটা তীব্র আকর্ষণ আমি অনুভব করেছি, সুরো ঠিক ততটা তীব্রভাবেই যেন চিরদিন আমাকে দূরে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পাষাণী সুরধুনী, কোনদিনই যেন ওর হদিস পেলাম না!

কতদিন মনে হয়েছে জোর করে ওকে অধিকার করবো। দু হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে দলে মুচড়ে পিষে ফেলবো ওর ঐ বোবা দেহটা—যে দেহের মধ্যে ওর পাথরের মত মনটা জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু পারিনি। তাছাড়া একদিন ওর দেহটা যখন একান্ত সুলভ ছিল, আমার সামান্যতম ইঙ্গিতেও যে দেহটা আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে দিত—তখন কেন অধিকারের জন্য হাত বাড়াইনি? অসমর্থ ছিলাম কি? না কোথাও ছিল ভয় বা সংকোচ? কিন্তু

সে যাই হোক আজ যেন সেদিনের সেই অর্থহীন আশ্রয়টাই আমার সামনে জগদ্দল পাথরের মত দাঁড়িয়ে নিরন্তর আমাকে ব্যঙ্গ করছে।

আবার কখনো ওর চোখের দিকে তাকালেই যেন মনে হয়েছে, কিসের এক করুণ মিনতি আমাকে বার বার নিষেধ করেছে—ছিঃ ছিঃ, এ হয় না—এ হতে পারে না!

একদিন নিভৃতে হাত দুটো ওর চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, কেন আজকাল আর ধরা দিতে চাও না সুরো, এমন তো তুমি ছিলে না!

মৃদু হেসে সুরধুনী জবাব দিয়েছে, ভুলে যেও না, তোমার স্ত্রী রাধারাণী এই বাড়িতেই আছে।

বেশ তো, অন্য কোথাও তোমার থাকবার ব্যবস্থা করবো!

কঠিন দৃঢ় কণ্ঠে সুরধুনী আবার বলেছে, ছিঃ!

সুরো—

না, না—

কেন, কেন না?

ভুলে যাও কেন, রাধারাণীর সন্তানরা যে আমাকে মা ডাকে। হতভাগিনী গত জন্মে কত পাপ করেছিলাম আমি জানি না, যে কারণে এমনি করে সমস্ত দেহে নরককুণ্ডের বিষ ও যন্ত্রণা নিয়ে আমাকে আজো বেঁচে থাকতে হয়েছে। এর পরও ঐ মা ডাকের সৌভাগ্যটুকু থেকে—দোহাই তোমার, অন্তত এ অভাগিনীকে বঞ্চিত কোর না, যে কটা দিন আর বেঁচে আছি।

সুরো—

না, না—দয়া করে তোমরা তোমাদের সন্তানদের মায়ের সম্মানটুকু এই অস্পৃশ্যাকে দিয়েছ যখন, তখন আর এই দেহটার দিকে হাত বাড়িও না। তাহলে নিশ্চয়ই জেনো আমার গঙ্গায় ডুবে মরা ছাড়া আর পথ থাকবে না।

অতঃপর বাকী জীবনে আর কখনও কোন অজুহাতে বা কোন কারণেই সুমন্তনারায়ণ সুরধুনীকে স্পর্শ করবার চেষ্টামাত্রও করেননি।

আর রাধারাণী! রাধারাণীর প্রয়োজনটাও সুমন্তনারায়ণের বোধ করি তার প্রথম সন্তানটি জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া রাধারাণী সুমন্তনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোন দিনই ক্ষমতার চক্ষে দেখতে পারেনি।

যার ফলে সহধর্মিণী হয়েও রাধারাণী জীবনে কোন দিন তার স্বামী সুমন্তনারায়ণের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। আর তাতেই বুঝি স্ত্রী হয়েও স্বামীকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে রাধারাণী তার সন্তানদেরও হারিয়েছিল।

কাজেই বেঁচে থাকতে হলে একটা তো অবলম্বন চাই, সেই অবলম্বন হয়েছিল রাধারাণীর সংসার, ধর্ম ও গুরুদেব করালীশঙ্কর। এবং ঐ সংসার, ধর্ম ও গুরুদেবকে নিয়ে যে মিথ্যা আবর্তটা তার সমগ্র জীবনটার মধ্যে ফেনিয়ে উঠেছিল সেই মিথ্যাই একদিন ক্রমশ তার যাবতীয় সম্পদকে পর্যন্ত

অন্ধের মত গ্রাস করেছিল পরবর্তী জীবনে বুঝি তার অজ্ঞাতেই।

এবং সেই মিথ্যার মন্থনে মন্থনে যে বিষ একদিন উঠেছিল, সেই বিষেরই অনিবার্য ক্রিয়াতেও অন্ধের মত একদিন সে সুমন্তনারায়ণের সমস্ত বংশটাকে তো বিষাক্ত করে তুলেছিলই, এমন কি নিজেও সেই বিষের জ্বালাতেই জর্জরিত হয়ে জীবনের শেষের অনেকগুলো বছর নিরন্তর জ্বলতে জ্বলতে শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে যেন জবুথবু হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিকারহীন সেই বিষের জ্বালায় তার জীবনের শেষের দিনগুলি তাই তার কাছে মনে হয়েছে যেমনি দীর্ঘ তেমনি মর্মন্তুদ আর তেমনি অভিশপ্ত। এমন কি শেষ জীবনে বিকৃত-মস্তিষ্কের বিস্মৃতিও সে জ্বালা তাকে ভুলতে দেয়নি।

যে অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস, যে ভ্রান্ত অর্থহীন আত্মবিশ্বাস ও যে সংসারকে আঁকড়ে ধরে রাধারাণী বেঁচে থাকতে চেয়েছিল, সেই বিশ্বাস ও সংসার যখন তার চোখের উপরেই একটু একটু করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো—তখনকার তার সেই মর্মন্তুদ অধ্যায়টা তো আর কারোর অজানা ছিল না।

রায়বাড়ির সেইদিনকার সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো বিভূতির চোখের উপরে যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে। বলিষ্ঠ পুরুষসিংহ সুমন্তনারায়ণ যা গড়েছিলেন তাঁর সমস্ত জীবনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে, রাধারাণী সেইটাই যেন নিজ হাতে ধর্ম-গোঁড়ামি ও স্বামীর প্রতি একটা মিথ্যা অভিমানে টুকরো টুকরো করে ভেঙেছিল।

বিভূতি অনেক সময় আবার ভেবেছে এবং আজও তার মনে হয়, ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই! না সেদিনকার সেই ক্রমক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য যুগের, সামাজিক কৌলীন্যের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র ঐ কবরেরই মাটিতে যে নতুন সমাজ, নতুন কৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল এ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি!

সুমন্তনারায়ণের জীর্ণ রোজনামচার পাতাগুলো একটার পর একটা উল্টে যেতে থাকে বিভূতি।

বাইরে নিশিরাত্রি থম্‌থম্‌ করছে। অন্ধকার থেকে একটানা ঝিঁঝির ঝিঁঝিঁ শব্দ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে রোজনামচাটা বন্ধ করে বিভূতি উঠে দাঁড়ালো। বাইরে একটা মৃদু পদশব্দ শোনা গেল। একটু পরেই সৌদামিনী এসে ঘরে ঢুকলো, বিভু!

এ কি? তুমি ঘুমোওনি?

না। তুইও তো জেগে আছিস্‌!

॥ ৬ ॥

আদি শহর কলকাতা

"কালি গৈয়ে কলকাত্তাকি, যিনি পূজা ফিরিঙ্গী কিন
বঙ্গালিকো মুলুক ধনদৌলত দখল করিলেন ॥"

॥ ১ ॥

খোশবাগের মাটির নীচে টুক্‌রো টুক্‌রো হতভাগ্য নবাবের সুকুমার দেহ পচতে থাকে। প্রতি নিশিরাতে হতভাগিনী লুৎফার চোখের জলের মধ্যে দিয়ে জেবলে দেওয়া তার হাতের প্রদীপটি জবলুক কবরের উপর।

লোল-তৃষ্ণায় ভাগীরথী লেহন করতে থাকুক লক্ষ জিহবা মেলে লক্ষবাগের মাটি।...আর ক্রমশ বোলবোলাও ভরে উঠতে থাকুক জব চার্নকের স্বপ্ন-শহর কলকাতা।

ভাগীরথী বয়ে চলুক।

১৬৯৮ সালের ১০ই নভেম্বরে যেদিন সাবর্ণ চৌধুরীদের পড়তি অবস্থার সুযোগ নিয়ে বেনিয়া ইংরাজ কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর ডিহি কলকাতা তিনটি গ্রাম কিনে নিয়েছিল—তারপর অনেক অনেকগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে।

কারণ ক্রমশ কলকাতার কাছে-পিঠের চিৎপুর, সিমলে, মির্জাপুর, আরপুলি, কলিঙ্গা, চৌরঙ্গি ও বির্জিতলা গ্রামগুলো ইংরেজ গ্রাস করে নিয়েছে একে একে কৌশলে, সেদিনকার তাদের একচেটিয়া বাণিজ্যবিস্তারের স্বপ্নে।

মানুষের চোখের কান্নাও শুকিয়ে গিয়েছে হতভাগ্য নবাবের মৃত্যুর শোকে।

এক যায় অন্য আসে, এই তো দুনিয়ার নিয়ম।

তবে আবার ক্ষোভ কেন!

তার চাইতে বরং উল্টে যাওয়া যাক সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার জীর্ণ পাতাগুলো।

সন্ধ্যার পর অন্দরে প্রবেশের মুখে একটা বিকৃত গানের সুর কানে যেতেই থমকে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ।

কালীচরণ গান গাইছে—

কি হলো রে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।

কি গাইছে কালীচরণ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলেন সুমন্তনারায়ণ।

অশুদ্ধ উচ্চারণ তবু গানের কথাগুলো বোঝা যায়। কষ্ট হয় না।

কালীচরণ গাইছে—

ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহনলালের বিটি।
কি হলো রে জান,
পলাশী ময়দানে ওড়ে কোম্পানি নিশান।

পিতৃমাতৃহারা সেই চণ্ডাল বালক আজ আর বালক নেই। সতেরো বছরের তরুণ, কালো কষ্টিপাথরের মত দেহটার স্ফীত পেশীগুলো দেখলে মনে হয় বুঝিবা অসংখ্য কৃষ্ণসর্প গুটি পাকিয়ে পাকিয়ে আছে।

মাথাভর্তি তৈলসিক্ত বাবরি চুল। গাল পর্যন্ত জুলপি, ওষ্ঠের উপর বাহারে গুম্ফ সযত্নে লালিত। সহসা দেখলে কে বলবে ওর মাত্র সতেরো বছর বয়স। চব্বিশ-পঁচিশ বছরেরই বুঝিবা। এর মধ্যেই মল্লযুদ্ধ, লাঠিচালনা ও সড়কি চালনায় অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করেছে।

স্ত্রী রাধারাণীর দুধেআলতা গাত্রবর্ণ পেয়েছে তার পুত্র কন্দর্পনারায়ণ। তেরো বছরের কিশোর।

সর্বদা দুজনে যেন ছায়ার মতই পাশাপাশি ফেরে। কালীচরণ আর কন্দর্পনারায়ণ।

অদ্ভুত লাগে ওদের পাশাপাশি দুজনকে দেখতে। একজন কালো কষ্টি পাথরের মত, অন্যজন টকটকে গৌরবর্ণ। কালীচরণ আর কন্দর্পনারায়ণ।

কিন্তু অন্দরের দিকে যেতে যেতে সুমন্তনারায়ণের ক্ষণপূর্বে শোনা গানের দুটি কলি যেন তখনো তাঁর দু কান ভরে বাজতে লাগলো।

মীরজাফরের দাগাবাজি নবাব ধরতে পারল মনে
সৈন্যসমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে।

সুমন্তনারায়ণের মনে হয় দাগাবাজির ফল তো নবাব মীরজাফরকে হাতে হাতেই বলতে গেলে প্রায় পেতে হয়েছে!

মসনদচ্যুত নবাব আজ শোনা যায় নিদারুণ ভয়াবহ কুষ্ঠ ব্যাধিতে নাকি জর্জরিত।

বাঙলার মসনদে এখন নবাব নাসির-উল্-মুলুক ইমতিয়াজউদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁ নসরৎ জঙ্গবাহাদুর।

হ্যাঁ, পাপের ফল হাতে হাতেই ফলেছে বলতে গেলে। একমাত্র পুত্র মীরনও বজ্রাঘাতে মৃত।

দুর্লভরাম সর্বস্বান্ত হয়ে এখন কলকাতাতেই এসে উঠেছে।

শুধু পোয়াবারো আজ বিদেশী বণিকদের। হতভাগ্য নবাবের রাশীকৃত গুপ্তধন নয়া নবাব মীরজাফরের মোড়লিতে গোপনে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গভর্ণর ড্রেক, কর্নেল ক্লাইভ, ওয়াটসন, মেজর কিলপ্যাট্রিক, মানিংহাম, ওয়াট্স্, স্ক্রাফটন ও লুসিংটনের সিন্দুক ভারী করে দিয়েছে। অর্থকে অর্থ, ক্ষমতাকে ক্ষমতা সবই আজ ফিরিঙ্গীদের করায়ত্ত।

জব চার্নকের স্বপ্ন সফল হয়েছে। কারণ ঐসব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরটাও আজ তাদেরই তো।

আর লাভবান হয়েছে তদানীন্তন দেশের ধূর্ত, লোভী, চক্রী ও চর্মচক্ষুহীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন—ঐ বণিক কোম্পানির সঙ্গে গোপনে হাতে হাত মিলিয়ে। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র, কামধেনু জগৎশেঠ, নবকৃষ্ণ, নকু ধরের দৌহিত্র সুখময়, বড়বাজারের জমিদার কাশীনাথবাবু, শ্যামবাজারের কৃষ্ণকান্তবাবু, পাইকপাড়ার শ্রীল শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়েরা।

আহা, নাম তো নয় নামামৃত।

তবু কু-লোকেরা তখনো বলতো ওদেরই কীর্তিকলাপ স্মরণ করে হয়তোঃ

জাল জুয়োচুরি মিথ্যে কথা
এই তিন নিয়ে কলকাতা।

এবং ঐসব চিরস্মরণীয় মহাজনদের নেকনজরে ছিলেন বলেই বোধ হয় সুমন্তনারায়ণের ভাগ্যের চাকাটা ঘুরেছিল সেদিন অনায়াসেই।

আর অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই তো সে যুগে পাপস্খালনের জন্যই ধর্মাচরণ।

অতএব কালী-প্রতিষ্ঠা। জগজ্জননী মা বিশ্বরূপার প্রতিষ্ঠা।

অন্যমনস্ক ভাবে অন্দরে এসে প্রবেশ করতেই সুমন্তনারায়ণ শুনলেন ভাটপাড়া থেকে কুলগুরু করালীশঙ্কর এসে গিয়েছেন।

প্রদীপের আলোয় স্ত্রী রাধারাণীরই শয়নঘরের মেঝেতে মৃগচর্মের আসন পেতে কুলগুরু করালীশঙ্কর আসীন। সম্মুখে গলবস্ত্রে বিনীত ভঙ্গীতে উপবিষ্টা রাধারাণী অপলক দৃষ্টিতে ইহকাল ও পরকালের একমাত্র সাক্ষাৎ দেবতা ও স্বর্গারোহণের একমাত্র সোপান, গুরুদেবের কথামৃত পান করছে অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত চিত্তে।

করালীশঙ্কর বয়সে সুমন্তনারায়ণের চাইতে অন্তত দশ বৎসরের তো কনিষ্ঠ হবেনই।

ত্রিশের কোঠা সবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মেদবহুল দেহ, মাথায় বাবরী চুল, কপালে রক্তসিন্দূরের ত্রিপুণ্ড্রক। গলায় ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। পরিধানে কষায় বস্ত্র ও বক্ষে লম্বমান হরিণচর্মের উপবীত। সর্বদেহে রোম-প্রাচুর্য। রীতিমত তন্ত্রের উপাসক করালীশঙ্কর। চক্ষু দুটি সর্বদাই ঘন ঘন কারণ-পানে রক্তবর্ণ। গলার স্বর ভারী ও কর্কশ।

বয়োকনিষ্ঠ হউক আর যাই হউক, কুলগুরু সাক্ষাৎ দেবতা। ঘরে প্রবেশ করে সুমন্তনারায়ণ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন গুরুর চরণে।

কল্যাণ হোক। করে উপবীত ধারণ করে করালীশঙ্কর আশীর্বাদ করলেন শিষ্যকে।

দেবতার সেবা হয়েছে? সুমন্তনারায়ণ শুধালেন।

হ্যাঁ।

স্বামীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রাধারাণী উঠে দাঁড়িয়েছিল।

রাত্রে দেবতার কি সেবা হবে? রাধারাণী শুধাল।
কিঞ্চিৎ কারণ আর মাংসের ব্যবস্থা করো।
রাধারাণী অতঃপর নিঃশব্দে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।
মা জগজ্জননীর প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছো সুমন্তনারায়ণ, অতীব শুভ ও মহৎ কার্য। তা কতদূর কি ব্যবস্থা করলে? করালীশংকর শুধাল।
ব্যবস্থা সবই করেছি দেবতা।
বলির ব্যবস্থা করেছো?
বলি! হ্যাঁ—পঞ্চাশটি পাঁঠা ও একটি মহিষের ব্যবস্থা করেছি।
ওতে কি হবে? নর-শোণিত না হলে কি জগন্মাতাকে তৃপ্ত করা যায় বৎস?
নর-শোণিত! ব্যাকুল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন সুমন্তনারায়ণ গুরুর মুখের দিকে।
অবশ্য, নরবলিব ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি! আমার পিতামহ একশত আটটি নববলি দিয়ে আমাদের গৃহে চিন্ময়ীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—
কিন্তু দেবতা—
অমাবস্যার এখনও সাত দিন দেরি, বলি সংগ্রহে তৎপর হও। হ্যাঁ মনে রেখো, চণ্ডাল-শিশুই শ্রেষ্ঠ বলি এ ব্যাপারে।
কিন্তু দেবতা, পশুও তো জীব। এবং জীব-বলিই যখন দেওয়া হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে নর-শিশু—
মূর্খের মত তর্ক করো না সুমন্তনারায়ণ, জেনো পাষাণ-প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হলে নর-শোণিতের একান্ত প্রয়োজন। মনে রেখো, মায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চলেছো, এ ছেলেখেলা নয়!
সুমন্তনারায়ণ আর তর্ক করলেন না। করালীশংকরকে প্রণাম করে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নর-শোণিতের প্রয়োজন। কিন্তু কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন বলি?
জগন্মাতার প্রতিষ্ঠা হবে। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী যিনি, ত্রিসংসারে যিনি পালনকর্ত্রী, তাঁর প্রতিষ্ঠায় তাঁরই সৃষ্ট জীব নরকে বলি দিতে হবে! এবং শুধু নরবলিই নয়, নর-শিশু!
না, না—এ যে মহাপাপ। শিউরে ওঠেন সুমন্তনারায়ণ। জগজ্জননী হয়েও নর-শোণিতই যদি তাঁর একমাত্র পূজোপকরণ, তাহলে প্রয়োজন নেই তাঁর অমন মায়ের প্রতিষ্ঠায়। পাষাণী মা পাষাণীই থাকুন, প্রয়োজন নেই তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠায়।
নবনির্মিত মন্দিরে বিশ্বরূপার পাষাণ-মূর্তি এনে রাখা হয়েছে রক্তবর্ণ একটি রেশম-বস্ত্র দিয়ে সযতনে ঢেকে। মন্দিরের কপাট খুলে সুমন্তনারায়ণ এসে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।
এক কোণে রক্তবর্ণ রেশমী-বস্ত্রাবৃত পাষাণ-মূর্তি। অন্য কোণে জ্বলছে একটি পিতলের দীপাধারে ঘৃত-দীপ। দীপের স্বল্প আলোয় সমগ্র কক্ষের

মধ্যে যেন একটি আলো-আঁধারির অস্পষ্টতা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ, তার পর এক সময়ে মূর্তির উপর থেকে বস্ত্রটি অপসারিত করলেন।

মা, মাগো—

চক্ষে বরাভয় দৃষ্টি প্রসারিত চারি হস্ত। এক হস্তে অভয় দান, এক হস্তে শাণিত খড়্গ, এক হস্তে মুণ্ড, এক হস্তে ধৃত একটি পদ্মকলি।

সত্যিই কি জননী, নর-শোণিত না হলে তোর পূজা হয় না!

জীবের মঙ্গলের জন্যই তো জননী তোর এই বিশ্বরূপায় প্রকাশ। তবে কেন এরা বলে যে নর-শোণিতই তোর একমাত্র পূজোপকরণ!

বল্ মা, সত্যিই কি তুই নর-শোণিত চাস জননী?

আরও কতক্ষণ যে তার পরেও বসেছিলেন সুমন্তনারায়ণ ঐ দেবী প্রতিমার সম্মুখে তার খেয়ালই ছিল না। খেয়াল হলো অদূরে শিবাদলের রাত্রির প্রহর ঘোষণার উচ্চ চিৎকারে।

হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া—য়া—

পাষাণ-প্রতিমাকে আবার বস্ত্রাবৃত করে সুমন্তনারায়ণ মন্দির থেকে বের হয়ে এলেন।

কিন্তু মধ্যরাত্রির ক্ষীণ চন্দ্রালোকে চত্বরে পা দিয়েই সামনের দিকে নজর পড়তেই যেন চমকে উঠলেন।

কে? কে ওখানে?

আমি। নারীকণ্ঠে ক্ষীণ প্রত্যুত্তর এলো।

কে, সুরো!

হ্যাঁ। সুরধুনী এগিয়ে এলো। তারপর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কিন্তু রায় মশাই, তুমি এত রাত্রে মন্দিরের মধ্যে কি করছিলে?

নিদারুণ একটা সমস্যায় পড়েছি সুরো।

সমস্যা?

হ্যাঁ—

কি সমস্যায় আবার পড়লে? তা সমস্যা পরে ভাবলেও চলবে—অনেক রাত হয়েছে, এবারে শুতে যাও।

আচ্ছা সুরো, একটা কথার জবাব দেবে?

কি?

নর-শিশু বলি না দিলে সত্যিই কি মায়ের প্রতিষ্ঠা হবে না?

নর-শিশু!

হ্যাঁ, গুরুদেবের নির্দেশ।

সুরধুনী কোন জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

॥ ২ ॥

সুরধুনী—

বল।

আমার কথার জবাব দিলে না?

আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, ও তত্ত্ব-কথার আমি কি জবাব দিতে পারি বল?

না, না—এ তত্ত্ব-কথা নয় সুরো, এ মানুষের কাছেই মানুষের একটা সহজ জিজ্ঞাসা।

অতশত বুঝি না রায়মশাই। গুরুদেব সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁর মুখ দিয়ে কি মিথ্যে কিছু বেরুতে পারে?

কি বলছো তুমি সুরধুনী, না, না—

তিনি যখন বলেছেন মায়ের প্রতিষ্ঠায় নর-শোণিতের প্রয়োজন, তখন তার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি।

তুমিও একথা বলসে সুরো! মা যিনি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী, জগৎপালিনী, তাঁর পরিতৃপ্তির জন্য দিতে হবে তাঁরই সন্তানের রক্ত!

তাই যদি না হবে তো শাস্ত্রে মায়ের পূজায় নরবলীর বিধানই বা রয়েছে কেন?

ওটা আর কিছুই নয়, একদল লোভী স্বার্থপর, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ব্রাহ্মণের যথেচ্ছাচার মায়ের নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে চালিয়ে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। তাছাড়া কোথায় পাবো আমি নর-শিশু বলির জন্য? কোন্ মা দেবে তার বুক ছিঁড়ে নিজের সন্তানকে যূপকাষ্ঠে তুলে দিতে!

সে পরে ভেবে দেখলেও চলবে। তাছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন, মায়ের পূজার বলি মা-ই সংগ্রহের রাস্তা দেখিযে দেবেন।

সুমন্তনারায়ণ আর কোন প্রত্যুত্তর করেন না। নিঃশব্দে অন্দরের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইদানীং কিছুদিন থেকেই সুমন্তনারায়ণ স্ত্রীর থেকে পৃথক ঘরে পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজ নির্দিষ্ট শয়নকক্ষের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অলিন্দে থমকে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ।

স্ত্রী রাধারাণীর শয়নকক্ষের ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে তখনও ক্ষীণ আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। গুরুদেব করালীশঙ্করের কণ্ঠস্বব শোনা গেল কক্ষমধ্যে।

পুরুষের সামনে প্রলোভন সে তো সহস্র বাহু বিস্তার করেই তাকে সদা-সর্বদা গ্রাস করতে চাইবে মা, সে প্রলোভনকে জয় করা তো সকলের সাধ্য নয়। যে পারে সেই তো প্রকৃত বীর্যবান পুরুষ।

স্ত্রী রাধারাণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনাকে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করে দিতেই হবে দেবতা। সুরধুনীকে এ বাড়িতে এনে তুলেছে কিছুই বলিনি, কিন্তু কোথাকার কে অজ্ঞাত বিধর্মী ক্রেস্তান মাগীকে নিয়ে এই যে বেলেল্লাপনা, কি বলবো দেবতা সব দেখেশুনে আমার যেন ঘেন্নায় লজ্জায় একেবারে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে।

তাই তো মা, নারায়ণ সত্যি সত্যিই ভাবিত করে তুললো দেখছি। তবে তুমি ভেবো না মা, আমি যখন এসে পড়েছি, মাতার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাক, আমি হোম করবো ঐ পাপের বিধানে—

আচ্ছা দেবতা, আপনারা তো সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম, বাণ নিক্ষেপ করে ঐ সর্বনাশীকে শেষ করে দেওয়া যায় না!

কালী—করালবদনী! তারা, তারা—য়্যাঁ, কি বললে মা, শেষ করে দেওয়া, তা যাবে না কেন? মন্ত্রের দ্বারা অসাধ্য-সাধনও করা যায় বৈকি!

তবে আপনাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে দেবতা।

ব্যস্ত হয়ো না মা, যাবার পূর্বে কিছু একটা ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাবই।

সুমন্তনারায়ণ আর দাঁড়ালেন না।

শয়নকক্ষেও আর গেলেন না, বহির্মহলের দিকে পা বাড়ালেন।

কিন্তু নরবলির জন্য নরশিশু পাওয়া অত সহজ নয়।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে কালীচরণই একটি শিশুর সন্ধান নিয়ে এল। কি করে কোথা হতে যে সংগৃহীত হবে সেই বলি, কালীচরণ অবিশ্যি তার প্রভুকে কিছুই বললো না, কেবল বললে, বলির ব্যবস্থা সে করেছে।

মহাসমারোহে মায়ের প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে লাগলো।

মায়ের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মহাসমারোহে, আনন্দে রায়-বাড়ি গমগম করছে, তথাপি সুমন্তনারায়ণের মনে কিন্তু এতটুকু শান্তি নেই। কি একটা অস্বস্তিতে যেন তিনি সর্বদাই ছটফট করছেন। থেকে থেকে কাঁসর-ঘণ্টা ও ঢাকের বাদ্যিতে যেন চমকে চমকে ওঠেন।

আশেপাশের বহু গৃহস্থ-বাড়ি থেকে নর-নারীরা মায়ের প্রতিষ্ঠা দেখতে এসেছে।

অমাবস্যার কৃষ্ণ-রাত্রির মধ্যযাম। কালো মসীকৃষ্ণ আকাশপটে শুধু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তারকাগুলি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে ধূপ-গুগ্গুলের গন্ধ। রক্তবস্ত্র-পরিহিত করালী-শঙ্কর আকণ্ঠ কারণবারি পান করে গম্ভীর কণ্ঠে মধ্যে মধ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

অদূরে একপাশে দণ্ডায়মান রাধারাণী।

রাত্রে তৃতীয় যামে বলি। সময় যত সন্নিকটে আসতে থাকে, সুমন্ত-নারায়ণের অস্থিরতা যেন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহির্মহলের একটি কক্ষে সুমন্তনারায়ণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন।

দ্বিপ্রহরে একমুঠো মুদ্রা তুলে দিয়েছেন সুমন্তনারায়ণ কালীচরণের হাতে। আর কোন সংবাদই তিনি রাখেননি এবং রাখতেও চান না।

সহসা যেন একটি শিশুকণ্ঠের ক্ষীণ সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি সুমন্তনারায়ণের শ্রবণেন্দ্রিয়কে সচকিত করে তোলে।

কে! কে কাঁদে! প্রথমটায় ভেবেছিলেন বুঝি শোনবারই ভুল। তাঁর

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাল করে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতেই বুঝতে বিলম্ব হয় না ; শোনবার ভুলও নয়, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কোন কল্পনাও নয়। সত্যিই শিশুকণ্ঠের ক্রন্দন-ধ্বনি।

যে কক্ষটির মধ্যে পায়চারি করছিলেন সুমন্তনারায়ণ, তারই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। কান পেতে শুনলেন সেই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর থেকেই শোনা যাচ্ছে সেই শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি।

কয়েকটি মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন সুমন্তনারায়ণ, তারপর একসময়ে সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পার্শ্বসংলগ্ন সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দরজার সামনে এসে দেখলেন, প্রকোষ্ঠের দরজায় একটি তালা লাগানো। বন্ধ তালাটা ধরে বারকয়েক টানলেন, কিন্তু দেখলেন চাবি ব্যতীত ঐ তালা ভাঙা বা খোলা সহজসাধ্য নয়।

প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর থেকে সেই শিশুর ক্রন্দন তখনও শোনা যাচ্ছে। দুই দরজার মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে প্রকোষ্ঠের মধ্যে এবার উঁকি দিয়ে দেখলেন— তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়।

প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখলেন, কৃষ্ণবর্ণ একটি পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স্ক শিশু হাত-পা-বন্ধ অবস্থায় প্রকোষ্ঠের মেঝের উপর শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

ক্ষণেকের জন্য মনে হয় সুমন্তনারায়ণের, প্রচণ্ড একটা পদাঘাতে বন্ধ দরজাটা ভেঙে ফেলে প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করে অসহায় ঐ শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসেন। কোন্ হতভাগিনী জননীর বুকখানা খালি করে এরা ঐ শিশুটিকে বলিদানের জন্য ছিনিয়ে এনেছে তাই বা কে জানে!

আর মা-বাপই বা কেমন; অর্থের বিনিময়ে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়েছে ঐ শিশুটিকে তাদের? অর্থের কাছে বিক্রয় করেছে তাদের পিতৃ-মাতৃস্নেহ?

কিন্তু জানতেন না সুমন্তনারায়ণ যে, অর্থের বিনিময়ে নয়, কৌশলে চুরি করে আনা হয়েছে ঐ শিশুটি বলিদানের জন্য মায়ের পুজায়।

জেনেছিলেন অনেকদিন পরে।

কিন্তু কিছুই সেদিন করতে পারেননি সুমন্তনারায়ণ। স্থাণুর মত বদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেবল অসহায় শিশুটির ক্রন্দনই শুনেছিলেন। তাঁর পিতৃপুরুষের যুগযুগান্তরের সংস্কারই সেদিন শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিশ্চল করে দিয়েছিল। রক্ষা করতে পারেননি শিশুটিকে। শুধু পালিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গার তীরে চুপি চুপি বুঝি চোরের মতই। মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত কৃষ্ণরাত্রির বোবা আকাশ। সম্মুখে পায়ের নীচে প্রবাহমান ভাগীরথী।

তার পর ঘণ্টা দুই বাদে যখন গৃহে ফিরে এসেছিলেন সুমন্তনারায়ণ, পূর্বাশার প্রান্তে বিলীয়মান রাত্রির অস্পষ্ট আলোর ইশারা।

ঢাকের বাদ্য থেমে গিয়েছে। শুধু মন্দিরাভ্যন্তর থেকে হোমের মন্ত্রোচ্চারণ ভেসে আসছে করালীশংকরের গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তখনও।

সভয়ে তাকালেন সুমন্তনারায়ণ যূপকাষ্ঠের দিকে। যূপকাষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে তখনও রক্ত ইতস্তত কালো হয়ে চাপ বেঁধে আছে।

এক পাশে আঙ্গিনায় কতকগুলি পশুর ছিন্নমুণ্ড ও রক্তাক্ত মৃতদেহ স্তূপীকৃত করা আছে। কিন্তু সেই নধরকান্তি শিশুটির দেহ কই?

সহসা যেন কেমন নিঃশ্বাস আটকে আসে সুমন্তনারায়ণের। যেন একটা লৌহবেষ্টনী ক্রমশ তাঁর শ্বাসনালীটা চেপে ধরছে। সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে থাকে, আর দাঁড়াতে পারলেন না সুমন্তনারায়ণ। যেন ভূতে তাড়া করেছে এমনি ভাবে একপ্রকার ছুটেই অন্দরে সোজা একেবারে শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

একটা রক্তাক্ত কবন্ধ শিশুদেহ যেন তাঁর চতুর্দিকে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। দু কান ভরে বাজছে সকরুণ একটা অদেহী শিশুকণ্ঠে অসহায় ক্রন্দন-ধ্বনি।

তার পর একদিন বা দুদিন নয়, অনেক রাত্রি সেই কবন্ধ শিশু-দেহের বিভীষিকা সুমন্তনারায়ণের স্মৃতিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। অশরীরী এক শিশুকণ্ঠের সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি তাঁর পিছনে পিছনে একটা দুঃস্বপ্নের মতই যেন তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে।

॥ ৩ ॥

অথচ সেই যুগে মায়ের প্রতিষ্ঠায়, কল্পিত মায়ের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত নর-শিশুকে বলি দিয়ে সুমন্তনারায়ণের কুলগুরু করালীশংকর কোন অপরাধই করেননি। তবু যে কেন সেই নরবলির নিমিত্ত নরহত্যার পাপবোধ থেকে সুমন্তনারায়ণ যতকাল জীবিত ছিলেন, তার পর একটি দিনের জন্যও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি সেটাই আশ্চর্য। এবং তার চাইতেও আশ্চর্য, তার পর যতদিন জীবিত ছিলেন, একটি দিনের জন্যও তাঁর এত সাধের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরূপার মুখের দিকে তাকাতে পারেননি। মূর্তির দিকে তাকিয়ে মা বলে ডাকতে গিয়েও কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর।

কালী-প্রতিষ্ঠার পরও দীর্ঘ একমাস শিষ্যগৃহে চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে উদর পূর্তি করে, প্রচুর দক্ষিণা নিয়ে করালীশংকর ফিরে গেলেন সে-যাত্রা। এবং তাঁর সে যাত্রার আর পুনরাগমন ঘটেনি সুমন্তনারায়ণের জীবিতকালে। কোন উপলক্ষ বা কোন ছুতোতেই সুমন্তনারায়ণ আর গুরুপুত্রকে তাঁর গৃহে পুনরাগমনের সুযোগ দেননি।

আবার তাঁর পুনরাগমন ঘটেছিল রায়-বাড়িতে দীর্ঘ ষোল বছর পরে। সুমন্তনারায়ণ তখন মৃত। জমজমাট রায়-বাড়ির কর্তা তখন পুত্র কন্দর্প-নারায়ণ। এবং সেদিনকার আগমনের হেতুটা যদি সুমন্তনারায়ণের জীবিত-কালে হতো তো সুনিশ্চিত তাঁকে আর জীবিত ফিরে যেতে হতো না।

অবশ্য সুমন্তনারায়ণ জীবিত না থাকলেও, তাঁর পুত্র কন্দর্পনারায়ণও

তাঁকে জীবিত ফিরে যেতে দেননি। সে কাহিনী অবিশ্যি সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার মধ্যে কোথায়ও লিখিত নেই।

অশীতিপরা বৃদ্ধা বিকৃতমস্তিষ্কা রাধারাণীর অসংলগ্ন খেদোক্তির মধ্য থেকেই শুধু নয়, বালিকা সৌদামিনীর অস্পষ্ট অসংলগ্ন ধোঁয়াটে স্মৃতি থেকেও কিছুটা বিবৃত।

অর্থাৎ সৌদামিনী দেবীর মুখ থেকেই শোনা বিভূতির সে কাহিনী।

কিন্তু এখনও শেষ হয়নি সুমন্তনারায়ণের রোজনামচা।

অনেক অনেক জীর্ণ পৃষ্ঠায় এখনও অনেক অনেক কিছু ছড়িয়ে আছে।

১৭৬৩ সালের ১৯শে জুলাই হতভাগ্য মীরকাশিমের নবাবীর গোনা দিন ফুরিয়ে এল। ইংরাজরা যুদ্ধ ঘোষণা করলো তাঁর বিরুদ্ধে।

আবার মীরজাফর। আবার নতুন সন্ধিপত্র। নবাবের গদি নিয়ে যেন পুতুলনাচ চলছে। আর পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ দিয়ে ভাগীরথীর তীরভূমি, নয়া কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে সারা ভারত জুড়ে অদূর ভবিষ্যতের এক গোলামীর সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে নবোদিত ইংরাজশক্তির ব্যাপকতার মধ্য দিয়ে।

ইংরাজের পতাকা উড়ছে পলাশীর আম্রকানন থেকে বক্সার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত।

বাদশাহ্ শাহ্ আলম। দিল্লিসে পালম!

ঠুঁটো জগন্নাথের মত শাহ্ আলমের প্রতাপ-প্রতিপত্তি পালম গ্রাম পর্যন্তই!

অতএব জলের বণিক আজ ভারতের মাটিতে কায়েমী হয়ে বসলো বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি নিয়ে।

ক্রমশ আরও জাঁকিয়ে উঠছে কলকাতা শহর।

নকু ধরের অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত ধরের সুতানুটির গৃহে সেদিন বিরাট উৎসব। সুবৃহৎ অট্টালিকা ঝাড়বাতির আলোয় আলোয় একেবারে রমরম করছে। নাচ-গান-তামাশা। শুধু আনন্দ আর স্ফূর্তি।

সুমন্তনারায়ণও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

শোনা গেল স্বয়ং ক্লাইভ নাকি আজ নকু ধরের গৃহে পান-ভোজন করতে আসছেন। নকু ধর নিজে শশব্যস্তে চারিদিকে ঘোরাফেরা করছেন। শহরের গণ্যমান্য অনেকেই আজ নকু ধরের গৃহে অতিথি।

বড়বাজারের নয়ানচাঁদ মল্লিক মশাইও এসেছেন।

আয়োজন আর হৈ-হল্লা দেখে বুকটা তাঁর চড়চড় করছে। ব্যাটা ক্লাইভের মুৎসুদ্দি বেশ তোয়াজ করতে জানে তো!

ঠিক আছে, তিনিও ছেড়ে কথা কইবেন না। সামনের হপ্তাতেই তিনিও একটা খানাপিনা নাচগানের আয়োজন করছেন। হাজারগুণ বেশি জাঁকজমক করে দেখিয়ে দিতে হবে, বড়বাজারের নয়ান মল্লিকও নিমন্ত্রণ করতে জানেন।

তাঁরও অর্থ আর নজর দুই আছে।

ক্লাইভ সেই সময় দমদমায় থাকেন। তখনও এসে পোঁছাননি নকু ধরের গৃহে।

কিছুক্ষণ পরেই পালকি বেহারাদের হুম্ব্রো হুম্ব্রো শব্দ শোনা গেল। সকলেই সচকিত হয়ে সদরের দিকে তাকায়। কে—কে আসে!

দশহাজারী মনসবদার স্বয়ং রাজাবাহাদুর নবকৃষ্ণ। শোভাবাজারের নবকেষ্ট।

নকু ধর চালাক মানুষ।

এই তো কিছুকাল আগেও তাঁরই অধীনে ঐ নবকেষ্ট—রাজা নবকৃষ্ণ, কেরানীগিরি করতো। মোগল সরকারের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিল ব্যবহার্তা। ওর বাপ রামচরণ তো সেদিন মাত্র সুতানুটিতে বাড়ি তৈরি করলো।

ভাগ্যের সুতো ছিঁড়ে কলকাতায় 'নব মুন্‌শী' হলো, আর এই কয় বছরেই দেখতে দেখতে আঙুল ফুলে কলাগাছ।

আসুন, আসুন মহারাজ—মুখে কিন্তু নকু ধরের বিনয় উপচে পড়ে।

রুপো-বাঁধানো ঝালরদার পালকি থেকে নামলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর। তাঁর আগেপাছে চোবদার, সোঁটাদার, হুঁকাবরদার, হুকুমবরদার —একেবারে এলাহি নবাবী কাণ্ডকারখানা।

একমাথা বাবরী চুল, গালের অর্ধেক পর্যন্ত নেমে এসেছে মোটা জুল্পি, বিরাট একজোড়া গোঁফ। মাথায় রেশমের পাগড়ি, গায়ে রেশমের জোব্বা, পায়ে জরির কাজ-করা চর্মপাদুকা। ভুরভুর করে সর্বাঙ্গ থেকে বাদশাহী আতরের খুসবু ছাড়ছে।

তার পর ধর মশাই, হুজুর কর্নেল সাহেব কখন আসছেন? মহারাজ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন।

অনেকটা পথ আসতে হবে তো, এসে পড়বেন হয়তো এবারে।

হুঁ। বলতে বলতে রাজা নবকৃষ্ণ বড়বাজারের জমিদার কাশীনাথবাবুর দিকে তাকালেন।

এই যে কাশীনাথবাবু যে, শরীরগতিক সব কুশল!

তা এক রকম চলছে—

মেয়র্স কোর্টে আপনার যে মামলাটা চলছিল তার কি হলো?

চলছে—

কেন, আপনি আর মহারাজ দুজনই তো সালিশী! আর মহারাজ তো শুনেছি আপনার বন্ধু মানুষ, তবে এখনও মামলাটার নিষ্পত্তি হচ্ছে না কেন?

বুঝতেই তো পারছেন, পাগলের সম্পত্তি—অনেক ঝামেলা, বাগড়া—

বাড়ির অন্য অংশে তখন গোঁজলা গুঁই আর তিন চেলা রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল ও রামজী দাসকে নিয়ে কবি-গানের আসর রীতিমত সরগরম করে তুলেছে।

আদিরসাত্মক কবি-গান।

ঐখানেই কবিয়াল নরোত্তম দাসের সঙ্গে সুমন্তনারায়ণের প্রথম আলাপ।

সুমন্তনারায়ণের কবি-মন চিরদিনই কবি-গানের প্রতি একটু বেশি আকৃষ্ট হতো বরাবর।

নরোত্তমের বয়স তখন ছাব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, রোগাটে চেহারা, একমাথা বাবরী চুল, প্রশস্ত বুদ্ধি-দীপ্ত কপাল।

ঢুল ঢুল দুটি আঁখি!

ভারি মিষ্টি গলাটি ছিল তার। এবং শুধু কবি-মনটিই তার ছিল না, রসিক কবি-মন ছিল।

গোঁজলা গুঁই-ই তখন কবিগানের গগনে একমাত্র কবিয়াল।

ভারি দেমাক।

তারই সাকরেদি পাবার আশায় আশায় নরোত্তম দাস তখন গোঁজলা গুঁইয়ের পিছনে পিছনে ফিরছে।

গোঁজলা গুঁই হাত নেড়ে মাথা দুলিয়ে কবি-গান করছে কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকে কেন্দ্র করে নতুন ছড়া বেঁধে।

এর পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে নরোত্তম দাস।

সুমন্তনারায়ণ ধীরে ধীরে এসে একসময় ঐ নরোত্তম দাসেরই পাশটিতে দাঁড়ালেন।

দুজনেই থেকে থেকে বাহবা দিচ্ছেন।

দুটি কবি-মনের পরস্পরের পরিচয় পেতে দেরি হয় না।

একই রসের রসিক দুজন।

পরবর্তীকালে ঐদিনকার ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই তাই নরোত্তম দাস বলতেন, চিনেছিলাম যে রসরাজ, তোমায় সেই দিনেই চিনে নিয়েছিলাম।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, রসের কারবার করি আর রসিকজনকে চিনতে পারবো না?

কথাটা বলতে বলতে কাব্য করে শেষ করতো নরোত্তম দাস।

চিনেছিলাম যে নাগর চিনেছিলাম,
তুমি মোর মনের মানুষ
রসের নাগর রসিক সুজন
তাই তো তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধিলাম।

কথাটা শুনে হাসতেন সুমন্তনারায়ণ।

হাসছো বন্ধু হাসো—বলে আবার ছড়া কাটতো নরোত্তম দাস,

হাসছো বন্ধু হাসো—
ও হাসি চিনি
ওহে চিন্তামণি

তুমি নরোত্তম
তুমি পরাণের মণি।

সত্যিই হৃদয়ের নিভৃতে সুমন্তনারায়ণের কবি-বন্ধু নরোত্তম দাসের মত বুঝি কেউ পেঁছাতে পারেনি।

নরোত্তমই সেদিন শুধিয়েছিল প্রথমে, বাবু মশাইয়ের নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

নাম বললেন সুমন্তনারায়ণ।

ব্রাহ্মণ?

হ্যাঁ।

অধীনের নাম, নরোত্তম দাস। বৈশ্য—

কলকাতা শহরেই থাকা হয় বোধ হয়?

কলকাতা শহর বলে কোন কথা নেই বাবু মশাই, স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে চলেছি ঘাটে ঘাটে, কারো দয়ায় আশ্রয় পেলে দুটো দিন সেখানে থাকি। আবার একদিন ভেসে পড়ি। ধর মশাই দুদিন যাবৎ আশ্রয় দিয়েছেন, আছি—আবার—

আবার একদিন ভেসে পড়বে, এই তো!

তা বৈকি।

যাবে আমার কুটিরে?

আমায় তুমি তোমার ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

যদি যাও তো মাথায় করে নিয়ে যাই—

হেসে ফেলে নরোত্তম দাস। বলে, ওবে বাস্, একেবারে মাথায়?

মাথায় থাকতে যদি অপছন্দ হয়, না হয় গলায় মালা করেই রাখবো!

বলো কি, একেবারে মালা করে?

কণ্ঠে দোলায়ো না মালা
সাবধান করি
ভুজঙ্গ হইলে মালা,
দংশনে বিষম জ্বালা
নরোত্তমের সইবে না তা
বন্ধু এই মিনতি করি।

সইবে, সইবে—চলোই না দেখবে!

বেশ, বেশ—

বেশ নয়, বলো আজই যাবে?

আজই!

হ্যাঁ—

এত তাড়-ঘড়ি—

হ্যাঁ, একবার মিলেছে যখন, আর কি আমি ছাড়ি!

সাধু! সাধু! যাবো, যাবো বন্ধু—

নরোত্তমের এই প্রতিজ্ঞা
তোমায় যাবো না ছাড়ি !

সত্যিই নরোত্তম যতদিন সমন্তনারায়ণ জীবিত ছিলেন, তাঁর আশ্রয় ছেড়ে কোথাও যায়নি।

সেই রাত্রেই উৎসব-শেষে নরোত্তম সেই যে সমন্তনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গৃহে গিয়ে উঠেছিল, দীর্ঘ বারোটা বছর সেইখানেই থেকে গিয়েছিল।

সহসা উভয়ের আলোচনাটা চাপা পড়ে গেল ঃ কর্নেল সাহেব, ব্যারন অফ পলাশী—

ক্লাইভ, ক্লাইভ এসে গেছেন !

হুম্‌রো, হুম্‌রো, হুম্‌রো…

পালকি এসে সদরে থামতেই হন্তদন্ত হয়ে কর্নেল সাহেবের প্রসাদ-লোভীর দল ছুটে গেলেন, সর্বাগ্রে নকু ধর।

মহারাজ রাজবল্লভ, নয়ানচাঁদ, দেওয়ান রামচরণ ইত্যাদি।

সসম্মানে ব্যারন অফ পলাশীকে বাইরের ঘরে নিয়ে আসা হলো।

আট-দশটা ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। বাঈ-নাচ চলেছে আসরে। রূপার পাত্রে করে বিলাতী কারণ নিয়ে আসা হলো।

তারপর একসময় অনেক রাত্রে দেশীয় উৎসবে আনন্দ পান করে বাঙালী খানা চেখে পালকিতে করে দমদমার বাগানবাড়িতে আবার কর্নেল সাহেব ফিরে গেলেন।

॥ ৪ ॥

দিন কারো জন্য বসে থাকে না। কালচক্র আপন পরিক্রমায় ঘুরে চলে।

ভাগীরথীর তীরভূমিতে নতুনের পদসঞ্চার ঘটে।

ইতিহাসের পাতায় আঁচড় পড়ে নতুন নতুন অধ্যায়ের, নতুন নতুন ঘটনাবলীর। আর ভাগীরথীর তীরভূমিতে কলকাতা শহরের আয়নায় মুখ রেখে ভারতবর্ষ প্রতিদিন দেখতে থাকে তার ক্রম পরিবর্তিত নব নব চেহারাটা।

ক্লাইভের দেওয়ানী আমল শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে— শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেও ঘটেছে পরিবর্তন। এবং বাংলাদেশের গভর্ণরের গদিতে পর পর ভেরেলেস্ট ও জন কার্টিয়ারের পরে এসে উপবিষ্ট আজও ওয়ারেন হেস্টিংস।

এ সেই বীরশ্রেষ্ঠ হেস্টিংস সাহেব, যিনি সিরাজের কাশিমবাজার আক্রমণের সময় প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে কান্তমুদির আশ্রয়ে নিজেকে গোপন করেছিলেন।

মুশকিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়।
হেস্টিংসে কি খেতে দিয়ে প্রাণ রাখা যায়।
ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ ॥
সূর্যোদয় হলো আজি পশ্চিম গগনে।
হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে ॥

কান্তবাবু কিন্তু ঠকেননি সেদিন হেস্টিংসকে আশ্রয় আর চিংড়ি মাছ, কাঁচালঙ্কা সহযোগে পান্তাভাতের ডিনার দিয়েও, কারণ গভর্ণরের গদিতে বসেই কোম্পানির দেওয়ানীপদে অভিষিক্ত করেছিলেন হেস্টিংস কান্তবাবুকে।

সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতায় এক জায়গায় লেখা আছে ঃ গভর্ণর হেস্টিংসের আবাসগৃহ ছিল নাকি শহরে বরন কোম্পানির অফিস-বাড়িতে।

প্রত্যহ মধ্যরাত পর্যন্ত সেই আবাসগৃহে জ্বলতো চোখ-ঝলসানো ঝাড়-লণ্ঠনের আলো। আর সেই আলোয় হেস্টিংসের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্বেতাঙ্গিনী বারনেস ইনহফ্ মধ্যরাত পর্যন্ত নাচে আর গানে গুলজার করে রাখতেন।

বিলাসী হেস্টিংস কিন্তু প্রত্যহ একই আবাসে রাত্রিবাস করতেন না।

বাংলার মসনদের অধীশ্বর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কখনও রাত কাটাতেন তাঁর বিলাস-গৃহ হেস্টিংস হাউসে আলিপুরে, কখনও বা রিষড়া, কাশীপুর বা সুখচরের বাগানবাড়িতে। কখনও এখানে কখনও ওখানে একাদিক্রমে তেরোটা বাড়িতে রাত কাটতো তাঁর।

হেস্টিংসের কালের ইতিহাস তো নয়, সুদীর্ঘ তেরোটা বছর ধরে একটানা ভোগ-লালসা, অর্থগৃধ্নুতা ও রক্তশোষণের কুৎসিত কেচ্ছা।

শোষণ, শোষণ আর শোষণ। উঃ সে এক দিন। মন্বন্তরের হাহাকার বাংলাদেশের চারিদিকে।

সেই দুর্দিনেও হেস্টিংস রাজস্ব আদায় করে চলেছেন।

দাও, দাও, দাও—টাকা দাও! আরও টাকা দাও!

একা রামে রক্ষা নেই তায় সুগ্রীব দোসর। গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিং, রাজা নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, রাজা রাজবল্লভ—সব এক একটি ক্ষুদে হেস্টিংস।

আর যারা ঐসব হেস্টিংস-এর চেলা-চামুণ্ডার দলে তারাও বুঝি কেউ কম যায় না। ঐ সুযোগে যে যা পারে হাতিয়ে নেয়।

কিন্তু অর্থের জন্য হেস্টিংস যাই করুক আসলে সত্যিই লোকটা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কর্মচারী ছিল। তাই তার ক্রমশ পদন্নোতিও হতে থাকে।

গভর্নরের পদ থেকে একেবারে গভর্নর জেনারেল। সেই সঙ্গে তার বার্ষিক আয়টাও একেবারে গিয়ে পেঁছায় আড়াই লক্ষ টাকায়।

বেশ জাঁকিয়ে বসেছে তখন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস বাহাদুর তার সদস্যদের নিয়ে—রিচার্ড বারওয়েল, ক্লেভারি কর্নেল মনসন ও ফিলিপ ফ্রানসিস।

রাজস্ব আদায়ের নব নব সব ব্যবস্থা, সিভিল সার্ভিস, পুলিসী ব্যবস্থা, বাংলা ও বিহারকে আঠারোটা জেলায় ভাগ করে—তাদের অধিকর্তা হিসাবে সব কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা, কলকাতার সদর ও দেওয়ানী আদালত—কত কি?

সব কথাই সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতায় পাতায় লেখা আছে। এবং তারই মধ্যে একজায়গায় লেখা আছে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির

কথাটিও।

মহারাজ নন্দকুমার রে
তোর রাজ্যপাট জমিদারি কারে দিলি রে।

এবং অনেক কিছুর সঙ্গে হেস্টিংস-এর রাজত্বকালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারটা, তার অর্থ আর সম্মানের লালসা, পরশ্রীকাতরতা, পাপ আর কুৎসিত প্রতিহিংসাপরায়ণতারই স্বাক্ষর দেবে চিরদিন ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

সুমন্তনারায়ণও তখন অর্থ ও লালসার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছেন।

লক্ষ্মী যখন দেন দু-হাত নাকি উজাড় করেই দেন! ঘর-বাড়ি, আত্মীয়, আপনার জন, সংসার—সব কিছু থেকে নিস্পৃহ ও জীবনের সমস্ত স্নেহ মায়া মমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে এক একক নিঃসঙ্গ জীবন অর্থোপার্জনের নেশায়। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত অর্থের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন, তার পর সন্ধ্যায় দিকে চলে যান ক্যাথারিনের গৃহে।

অর্থ উপার্জনের নেশা আর শ্বেতাঙ্গিনী ক্যাথারিনের ঘর।

সেখানেও যান তিনি বুঝি ক্যাথারিনের চাইতেও নিশ্চিন্ত অবসরে মনের খুশিতে মদ্যপানের নেশাতেই। সন্ধ্যার পর থেকে সারাটা রাত ধরেই বলতে গেলে তখন চলে মদ। আকণ্ঠ পান করে একেবারে সুমন্তনারায়ণ যেন বুঁদ হয়ে যেতেন।

বিদেশিনী ক্যাথারিন সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে বুঝি সুমন্তনারায়ণকে ভালবেসেছিল। এবং শুধু ভালবাসাই নয়, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল হিন্দু নারীর এক অদ্ভুত সংস্কার ও ভালবাসা সুমন্তনারায়ণকে ঘিরে। বিদেশিনীর রক্তে হিন্দুর সে সংস্কার শুধু আশ্চর্যই নয় অভূতপূর্বও নয়।

আর সেই সংস্কারের চোখেই সুমন্তনারায়ণকে সে হৃদয়ের এমন এক জায়গায় বসিয়েছিল যেখানে বুঝি তার আপনার বলতে আর কিছুই বাকি রাখেনি সে। সুমন্তনারায়ণকে ভালবেসে শুধু যে সে তাঁর স্বামী ও দেশকেই ভুলেছিল তাই নয়, জন্মগত তার সংস্কারকেও বুঝি বিস্মৃত হয়েছিল।

আর সেই কারণেই তার শয়নকক্ষে বসে সুমন্তনারায়ণ যখন পাত্রের পর পাত্র মদ গলায় ঢালতেন, ক্যাথারিন প্রথমটায় তাকে বাধা দেবার, মদ্যপান থেকে নিবৃত্ত করবার অনেক চেষ্টা করেছে।

কিন্তু সুমন্তনারায়ণ তার কোন কথাতেই কান দেননি। হস্তধৃত পাত্র এক চুমুকে নিঃশেষ করে আবার নতুন করে পূর্ণ করে নিয়েছেন।

মদের পাত্রধৃত সুমন্তনারায়ণের উদ্যত হাতখানি চেপে ধরে ক্যাথারিন বলেছে, please stop it—আর খেয়ো না—

সুমন্তনারায়ণ নেশায় ঢুলুঢুলু চক্ষু দুটি ক্যাথারিনের মুখের উপরে তুলে বলেছেন, খাবো না, কেন খাবো না!

অত খেলে যে শরীর ভেঙে যাবে!

কিছু হবে না রিন, তুমি দেখে নিও।

হবে, তুমি বুঝতে পারছো না মাই ডিয়ার।

খুব বুঝতে পারছি।

কখনও হয়তো ক্যাথারিন বলেছে, কিন্তু এভাবে মদ খেয়ে কি লাভ বল তো ?

লাভ! লাভ আবার কি! শহরের বড় বড় লোকেরা, সকলের চোখে গণ্যমান্য যারা তারা সবাই খায়, তাই আমিও খাই।

কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?

কি বলছো রিন, সম্পর্ক নেই ? লোকে একথা শুনলে বলবে কি! তাদের টাকা আছে, আমারও টাকা আছে—তারা মদ্যপান করে, আমিও করি।

তোমার বুঝি অনেক টাকা সুমন্ত ?

অনেক, অনেক—তুমি নেবে, কত চাও ?

আমি কিছুই চাই না।

চাও না, কিছুই তুমিও চাও না ?

ঢুলু ঢুলু নেশায় লাল চোখ দুটি তুলে যেন পরম বিস্ময়ে সুমন্তনারায়ণ তাকিয়েছেন ক্যাথারিনের মুখের দিকে।

ক্যাথারিন টাকা চায় না! ক্যাথারিন বোকা নাকি! এ দুনিয়ায় টাকা চায় না এমন লোক আছে নাকি!

আবার জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি চাও ?

কিছু না।

কিছুই তুমি চাও না রিন ?

কি চাইবো, সবই তো আছে আমার।

তবু তুমি চাও।

না।

কেন তুমি চাও না রিন ? অন্তত আর কিছু না চাও টাকা তো সবাই চায়—

কি করবো আমি টাকা নিয়ে ?

কেন জমাবে, দু হাতে খরচ করবে!

না। I don't require any money !

তবে—তবে তুমি কি চাও ক্যাথারিন ?

আমি—আমি শুধু তোমাকেই চাই।

আমাকেই চাও ? হা হা করে কৌতুকে হেসে উঠেছেন সুমন্তনারায়ণ।

ক্যাথারিন নাকি টাকা চায় না! এর চাইতে আর বিস্ময়কর কৌতুক কি হতে পারে! সে তাকে চায়!

কিন্তু ধর, আমি যখন মরে যাবো তখন তো তোমার টাকার দরকার হবে রিন ?

না, দরকার হবে না।

সত্যি বলছো ?

প্রত্যুত্তরে ক্যাথারিন কোন জবাব দেয়নি। শুধু তার শ্বেতশুভ্র রক্তাভ চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে নিঃশব্দে একটি ক্ষীণ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়েছে।

নেশার ঘোরে তার সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানির দিকে তাকিয়ে সুমন্ত-নারায়ণের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারপর হয়তো এক সময় শয্যার উপরে এলিয়ে পড়েছেন সুমন্তনারায়ণ।

নেশার ঘোরে বিড় বিড় করে বলেছেন. রিন টাকা চায় না! কেন চায় না!

আর ক্যাথারিন নির্বাক পাষাণ-পুত্তলীর মত নেশায় জ্ঞানহারা, পার্শ্বে শায়িত সুমন্তনারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বাকী রাতটুকু ভোর করেছে।

ঘরের প্রজ্বলিত দেওয়ালগিরির আলোকে ম্লান করে খোলা জানালাপথে ভোরের আলো এসে একসময় উঁকি দিয়েছে।

ক্যাথারিনের নিদ্রাহীন চক্ষু দুটি যখন জ্বালা করতে শুরু করেছে, সে উঠে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি দু ফোঁটা জল তার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে।

কোন্ দূর সাগরপারের একটি নারী—ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কারে আবদ্ধ নেশাগ্রস্ত এক পুরুষের জন্য বুঝি তার ক্রাইস্টের কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতই নেশা করুন না কেন সারাটা রাত ধরে সুমন্ত-নারায়ণ ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। শয্যার উপর উঠে বসে প্রথমেই তার নজরে পড়েছে জানালার কাছে পাষাণ-প্রতিমার মত নিশ্চল দণ্ডায়মান ক্যাথারিনের দিকে।

আর সেই মুহূর্তে লজ্জায় যেন মাথা তুলতে পারেননি সুমন্তনারায়ণ। চুপি চুপি চোরের মত পা টিপে টিপে ঘর থেকে যেন পালিয়ে বেঁচেছেন সুমন্তনারায়ণ।

সেখান থেকে সোজা চলে গেছেন একেবারে গঙ্গার ঘাটে। সমস্ত শরীরে তখন মদ্যপানের জ্বালা আর ক্লান্তি।

গঙ্গার শীতল জলে ডুবের পর ডুব দিয়ে সে জ্বালা জুড়িয়েছে।

সিক্তবস্ত্রে সোজা চলে এসেছেন একেবারে গৃহে। তারপর বস্ত্র পরিবর্তন করে গিয়ে প্রবেশ করেছেন শ্যামসুন্দরের মন্দিরে।

বাড়িতে তখনও কারো একটা বড় নিদ্রাভঙ্গ হয়নি একমাত্র সুরধুনী ব্যতীত।

সুরধুনী প্রত্যহ রাত থাকতেই শয্যা ত্যাগ করে, বাসি বস্ত্র পরিবর্তন করে চলে আসতো শ্যামসুন্দরের মন্দিরে।

মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশের তার কোন অধিকার ছিল না। বাইরে অপ্রশস্ত মন্দিরের চাতালে সে চুপচাপ বসে থাকতো নিমীলিত নেত্রে।

সুরধুনী সুমন্তনারায়ণের দিকে না তাকালেও সুমন্তনারায়ণ তাকালেন অদূরে উপবিষ্ট নিমীলিতচক্ষু সুরধুনীর দিকে। ক্ষণেকের জন্য বুঝি

স্তব্ধ হয়ে দাড়াতেন সুমন্তনারায়ণ।

ক্ষণেকের জন্যই বুঝি মানসপটে তাঁর ভেসে উঠলো মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে দেখে আসা অন্য এক গৃহের বাতায়ন-প্রান্তে পাষাণ-প্রতিমার মত দণ্ডায়মান অন্য এক নারীর প্রতিচ্ছবি। তার পর ধীরে ধীরে গিয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

বিশ্বরূপার মন্দিরে বড় একটা প্রবেশ করতেন না সুমন্তনারায়ণ এবং কদাচিৎ কখনো প্রবেশ করলেও প্রতিমার মুখের দিকে তাকাতেন না। কিছুতেই তিনি যেন ভুলতে পারতেন না পাষাণ-চত্বরে সে-রাত্রের রক্তচিহ্নের কথা।

প্রিয় বন্ধু, কবি নরোত্তম এক দিন বলেছিল, মায়ের মন্দিরে তো কখনও তোমাকে প্রবেশ করতে দেখি না সুমন্ত?

জবাবে বলেছেন সুমন্তনারায়ণ, পারি না ও সর্বনাশীর মুখের দিকে তাকাতে। তাকালেই মনে হয় যেন ক্ষুধার্ত লালসায় ওর চক্ষু দুটি জ্বলছে। চার হাত মেলে যেন ও আমার সর্বস্ব গ্রাস করতে চাইছে।

এ তোমার ভুল সুমন্ত।

ভুল!

নিশ্চয়ই। মায়ের আমার অভাব কি যে তোমার কাছে হাত পাতবেন? স্বয়ং মহেশ্বর মার দুয়ারে ভিখারী—তার কি কিছু অভাব আছে ভাই?

সে তুমি যতই বল বন্ধু, ওঁর ক্ষুধিত জিহ্বাই আমার সর্বস্ব একদিন জঠরে টেনে নেবে। রক্ত দিয়ে গুরুদেব ওঁর বুকে রক্তের তৃষ্ণা জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আমি নিশ্চিত জানি আমার সর্বস্ব না গ্রাস করে ওঁর সে তৃষ্ণা মিটবে না। আমি হয়তো সেদিন বেঁচে থাকবো না কিন্তু রাধারাণীকে সে তৃষ্ণা একদিন মেটাতেই হবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন হয়তো সুমন্তনারায়ণ। নচেৎ তাঁর কথা অমন অক্ষরে অক্ষরে ফলেই বা যাবে কেন?

কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। সে সময়টা চলেছে সুমন্তনারায়ণের একাদশে বৃহস্পতির কাল বুঝি।

প্রকৃতপক্ষে হেস্টিংসের কালে যেমন রাজস্ব-সংগ্রহের কঠোর বিধিব্যবস্থা থেকেই বণিকের মানদণ্ডের বদলে ক্রমশ ধনিকের রাজদণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে একটা কালো কঠিন ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছিল, তেমনি কলকাতা শহরের বুকে নব্য ধনী বাবুমশাইদের এক শ্রেণীর ক্রম-বিস্তৃত আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তনারায়ণেরও প্রতিপত্তি ও ধনৈশ্বর্যের চাকচিক্যটাও ক্রমশ যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছিল।

সমস্ত বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র যেন তখন ফিরিঙ্গীদের হাতে গড়ে তোলা নয়া কলকাতা শহর।

বাংলাদেশের প্রাণৈশ্বর্য যা এতকাল বাংলার গ্রামে গ্রামে ছিল ছড়িয়ে, এবারে যেন সেই সব ছড়ানো প্রাণৈশ্বর্য একত্রীভূত হচ্ছে এসে ক্রমশ ভাগীরথীর তীরভূমি নয়া শহর কলকাতায়।

নবদ্বীপের শিক্ষার ভিত্তিকেন্দ্র টোলগুলি ক্রমশ আসছে তখন ঝিমিয়ে—একে একে নিভছে দেউটি যেন।

জ্ঞানের বর্তিকা জ্বলে উঠেছে হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় কলকাতা শহরে। হুগলীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। করিৎকর্মা পঞ্চানন কর্মকার হেস্টিংসের উৎসাহে কাঠের অক্ষরগুলি খোদাই করে দিয়েছেন। মাদ্রাসা, এশিয়াটিক সোসাইটি, একে একে কত কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হেস্টিংসের আমলটা যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ আর অষ্টাদশ শতাব্দীর হত্যা, ধ্বংস, অত্যাচার-পর্বে ভরা ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ।

ঐ সময়টা সুমন্তনারায়ণের জীবনেরও বেশ এক সন্ধিক্ষণ! অর্থ সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে এলো আর এক নারী।

মুন্নাবাঈ।

মাত্র মাস দুই পূর্বে ক্যাথারিনের মৃত্যু ঘটেছে। ক্যাথারিনের মৃত্যুর শেষ মুহূর্তের সেই দৃশ্যটা সুমন্তনারায়ণ অনেক দিন ভুলতে পারেননি। ক্যাথারিনের গর্ভে তাঁর সন্তান এসেছে কথাটা যেদিন সর্বপ্রথম সুমন্তনারায়ণ জানতে পারলেন, কেমন একটা অহেতুক অর্থহীন ভয়ে ও আশঙ্কায় যেন সিঁটিয়ে উঠেছিলেন।

কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল সেদিন, ক্যাথারিনের গর্ভের সন্তান মানে তাঁরই সন্তান। তাঁরই পরিচিতি বহন করে সে আসছে।

ক্যাথারিনের সে কি আনন্দ! কি নাম রাখবে তার সে, কার মত সেই সন্তান দেখতে হবে—তার মা ক্যাথারিনের মত না তার বাপ সুমন্তনারায়ণের মত? কি সন্তান হবে—ছেলে না মেয়ে?

কিন্তু সুমন্তনারায়ণের তখন অন্য চিন্তা। ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, তারই ঔরসজাত সন্তান যখন সে একদিন সেই দাবিতেই কন্দর্প, রূপবতী, হৈমবতী ও অন্যান্য সন্তানদের পাশে গিয়ে সে, দাঁড়াবে। রায়বংশের অন্যান্য বংশধরদের মেনে নিতেই হবে তার জন্ম-স্বত্ব। নচেৎ ক্যাথারিনই বা মানবে কেন, আর তিনিই বা কি বোঝাবেন ক্যাথারিনকে?

এ হিন্দুদের বাঙালী মেযে নয়, ইংরাজ-দুহিতা। আর স্বামী-জ্ঞানেই ক্যাথারিন দেহ দান করেছে তাকে। কিন্তু সমাজ তো সে প্রেমকে মেনে নেবে না। সংস্কার তো সে দাবিকে গ্রাহ্য করবে না। বলবে জারজ, অবৈধ সন্তান।

ক্যাথারিনের গৃহে যাওয়াই কমিয়ে দিলেন সুমন্তনারায়ণ।

ক্যাথারিন শুধায়, তুমি আজকাল রোজ আস না কেন ডার্লিং?

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান সুমন্তনারায়ণ, বলেন কাজের ঝামেলায় সময় বড় পাই না।

শুধু ক্যাথারিনের ওখানে আসাই নয়, মদ্যপানও যেন কমিয়ে দিয়েছিলেন

সুমন্তনারায়ণ ঐ সময়টায়।

খুব খুশী ক্যাথারিন সুমন্তনারায়ণের মাত্রা কমেছে বলে।

কিন্তু সুমন্তনারায়ণ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন।

সুমন্তনারায়ণের রোজনামচায় আবার লেখা ঐসময়কার কথা।

সরলা নিষ্পাপ রিন, সে যদি তখন ঘুণাক্ষরে জানতে পারতো তাকে নিয়ে কি দ্বন্দ্ব তখন দিবারাত্র আমার মনের মধ্যে চলেছে। যে সন্তান তার গর্ভে এসেছে বলে তার আনন্দের অবধি ছিল না, আমি মনের মধ্যে অহোরাত্র তার সেই সন্তানের মৃত্যুকামনা করছি—যদি সে জানতে পারতো!

ঘুণাক্ষরেও যদি সে আমার তখনকার মনের পাপ চিন্তাটা টের পেত!

দিন যত যেতে থাকে, আসন্ন মাতৃত্বের চিহ্ন যত তার শরীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, আমার অস্থিরতাও যেন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশ্চর্য, কেন যে সেদিন অমন করে ক্যাথারিনের সন্তান-সম্ভাবনায় আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম ভেবেই পাই না!

কি ক্ষতি হতো যদি ক্যাথারিনের সেই সন্তানকে আমি স্বীকৃতি দিয়ে যেতাম! কিন্তু আজ আর সে কথা ভেবে কি লাভ? যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। ভূত চেপেছিল—সত্যিই সেদিন আমার মাথায় বুঝি ভূতই চেপে-ছিল, নইলে—উঃ, কেমন করে এতবড় নৃশংস আমি সেদিন হলাম।

হাসি হাসি মুখে সেরাত্রে সে যে আমার হাত থেকেই গ্লাসটা তুলে নিয়েছিল।

সবটুকু শরবৎ খেতে হবে?

হ্যাঁ—

কিন্তু মিষ্টি খেতে যে আমার ভাল লাগে না ডার্লিং—

খেয়েই দেখো না, ভাল লাগবে।

কথাটা বলতে গিয়ে গলাটা আমার কেঁপে উঠেছিল কি?

এক চুমুকেই গ্লাসের সমস্ত শরবৎটা সে গলাধঃকরণ করেছিল।

কেমন লাগলো? ভয়ে ভয়ে শুধালাম। গলাটা কাঁপছিল আমার।

একটু তেতো-তেতো যেন।

বাইরে সেদিন দোল-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র। আলোয় আলোয় বিশ্ব যেন ঝলমল করছে। আমার বুকে মাথা দিয়ে শুয়েছিল ক্যাথারিন।

তার পর—তার পর ঠিক আধ ঘণ্টাও হয়নি, সহসা ক্যাথারিন সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কি! বুকটা আমার যেন জ্বলে যাচ্ছে ডার্লিং!

কি—কি হলো ক্যাথারিন?

মাথার মধ্যে কেমন করছে, বুকটার মধ্যে যেন কেমন করছে ডার্লিং! দম—দম বন্ধ হয়ে আসছে! কোথায়—কোথায় তুমি ডার্লিং? এ কি, চোখে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। হোয়াই—হোয়াই সো

ডার্ক ! অসহায় ভীত সেই সময়কার ক্যাথারিনের দু চোখের দৃষ্টি। সুমন্ত, ডার্লিং—কোথায়, কোথায় তুমি ? কেন তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না ?

আমি শুধু তখন তাকিয়ে নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে।

তার পরই শয্যার উপরে লুটিয়ে পড়ল ক্যাথারিন। সুকোমল তনু তার তীব্র বিষের ক্রিয়ায় আক্ষেপে ধনুকের মতই বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে তখন। চোখ দুটো ঠেলে বের হয়ে এসেছে। কি ভয়াবহ সে মুহূর্তে তার সেই চোখের দৃষ্টি ! শঙ্খধবল মুখখানি নীল হয়ে গিয়েছে !

এ কি ! এ কি করলাম ? চীৎকার করে উঠলাম সহসা যেন পাগলের মতই, ক্যাথারিন, ক্যাথারিন—

শেষবারের মতই যেন তার দেহটা ধনুকের মত বেঁকে স্থির হয়ে গেল। দু হাতে ক্যাথারিনের দেহটা ধরে পাগলের মতই ঝাঁকাতে লাগলাম—ক্যাথারিন, ক্যাথারিন—আমি তোমাকে বিষ দিয়েছি।

কিন্তু শেষ—সব শেষ !

তার পর সেই রাত্রেই বাড়ির পশ্চাতে বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে নিজের হাতে গর্ত খুঁড়ে মাটি দিলাম আমার ক্যাথারিনকে।

শেষ চাপড়া মাটি যখন চাপা দিচ্ছি সহসা চমকে উঠলাম, কে যেন ঠিক আমার পাশেই চাপা গলায় ফিস্ ফিস করে ডাকলো, ডার্লিং !···

কে ?

শেষ রাতের পাণ্ডুর চন্দ্রালোকে কৃষ্ণচূড়ার গাছের চিকন চিকন পাতাগুলো সিপ্ সিপ্ করে শব্দ করছে। সিপ্ সিপ্ শব্দ নয়, ক্যাথারিনই যেন চাপা গলায় ডাকছে, ডার্লিং, ডার্লিং, ডার্লিং···

সকলে জানলো ক্যাথারিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

শেষ মুহূর্তের ক্যাথারিনের সেই মৃত্যু-বিভীষিকা এবারে যেন দিবারাত্র ছায়ার মতই সুমন্তনারায়ণকে অনুসরণ করে ফিরতে লাগলো।

বাগানবাড়ির তালাচাবি বন্ধ হয়ে পড়েছিল তার পর দীর্ঘ দুই মাস। ওদিকে ভুলেও পা বাড়াননি সুমন্তনারায়ণ।

প্রতিপত্তি ও অর্থসাচ্ছল্যের সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তনারায়ণের বাড়িটা তখন আত্মীয়স্বজন ও লোকজনে গম গম করে সর্বদা।

শুধু সুন্দরী কাঠের ব্যবসা নয়, অন্যান্য ব্যবসায়ও হাত দিয়েছেন তখন সুমন্তনারায়ণ। সমস্তটা দিন কাজকর্মের ব্যস্ততায় সব কিছুই যেন ভুলে থাকেন, কিন্তু রাত্রি যত বাড়তে থাকে, নিদ্রাহীন দৃষ্টির সামনে ততই যেন ক্যাথারিনের মৃত্যু-মুহূর্তের যন্ত্রণাকাতর বোবা চোখের রক্তাভ মণি দুটো স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

কানের পাশে কে যেন সারাটা রাত ফিস্ ফিস্ করে ডাকে, ডার্লিং ডার্লিং···

কখনও বহির্মহলের পাষাণচত্বরে, কখনও মন্দিরের পাষাণ-চত্বরে সুমন্তনারায়ণ ভূতগ্রস্তের মত একাকী ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

সুমন্তনারায়ণের পরিবর্তনটা কারোরই দৃষ্টি এড়ায় না।

রাধারাণী শুধায়, কি হয়েছে তোমার বল তো?

কেন, কি আবার হবে! প্রত্যুত্তর দেন সুমন্তনারায়ণ।

সুরধুনী শুধায় কি হলো তোমার রায় মশাই?

কিছু তো নয়!

তাই যদি তো রাত্রে ঘুমাও না কেন? সারাটা রাত অমনি করে ভূতের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াও কেন?

এক-একবার সুমন্তনারায়ণের মনে হয়, অন্তত একজন—ওই সুরধুনীর কাছে সব অপরাধ স্বীকার করে হৃদয়ের দুঃসহ পীড়নটা লাঘব করেন, কিন্তু পারেন না। সুরধুনীর চোখের দিকে চাইলেই যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যেত।

ঐ সময় একদিন রাত্রে—রাজা রাজবল্লভের বাগবাজারের বাড়িতে বাঈ-নাচের আসরে গিয়ে ঘটনাচক্রে পরিচয় হয়ে গেল মুন্নাবাঈয়ের সঙ্গে।

নর্তকী, বাঈজী মুন্নাবাঈ।

॥ ৭ ॥

সুরা ও সাকী

গিয়েছিনু কলিকাতা যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা
হা বিধাতা, এই হলো শেষে।
ভদ্রলোকের ছেলে যত কদাচারে সদা রত সুরাপান অবিরত
কত মত কুচ্ছ দেশে দেশে।

॥ ১ ॥

হেস্টিংসের পদত্যাগের পর লর্ড কর্নওয়ালিসের যুগ সেটা। শাসন-সংস্কারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগ।

ধনিক জমিদার সম্প্রদায়ের অর্থলালসা, কুৎসিত অত্যাচার, কেচ্ছা ও বেলেল্লাপনার যুগ। ক্ষমতার স্বৈরাচারের যুগ।

প্রজারা খাজনা দেবে না, হাঁকাও তাদের মাথায় লাঠি, ঘরে তাদের সুন্দরী-বৌ-ঝি আছে, নিয়ে এসো তাদের জোর করে ধরে জমিদারের রংমহলে জলসা-ঘরে। পোড়াও তাদের ঘরবাড়ি। কাঁদুক তারা ক্ষতি নেই।

আর কলকাতা শহরের বুকে হাফ-আখড়াইয়ের আসর, বুলবুলি ওড়ানো, যাত্রা-পার্টির হৈ-হল্লা, মদ আর মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ আর মদ। আর সব মিথ্যে, সব ভুয়ো। সংস্কার তো নয়, কুৎসিত একটা স্বৈরাচার।

বিত্তবানের দল সব, বুর্জোয়া।

বাঈনাচের আসর বসেছে •্রাজের খাসকামরায়। চারপাশে ইয়ার-বকসী মোসাহেব ও পরান্নভোজী অনুগ্রহপ্রার্থীর দল। সুমন্তনারায়ণও এক-পাশে উপস্থিত।

নেশায় ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটি মেলে বাঈজীর মুখের দিকে অত্যুজ্জ্বল ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিলেন।

শুধু তিনিই নন, মধ্যে মধ্যে গান গাইতে গাইতে বাঈজীও বিলোল আড়-কটাক্ষে তাকাচ্ছিল সুমন্তনারায়ণের মুখের দিকে।

বাঈজীর মুখখানিতে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা পরিচিতির আদল রয়েছে। চেনা চেনা অথচ চেনা নয়।

এক সময় গান শেষ হলো।

বাহবা, বাহবা! কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!

মদ্যপূর্ণ সুদৃশ্য বেলোয়ারী কাচ-পাত্রটি হাতে নিয়ে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

সহসা মৃদু কোমল চাপা নারী-কণ্ঠে চমকে পাশে তাকালেন সুমন্ত-

নারায়ণ।

নমস্তে বাবুজী!

নমস্তে। কি নামটি তোমার বাঈ?

অধীনার নাম মুন্নাবাঈ।

ভারী মিষ্টি কণ্ঠস্বরটি তোমার বাঈ।

আপকো মেহেরবানি! কিন্তু তখন থেকে অত শরাব কেন পান করছেন বাবুজী!

তুমি শরাব পান করো না বাঈ?

না।

একটু খাবে?

মৃদু হাস্যে বিলোল কটাক্ষ হেনে মুন্না বলে, না। তার পরই একটু থেমে মুন্না বলে, রাত যে অনেক হলো, বাড়ি যাবেন না?

বাড়ি!

হ্যাঁ।

না, যাবো না।

কেন বাড়িতে বৌ নেই বুঝি?

বৌ!

হাঁ, স্ত্রী নেই আপনার?

আছে।

তবে যান, নইলে তিনি যে চিন্তা করবেন।

না—সে চিন্তা কোনদিনও করেনি, আজও করবে না।

সে রাত্রে পালকিতে চেপে সুমন্তনারায়ণ যখন গৃহে ফিরলেন, ত্রিযামা রাত্রি তখন উদয়-দিগন্তে একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ ঘটনারই দিন দুই বাদে আবার ক্যাথারিনের পরিত্যক্ত শূন্যগৃহের কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলে উঠলো। বাঈনাচের আসর বসবে। মুন্নাবাঈ আসছে।

ঢালোয়া ফরাসে ইয়ারবকসীদের নিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসলেন সুমন্ত-নারায়ণ। ঝাড়লণ্ঠনের আলোর রোশনাই। গাজীপুরের গোলাপজল আর বাদশাহী আতরের গন্ধে ঘরের বাতাস যেন মাতাল হয়ে ওঠে।

গান ধরে মুন্নাবাঈ—

এ বড় চতুর চোর
গোকুল নন্দকিশোর।
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে
চিত চুরি কৈল মোর!
আহা মরি রে! আহা মরি!

কোকিলকণ্ঠী মুন্নাবাঈ।

সবাই আসরে মদ্যপানে বিভোর। মদের পাত্র স্পর্শও করেন না সুমন্ত-নারায়ণ। তিনি পান করেন মুন্নাবাঈয়ের কণ্ঠসুধা সেরাত্রে কেবল।

গানশেষে কৌতুকভরা দৃষ্টি হেনে মুন্নাবাঈ শুধায়, মদ খাচ্ছেন না যে বাবুমশাই!

জবাবে বলেন সুমন্তনারায়ণ, আবার গাও মুন্না!

কি গাইবো বলুন?

যা তোমার খুশি—

গান ধরে আবার মুন্নাবাঈ—

পিরিতি নগরে বিষমো সখি!
মনচোরে রোখ ভয়! বসতি হইতে দায়।
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মন অমনি হারিয়ে লয়।
সন্ধান করিয়ে মনোচোর, ভ্রমিছে নগরময়!
কুলেরো বাহির হয়ো না, থেকো সাবধানে লো সদয়॥

এবারে ইয়ারবকসীরা বলে ওঠে, খিস্তি, খিস্তি খেউড় গাও বাঈ।

মাপ করবেন বাবুজী! ও আমার জানা নেই, তাছাড়া আজ আমি বড় শ্রান্ত, এবারে ছুটি চাই।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—

অতঃপর সবাই বিদায় নেয়।

আসর খালি।

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল ঝাউবাতির আলোর নীচে বসে শুধু মুখোমুখি দুজন।

সুমন্তনারায়ণ আর মুন্নাবাঈ।

দুজনে চেয়ে দুজনের মুখের দিকে অপলক।

সহসা এক সময় মুন্নাবাঈ বলে, আমার এবারে যাবার ব্যবস্থা করে দেন বাবুজী।

কিন্তু তোমাকে যদি আর যেতে না দিই মুন্না?

যেতে দেবেন না আজ!

শুধু আজ নয়, যদি আর কোন দিনই না যেতে দিই?

সে আপনার মেহেরবানি! কিন্তু আমাকে ধরে রেখেই বা আপনার কি লাভ বাবুজী!

লাভ অ-লাভ জানি না, আমার ইচ্ছা তুমি এখানেই থাকো।

কিন্তু আমাকে কি আপনি ধরে রাখতে পারবেন বাবুজী!

তোমার কি মনে হয় বাঈজী?

আমার?

হ্যাঁ—

আমার মনের কথা আর নাই বা শুনলেন! তাছাড়া মনই আমার নেই তো মনের কথা!

কিন্তু আমার কথার তো জবাব পেলাম না বাঈজী !

কোন কথার ?

তুমি থাকবে কিনা ?

থাকবো।

সত্যিই থেকে গেল মুন্নাবাঈ।

ক্যাথারিনের সেই বাগান-বাড়িতেই মুন্নাবাঈ থেকে গেল।

কবি নরোত্তম তখন থাকে সুমন্তনারায়ণের বহির্বাটির একটি কক্ষে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাবু-সাজে সাজগোজ করে পাল্কি চেপে বেরুচ্ছেন সুমন্তনারায়ণ। সারা গায়ে বাদশাহী আতরের খুসবু। মাথায় টোরি, হাতে সোনাবাঁধানো বাহারে ছড়ি।

নরোত্তম শুধালো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, প্রিয়া অভিসারে নাকি !

হ্যাঁ, যাবে ? মৃদু হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেন সুমন্তনারায়ণ।

না, তুমিই যাও।

কেন চলো না।

না।

চলো আমার মুন্নার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো তোমার।

না।

চলো, চলো—

একপ্রকার জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন মুন্নাবাঈয়ের কুটিরে নরোত্তমকে সুমন্তনারায়ণ।

আলাপ হলো নরোত্তম আর মুন্নাবাঈয়ের।

ঢালা ফরাস পাতা। সম্মুখে মদের পাত্র। কিছুদিন থেকে আবার সুমন্তনারায়ণ মদ্যপান শুরু করেছেন।

মদের পাত্রে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে সুমন্তনারায়ণ শুধোলেন, কেমন দেখছো কবি মুন্নাকে ?

মৃদু হেসে নরোত্তম বলে ঃ

বিধি যদি নাহি হতো বাম,
সোনার পিঞ্জর গড়ি
রাখিতাম ও প্রেমপাখী
কণ্ঠে দুলায়ে রে,
রাধা রাধা বুলি শুনিতাম।
কিন্তু বিধি মোর বাম
অভাগা এ নরোত্তম
বৃথা নাম কাম ॥

হেসে ওঠেন সুমন্তনারায়ণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। বলেন, বল কি কবি ?

লজ্জায় অধোবদনা হয় মুন্নাবাঈ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মুন্নাবাঈ এবং

ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই নরোত্তম আবার বলে ওঠে ঃ

যামিনী না হতে শেষ
যেও না যেও না—
মিনতি নরোত্তমের
শোন কমলিনী
পিয়াসী ভ্রমর মুঁই
অনুমতি যদি পাই
ও রাঙা চরণ ছুঁই।

কিন্তু তথাপি দাঁড়ায় না মুন্নাবাঈ। সূক্ষ্ম রেশমী শাড়ির ঝলমলানি তুলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সুমন্তনারায়ণ মৃদু হেসে হস্তধৃত মদের পাত্রে আবার চুমুক দেন।

সহসা ঐ সময়ে বাগান-বাড়ির রাতজাগা প্রহরারত হিন্দুস্থানী দারোয়ানের সঙ্গীতসুধা নৈশ বাতাসে ভেসে আসে।

গাড়ি ঘোড়া লোনা পানি, আউর রাণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়।
এস্মে যো বঁচে মোসাফির, মৌজ করে কলকাত্তা হ্যায়।

সুমন্তনারায়ণ মুচকি হেসে বলেন, ব্যাটা রসিক আছে!

প্রাপ্তেসু ষোড়শবর্ষে।

অতএব রাধারাণীর ইচ্ছা পুত্র কন্দর্পনারায়ণের এবার বিবাহ দেবে।

কথাটা একদিন স্বামীকে বলতে সুমন্তনারায়ণ বললেন, বেশ তো, উপযুক্ত সর্বসুলক্ষণাপাত্রী পাওয়া যায় তবে তো।

তা কি ঘরে বসে থাকলেই হবে নাকি! সন্ধান করতে হবে না? মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে রাধারাণী।

তা বেশ তো! বললে—এবার অনুসন্ধান নেবো।

রাধারাণী পুত্রের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেবার ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠার বিশেষ একটা কারণ ঘটেছিল বৈকি। কিন্তু মুখে সেটা বলতে স্বামীর কাছে সাহস পাচ্ছিলেন না। পুত্রের চরিত্রে পিতার রীতিনীতি বর্তানো স্বাভাবিক। ভয়টা সেই দিকেই বেশী ছিল, তাই সে নিজের একটি উপযুক্ত বধূর সন্ধানে খোঁজখবর নিচ্ছিল সর্বদা এবং পেয়েছিলও একটি মেয়ের সন্ধান।

তাই সে বলে, হুঃ, তুমি নেবে সন্ধান! দিনরাত তো কাজেই ব্যস্ত, তার পর হয় ঘুরি-ওড়ানো, না-হয় বুলবুলির লড়াই, আর না-হয় বাঈজী নিয়ে মদ্যপান!

না, না—সত্যিই আমি সন্ধান নেবো।

থাক, অত কষ্ট আর তোমায় করতে হবে না। আমিই সন্ধান দিচ্ছি তোমায়—

ও, তাহলে তুমি ইতিমধ্যেই সন্ধান পেয়েছো! তা সে কথা বললেই তো পারতে!

হ্যাঁ, শ্রীরামপুরের নুটু মুখুজ্জের শুনেছি একটি পৌত্রী আছে। দেবী-প্রতিমার মত রূপ—

তা দেখেছো নাকি সে কন্যাটিকে?

দেখেছি বৈকি, মায়ের বাড়িতে সেদিন পূজো দিতে গিয়ে দেখেছি। খোঁজ-খবরও নাও—

বেশ নেবো।

নেবো নয়—আজই সরকারমশাইকে পাঠাও।

পাঠাবো।

সুমন্তনারায়ণ সন্ধান নিয়ে জানলেন, কুলে মেলে একেবারে পাল্টি ঘর। নুটু মুখুজ্জের অবস্থা যদিও তত ভাল নয়, কিন্তু অবস্থা দিয়ে কি হবে, সুমন্তনারায়ণের অভাব কি!

তাছাড়া কন্দর্প তাঁর তো ঐ একমাত্র পুত্রই এবং তাঁর শেষ কাজ।

তিন কন্যারই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে কঙ্কাবতী মৃতা। তার সাত বৎসরের কন্যা নির্মলা তখন তাঁরই কাছে। রূপবতী ও হৈমবতীও স্বামীর ঘরে। মাত্র বৎসর দুই পূর্বে হৈমবতীর বিবাহ হয়েছে এবং সেও একটি কন্যার জননী তখন।

নুটু মুখুজ্জের ত্রয়োদশী পৌত্রী রাজেশ্বরীকে দেখে যেন দু-চোখের পলক পড়ে না সুমন্তনারায়ণের।

এত রূপ কি মানুষের দেহে সম্ভব! গরীবের কুঁড়েঘরে এ যে কৌস্তুভ-মণি!

সুমন্তনারায়ণ বললেন, জন্মপত্রিকাতে যদি মিল হয় তো এ বিবাহ হবে।

নুটু মুখুজ্জে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

মা-বাপ-মরা জনমদুঃখিনী তাঁর পৌত্রী রাজেশ্বরীর এত সৌভাগ্য কি সত্যিই হবে!

সিংহ রাশি কন্দর্পনারায়ণের, দেবগণ, মিথুন লগ্নে জন্ম।

কন্যার নরগণ, মীন রাশি, কর্কট লগ্ন।

জন্মপত্রিকা গণনা করে কুলগুরু করালীশঙ্কর বলে পাঠালেন রাজযোটক। এ বিবাহ হলে আনন্দের হবে।

অতএব আর বাধা কোথায়!

॥ ২ ॥

একমাত্র পুত্র কন্দর্পনারায়ণের শুভবিবাহের দিনটি বিশেষভাবেই চিহ্নিত হয়েছিল সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতায়।

কারণ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, কলকাতা শহরের এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, সেদিনকার ভাগীরথীর তীরভূমি কলকাতা শহরের সুধীজনসমাজে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথিকৃৎ স্যার উইলিয়াম জোন্স সেদিন মারা যান।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গাভ্যন্তর থেকে সেই অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একের এর এক তোপধ্বনি হচ্ছে মিনিটে মিনিটে।

বিরাট শবযাত্রা চলেছে ফৌজী বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, আর সেই শবযাত্রায় মিলিত হয়েছেন এসে বিচারপতির দল, ব্যারিস্টার, এটর্নী ও উচ্চ কর্মচারীরাই শুধু নয়, শহরের যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জনসাধারণও। মাথা নীচু করে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে মন্থরপদে চলেছে সব শবযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে।

আর ওদিকে তখন সুমন্তনারায়ণের বিরাট গৃহ শঙ্খ উলুধ্বনি ও শতকণ্ঠের আনন্দ-কলকাকলীতে মুখর।

সুমন্তনারায়ণের একমাত্র পুত্র কন্দর্পনারায়ণের বিবাহ। গরীবের ঘরের কন্যা, কিন্তু ধনী সুমন্তনারায়ণের একমাত্র পুত্রবধূ, তাই নিজ ব্যয়ে রাজেশ্বরীর সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে এনেছেন সুমন্তনারায়ণ।

আবক্ষ গুণ্ঠন টেনে দুধে-আলতায় পা দুখানি সিক্ত করে রায়বাড়ির আঙ্গিনার উপর দিয়ে হেঁটে গেল বধূ।

বিরাট সামিয়ানার নীচে চলেছে কলকাতার বাঈনাচ আমোদের হুল্লোড়।

তারই মধ্যে একসময় গৃহ থেকে নিঃশব্দ সবার অলক্ষ্যে বের হয়ে গেলেন সুমন্তনারায়ণ। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। উৎসব-বাড়ি। আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব ও আমন্ত্রিতদের ভিড়ে এমন একটি নিভৃত স্থান নেই যেখানে বসে নিশ্চিন্তে দু-এক পাত্র মদ্যপান করতে পারেন।

তাছাড়া শ্রীমতী রাধারাণীর ভয়ে গৃহে বসে মদ্যপান বহুদিন পূর্বেই সুমন্তনারায়ণ ত্যাগ করেছিলেন।

গ্রীষ্মকাল সেটা। বৈশাখের শেষ। ত্রয়োদশীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক মধ্যে মধ্যে ইতস্তত সঞ্চরণশীল মেঘে ঢাকা পড়ছে।

গায়ে মাত্র একখানি উড়ুনি, হনহন করে হেঁটে চলেন সুমন্তনারায়ণ হালসীবাগানে তাঁর বাগানবাড়ির দিকে।

মুন্নাবাঈ একাকিনী তার শয়নকক্ষের মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে বীণটা কোলের কাছে নিয়ে সুরালাপ করছিল।

সুমন্তনারায়ণ এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই তাঁর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

এ কি! তুমি!

হ্যাঁ, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। ওঘর থেকে বোতল আর পাত্র নিয়ে এসো তো!

ছিঃ ছিঃ! আজ যে তোমার পুত্রের বিবাহ!

পুত্রের বিবাহ তো হয়েছে কি? শাস্ত্রে কোথাও লেখা আছে কি এইদিন মদ্যপান নিষিদ্ধ! যাও নিয়ে এসো।

না, ওসব আজ তোমার পান করা চলবে না।

কি জানি কেন মুন্নাবাঈকে ঘাঁটাতে আর সাহস হল না সুমন্তনারায়ণের।

ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। পাশের ঘরে এসে মদ্যপান শুরু করলেন।

রাত বাড়তে থাকে। সুমন্তনারায়ণও পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করতে থাকেন।

তবু তো কই তৃষ্ণা নিবারিত হয় না!

সহসা একসময় কানের কাছে কে যেন ফিস ফিস করে ডাকে, ডার্লিং!

কে? রিন—কোথায় তুমি?

এই যে—এই যে আমি!

সাদা শাড়ি পরতে ক্যাথারিন ভালবাসতো, সুমন্তনারায়ণ যেন দেখলেন প্রতিরাত্রের মত তেমনি সাদা শাড়ি পরে ক্যাথারিন তাঁর অনতিদূরে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতছানি দিয়ে তাঁকে সে ডাকছে।

নেশায় টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন সুমন্তনারায়ণ।

এসো!

কোথায়?

এসো!

এগিয়ে চলেন সুমন্তনারায়ণ।

ক্যাথারিন এগিয়ে চলেছে। সুমন্তনারায়ণ তাকে অনুসরণ করেন।

উদ্যানে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটাব নীচে অন্ধকারে গিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল ক্যাথারিন প্রতিরাত্রের মতই আবার।

ওঠো! ওঠো!

কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে ক্যাথারিনের কবরের উপর মুখগুঁজে কাঁদছিলেন বুঝি সুমন্তনারায়ণ।

মুন্নাবাঈয়ের ডাকে মুখ তুললেন।

ঘরে চল।

হাত ধরে মুন্নাবাঈ নিয়ে এল সুমন্তনারায়ণকে আবার ঘরে।

যত্ন করে শয্যার উপর শুইয়ে দিল।

ঘরের কোণে প্রদীপাধারে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে মিটিমিটি। প্রদীপের ক্ষীণ আলো মুন্নাবাঈয়ের মুখেব অর্ধাংশে এসে পড়েছে।

চেনা, চেনা—বড় চেনা লাগে যেন মুন্নাবাঈয়ের ঈষৎ প্রদীপের আলোয় আলোকিত মুখখানা।

কে তুমি?

ঘুমোও। ক্লান্ত তুমি।

সুমন্তনারায়ণ এবার উঠে বসলেন শয্যার উপর। আবার প্রশ্ন করলেন, কে তুমি সত্যি করে বল!

কে আবার! আমি মুন্নাবাঈ!

না, তোমার সত্য পরিচয়টা বল!

বললাম তো আমি মুন্নাবাঈ।

না, তুমি মুন্নাবাঈ নও।

তবে কে ?

তুমি, তুমি—বলতে বলতে শয্যা থেকে অবতরণ করে প্রদীপাধার থেকে জ্বলন্ত প্রদীপটা তুলে নিয়ে এসে আরো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুন্নাবাঈয়ের মুখখানা দেখতে লাগলেন জ্বলন্ত প্রদীপটি তার একেবারে মুখের সামনে ধরে।

পারলে চিনতে আমাকে ! মৃদু হাসে মুন্নাবাঈ।

হ্যাঁ—

কে বল তো ?

তুমি, তুমি—হ্যাঁ, তোমাকে আমি চিনি, তোমাকে আমি চিনি—কিন্তু—কিন্তু—

মুন্নাবাঈ সহসা মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

চিবুকে হাত দিয়ে মুন্নাবাঈয়ের মুখখানি নিজের দিকে ফেরাতেই এবারে চমকে উঠলেন সুমন্তনারায়ণ।

নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা মুন্নাবাঈয়ের গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

কাঁদছো ?

মুন্না কোন সাড়া দেয় না।

কি হয়েছে মুন্না, তুমি কাঁদছো ?

কিছু তো হয়নি।

বলবে না ?

শুনবে আমার ইতিহাস ?

শুনবো।

কিন্তু সে ইতিহাস শুনে যদি সহ্য করতে না পারো !

পারবো, তুমি বল।

আজ থাক—আর একদিন বলবো।

না, না—আজ—আজই বলো !

না, এবারে তুমি গৃহে ফিরে যাও, সবাই কি মনে করছেন বল তো ! আজ না তোমার ছেলের বিয়ে !

তা হোক গে, তুমি বলো।

কিন্তু কিই বা শুনবে সে ইতিহাসের ? সে তো কোন নতুন কথা নয় ? হার্মাদ-হস্তে নিপীড়িতা নির্যাতিতা এক হতভাগিনী গৃহস্থ-বধূর কথা !

সহসা যেন সুমন্তনারায়ণ পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত বুকখানা তোলপাড় করে মাত্র একটি শব্দ যেন তখন বের হয়ে আসবার জন্য কণ্ঠে আথালি-পাথালি করছিল সুমন্তনারায়ণের।

হেমাঙ্গিনী ! হেমাঙ্গিনী !

কিন্তু কোন শব্দই বের হলো না তাঁর কণ্ঠ দিয়ে। গলাটা যেন কে সজোরে চেপে ধরেছিল ঐ মুহূর্তে। হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখলেন মুন্নাবাঈ ঘরের খোলা বাতায়নটার সামনে পিছন ফিরে পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ঐ মুন্নাবাঈ যেন তাঁর একান্ত অপরিচিত। দূরের—বহুদূরের এক

নারী। রহস্যের অবগুণ্ঠনাবৃতা এক নারী।

সে রাত্রে আর শোনা হলো না মুন্নাবাঈয়ের কাহিনী। এবং শুধু সেরাত্রে কেন, কোনদিনই সে কাহিনী শোনবার ভাগ্য হয় নি সুমন্তনারায়ণের।

দরজার বাইরে নরোত্তমের কন্ঠস্বর শোনা গেল, সুমন্তনারায়ণ।

কে ? কবিয়াল—এসো এসো ?

এ কি ব্যাপার ! গৃহে আজ তোমার একমাত্র পুত্রের বিবাহোৎসব আর তুমি এখানে !

মুন্নাবাঈযের জীবনকথা শোনবার জন্য সুমন্তনারায়ণের মনের মধ্যে যেমন একটা অত্যুগ্র বাসনা ছিল, ঠিক তেমনি বুঝি একটা ভীতিও ছিল মনের কোথাও সঙ্গোপনে। বিশেষ করে পরিচয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলেই মুন্না-বাঈয়ের রক্তাভ বঙ্কিম ওষ্ঠপ্রান্তে যে রহস্যপূর্ণ হাসিটি ফুটে উঠতো, সেদিকে তাকালেই যেন সুমন্তনারায়ণের সমস্ত শরীর কেমন হিম হয়ে যেত।

মুন্নার কোমরে সর্বদা গোঁজা থাকতো একটি সুতীক্ষ্ণ সাদা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা বাঁকানো ছুরি।

মুন্নার ঐ হাসিটা যেন চকিতে সুমন্তনারায়ণকে তার কোমরে গোঁজা বাঁকানো ছুরিটার কথাই মনে করিয়ে দিত।

মুন্নাবাঈ সুমন্তনারায়ণের কাছে ধরা দিয়েও ধরা দেয়নি কোন দিন। পরস্পরের মাঝখানে ছিল যেন ঐ বাঁকানো ছুরিটা !

মদের রঙিন নেশায় নয়, সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থাতেই দু-বাহু বাড়িয়ে সুমন্তনারায়ণ একদিন- মাত্র একদিনই মুন্নাবাঈকে বক্ষে টেনে নেবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কৌশলে নিজেকে সুমন্তনারায়ণের উদ্যত আলিঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, চকিতে কোমরে গোঁজা ধারালো বাঁকানো ছুরিটা বের করে বলেছিল মুন্নাবাঈ, দেখছো এটা কি ! এতে বিষ মাখানো থাকে সর্বদা !

উন্মত্ত লালসায় সুমন্তনারায়ণ তখন বুঝি দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য। তাঁর স্ফীত প্রশস্ত রোমশ বক্ষ ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের তাড়নায় দ্রুত ওঠা-নামা করছে তখন।

কিন্তু এতটুকু যেন ভয় পায়নি মুন্নাবাঈ।

মুন্নাবাঈ !

ছিঃ, এ দেহটার দিকে আর হাত বাড়িও না—অনেক ক্লেদ, অনেক পাপ এসে জমে আছে।

মুন্নাবাঈ !

না, না, আমি বলছি এ দেহটা তোমার কাছে নতুন নয়।

কে—কে তুমি ? সহসা যেন পাগলের মতই চিৎকার করে উঠেছিলেন সুমন্তনারায়ণ।

প্রত্যুত্তরে হেসে জবাব দিয়েছিল মুন্নাবাঈ, বল তো কে !

তুমি—তুমি—

সেই গো, সেই—বলতে বলতে আবার সেই বিচিত্র রহস্য-কৌতুকভরা হাসি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল মন্নাবাঈ।

কে!

কেউ না। একটা গান শুনবে?

না।

বীণ বাজাই?

না।

আমি খুব ভাল নাচতে জানি, নাচবো?

না।

তবে হাসি?

না।

তবে কি কাঁদবো নাকি গো? শোন, কবি নরোত্তমের একটা গানে সুর দিয়েছি, বলতে বলতে সুললিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে মন্নবাঈ পরক্ষণেই—

জীবন গেল কাঁদিতে
নিঠুর কৃষ্ণ পিরীতে,
(এবে) পরাণ জ্বলে
অঙ্গ জ্বলে
জীবন যায় গো জ্বলিতে।

মন্নাবাঈ, চুপ করবে তুমি? চেঁচিয়ে ওঠেন সুমন্তনারায়ণ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মুন্না তখন গাইছে—

পিরীতের এই তো হলো সার—
শুধু নিলাম কলংক
বিষের জ্বালা আর।
নরোত্তম কহে তাই—
এত জ্বালা পিরীতে
কেন আগে জানি নাই
তাহলে কি এ কাঁটার মালা
কণ্ঠেতে দোলাই॥

চোখে প্রবহমাণ অশ্রুর ধারা, ওষ্ঠে হাসি, কণ্ঠে গীত—সে এক মনোমোহিনী রূপ মন্নাবাঈয়ের।

মন্নাবাঈকে ঘিরে সহসা উদ্দীপ্ত কামনার অত্যুগ্র শিখা কখন যে এক সময় ধীরে ধীরে সুমন্তনারায়ণের অশান্ত বক্ষে আপনা থেকেই নির্বাপিত হয়ে আসে নিজেও বুঝি তিনি টের পান না।

ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়ে মদের পাত্র নিয়ে বসেন। পাত্রের পর পাত্র তরল অগ্নি গলায় ঢালতে থাকেন। কিন্তু তাতে তো এই বুকের জ্বালা নেভে না।

জীবনের শেষ দুটি বৎসর সুমন্তনারায়ণের মদ্যপানের মাত্রা এত অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কিবা রাত্র কিবা দিন পাত্রের পর পাত্র মদ নিঃশেষ করে যেতেন কেবল। দিবানিশি কেবল মদ্য আর মদ্যপান। ধীরে ধীরে ঐসময় একমাত্র পুত্র কন্দর্পনারায়ণের হাতে তিনি তাঁর ব্যবসা ও কাজকারবার একটু একটু করে তুলে দিয়েছেন। দিন ও রাত্রির বেশীর ভাগ কাটতো তখন তাঁর বাগানবাড়িতে মুন্নাবাঈয়ের ওখানেই।

সুমন্তনারায়ণের বিরাট সেই দশাসই চেহারাটাও তখন আর যেন নেই। নেই তাঁর সেই তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গাত্রবর্ণ। মুখে ও সর্বাঙ্গে যেন কালি ঢেলে দিয়েছিল। সমস্ত গা-ভর্তি কিসের ঘা। কুৎসিত, জঘন্য। মধ্যে মধ্যে মুখের কথা জড়িয়ে যায়। ডান পা-টা কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছে, কষ্টে টেনে টেনে চলেন।

ঐ সময়টা গৃহে না যাবার আরও একটা কারণ ছিল সুমন্তনারায়ণেব। রাধারাণীর সামনে কখনও পড়ে গেলে তিক্ত চাপা কণ্ঠে রাধারাণী বলে উঠতো, সরে যাও সরে যাও, তোমার দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা করে। ছিঃ ছিঃ—প্রচণ্ড ঘৃণা যেন রাধারাণীর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়তো।

বাঘের মতই গর্জে উঠতে চাইতেন সুমন্তনারায়ণ। কিন্তু পারতেন না, দুর্দান্ত শার্দুল তখন ভীরু মার্জারে পরিণত হয়েছে। চোরের মতই পালিয়ে যেতে যেন পথ পেতেন না সুমন্তনারায়ণ রাধারাণীর সামনে থেকে।

ঐসব কথা অবিশ্যি সুমন্তনারায়ণের রোজনামচায় নেই। বেশির ভাগই শোনা বিভূতির সদু ঠাকরুনের মুখে। সদু ঠাকরুনের অবশ্য শোনা বিকৃত-মস্তিষ্কা অশীতিপরা মাতামহী রাধারাণীর মুখে, তার আক্ষেপোক্তি থেকে এবং নির্মলাদির মুখ থেকে। বিভূতি জানে এ সেই পর্তুগীজ গঞ্জালেস, কার্ভালো প্রভৃতিদের অবাধ ব্যাভিচারের অনিবার্য বিষক্রিয়া।

এদেশে রক্তে রক্তে মিশিয়ে দেওয়া দুরারোগ্য সেই ফিরিঙ্গী ব্যাধি।

গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।

সে রোগের বিষ সুমন্তনারায়ণের সারা গায়েই ফুটে বের হয়নি, শেষের দিকে তাঁর সর্বাঙ্গের গৌরবর্ণ ত্বককে কুৎসিত তো করেছিলই এবং সে বিষ কন্দর্পনারায়ণের রক্তের মধ্যেও প্রবাহিত করে তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধারার গোমুখীকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল চিরদিনের মতই। হতভাগ্য কন্দর্পনারায়ণের প্রজনন-শক্তিটুকু নিষ্ঠুর বিষাক্ত জিহ্বায় লেহন করে নিয়ে তাকে বন্ধ্যা, চিররুক্ষ করে দিয়েছিল যেন সেই ভয়াবহ পিতৃদত্ত ব্যাধির বিষক্রিয়া।

আর সেই অভিশাপের গুরুদণ্ড বহন করে হতভাগিনী রাজেশ্বরী বিষ আর কলঙ্কের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে বুঝি নিষ্কৃতির পথ খুঁজেছিল, মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি মুক্তি মিলেছিল সেই হতভাগিনীর?

মেলেনি!

আর তাই বুঝি ইহলোকের বুক-ভরা অতৃপ্ত কামনার দুর্নিবার আকর্ষণে নিশিরাতের অন্ধকারে রায়বাড়ির প্রাসাদে, অলিন্দে, চত্বরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই রায়বাড়ির হতভাগিনী বধু। কাউকে দেখতে পেলেই গুণ্ঠন টেনে চকিতে এদিকে ওদিকে মিলিয়ে গিয়েছে।

শুধু মিলিয়ে যায়নি রাধারাণীর দুই চক্ষুর দৃষ্টির সামনে থেকে।

ভয়াবহ একটা বিভীষিকার মত চক্ষে অগ্নিঝরা দৃষ্টি সর্বক্ষণ রাধারাণীর, দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে তাকে অনুসরণ করে ফিরেছে।

ভয়ে চক্ষু বুজে চিৎকার করে উঠেছে রাধারাণী, না না—ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্ মা তুই আমাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠেছে প্রেতিনী।

দু হাতে চোখ ঢেকে কেঁপেছে আর চেঁচিয়ে উঠেছে রাধারাণী।

ছুটে এসেছে হৈমবতী, বলেছে, কি—কি হলো মা ?

দেখতে পাচ্ছিস না ? ঐ—ঐ যে—আমার দিকে চেয়ে হাসছে সর্বনাশী !

কই, কোথায় কে ? এ ঘরে তো কেউ নেই।

কেউ নেই ! কি বলছিস তুই, দেখছিস না সামনে দাঁড়িয়ে !

সারারাত ঘুমোও না, জেগে জেগে কেবল সব দুঃস্বপ্ন দেখ ! শুয়ে একটু ঘুমোও তো !

হৈমবতী মাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতো। কিন্তু ঘুমোতে পারতো না রাধারাণী। চোখ বুজলেই সেই বিভীষিকা, সেই অভিশাপ, সেই হাসি !

হৈমবতীর কন্যা সদু—সোদামিনী।

সোদামিনীর মা হৈমবতী সিঁথির সিঁদুর মুছে, হাতের নোয়া খুইয়ে, মাত্র ছয় বৎসরের সোদামিনীকে বুকে নিয়ে চলে এসেছিল পিতৃগৃহে।

সদু তার মায়ের সঙ্গে ঐ রাধারাণীর শয়নগৃহের মেঝেতে শয্যা পেতে শুতো। খুব শিশুকালের স্মৃতি হলে কি হবে, সে সব দিনের স্মৃতি সোদামিনী কোন দিন বুঝি ভুলতে পারেন নি।

রাতের পর রাত বিকৃতমস্তিষ্কা রাধারাণীর সেই আতঙ্কভরা চিৎকার। সারাটা রাত দুই চক্ষু মেলে পালঙ্কে শয্যার উপর বসে থাকে।

সমস্ত মাথার কেশই প্রায় তখন শ্বেতশুভ্র হয়ে গিয়েছে রাধারাণীর। বলিরেখাঙ্কিত মুখের ভিতরে কোটরগত সেই দুটি চক্ষুর বিভীষিকা যেন সোদামিনীর কচি বুকখানার মধ্যে কেটে কেটে বসে গিয়েছিল।

ঘরের কোণে পিলসুজের উপরে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের ম্লান আলো রাধারাণীর সেই সাদা চুল আর বলিরেখাঙ্কিত মুখের উপরে এসে পড়েছে। মনে হতো সোদামিনীর ও যেন কত্তামা নয়। মায়ের মুখে শোনা সেই গল্পের চাঁদের দেশের বুড়ী।

ঐসব গল্প-কাহিনী ছোটবেলায় বিভূতিদের ঐ সদু ঠাকরুনের মুখেই শোনা। শিশুমনের কি আগ্রহ নিয়েই না শুনতো একদিন বিভূতি রায় বাড়ির ঐসব গল্প-কাহিনী সদু ঠাকরুনের মুখ থেকে।

শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতো, আজকের শহর কলকাতা নয়, হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস প্রভৃতির রাজত্ব-কালের সেই ভাগীরথীর তীরভূমির বিচিত্র কলকাতা শহরের বুকে বিরাট ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ রায়বাড়ির প্রকোষ্ঠে সে যেন অসহায় এক বালক, কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বেড়াচ্ছে।

তারপর হয়তো একসময় ঘুম ভেঙে গিয়েছে, দেখেছে অতীতের সে রায়বাড়ি এ নয়, সেই রায়বাড়িরই জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ এক জীর্ণ প্রকোষ্ঠে সে শুয়ে আছে।

রায়েদের আদিপুরুষ পুরুষসিংহ সুমন্তনারায়ণ, যিনি ইঁটের পর ইঁট দিয়ে গেঁথে এই রায়বাড়ির ভিতকে সুদৃঢ় পাকা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে যুগের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে কদাচারের বিষ জড়িয়ে গিয়ে সমাজের মধ্যে ঘুণ ধরিয়েছিল, যার অবশ্যম্ভাবী ফল—সে যুগের অবিদ্যা অকল্যাণ আর অজ্ঞানতা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ও তদানীন্তন সামাজিক কৌলীন্যের শেষের পৃষ্ঠাগুলোকে জর্জরিত করে ফেলেছিল, বিষের সেই ফেনিল আবর্তে রায়-বংশের চিহ্নটুকু পর্যন্ত যে লোপ পেয়ে যাবে, সে কথা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন!

॥ ৩ ॥

সৌদামিনী—সদু ঠাকরুনের মুখেই শোনা বিভূতির। কত্তামা কখনও কখনও আক্ষেপ করে বলতো যে তার স্বামী সুমন্তনারায়ণের পাপেই নাকি রায়-বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। আবার কখনও বলতো, তার নিজের দুর্বুদ্ধিই নাকি রায়-বংশের রক্তে ধ্বংসের বীজ রোপণ করেছিল।

কিন্তু রাধারাণী জানতো না। বোঝেও নি। অবিশ্যি জানবার বা বোঝবার কথা তার নয়। তার বা তার স্বামী সুমন্তনারায়ণের ব্যক্তিগত পাপেই, দুর্বুদ্ধিতে নয়, সে যুগের সমষ্টিগত সমাজের, বিকৃত ধর্মের নামে কদাচারের পাপেই অনেকের সঙ্গে রায়-বংশও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অনিবার্য ভাবে।

আগের যুগের যে বলিষ্ঠ বীরের ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সেই ধর্ম যে ক্রমশ তন্ত্রমতের গুপ্ত-পথে প্রবেশ করে অন্ধকারে গোপনে গোপনে যে কদাচারের বিষ ছাড়িয়েছিল, ও যে তারই অনিবার্য পরিণতি সেটা তো রাধারাণীর বোঝবার কথা নয়। আর রাধারাণী সেটা বুঝবেই বা কেমন করে!

সুমন্তনারায়ণের গোটা জীবনটাই প্রায় বলতে গেলে কেটেছিল অর্থ, নারী ও সুরার সাধনায় এবং ক্যাথারিন ও মুন্নাবাঈ ছাড়াও আরো অনেক নারীই তাঁর নিশিরাত্রের নেশার ঘোরের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। যারা ক্যাথারিন বা মুন্নবাঈ নয়—সামান্যা দেহপসারিণী। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শেষযুগের গতানুগতিক পথেই চলেছিলেন সুমন্তনারায়ণ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে পুণ্যার্জনের চেষ্টাও

যে করেন নি তিনি তা নয়। বিনিখাজনায় ভূদান, গরুদান, কালী-প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়-প্রতিপালন ইত্যাদি পুণ্য কাজও কিছু কিছু করেছেন বৈকি। কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলে সেও তো অর্থের, ঐশ্বর্যের দম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়!

সুমন্তনারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণের জীবনবেদের ধারাটা যদিও পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি, তথাপি পিতৃরক্তের অবশ্যম্ভাবী ঋণশোধ তাকে করতে হয়েছিল বৈকি। যদিচ তার সময়েও ভাগীরথী তীরে নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজ তখনও গড়ে ওঠেনি। তখনও লোকের ধারণা মর্ত্যলোকে মনুষ্য-সমাজের আসল ভিত্তিটাই হচ্ছে অর্থ, নারী ও সুরা। আর অর্থোপার্জনের ব্যাপারটাও কলকাতা শহরে তখন থাকলেই সহজ হয়ে উঠেছে।

ইংরাজ-বণিকই তাদের সে পথের পথপ্রদর্শক তখন।

সেদিনকার কলকাতা সমাজের ঐ একনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনর্থই ঘটিয়েছিল। যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সে যুগের সমস্ত সমাজটা একটা কদর্য, জঘন্য চেহারা নিয়েছিল। অর্থের প্রাচুর্য, ঐশ্বর্যের বিলাস, নারী ও সুরা এবং তাই নিয়ে মাতামাতি, রেষারেষি ও দাপাদাপির সে এক বীভৎস কাণ্ড।

সুমন্তনারায়ণের শেষ জীবনের ঐটাই হচ্ছে পটভূমি। আর সেই পটভূমির আওতার মধ্যে গিয়ে পড়ার জন্য তাঁর পুত্র কন্দর্পনারায়ণও রক্ষা পায়নি।

তবু আশ্চর্য, মনে মনে কন্দর্পনারায়ণ তার পিতার আচার নীতি মত ও পথকে রীতিমত ঘৃণাই করে এসেছে জ্ঞান হওয়া অবধি। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম শ্লোকটা মনে মনে বার বার আউড়েও সে কোনদিন তার পিতার প্রতি একটুও শ্রদ্ধা আনতে পারেনি নিজের মনের কোথাও!

অবশ্য সেজন্য সুমন্তনারায়ণ যতটুকু নিজে দায়ী না থাকুন, তাঁর স্ত্রী রাধারাণী অনেক বেশি দায়ী ছিল। পুত্রকে জ্ঞান হওয়া অবধি পিতার দিকে সে ঘেঁষতে তো দেয়নি, সেই সঙ্গে অহেতুক একটা ভীতির ভাব পুত্রের মনে গড়ে তুলেছিল। ক্রমশ সেই ভীতিটা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছিল।

পিতা তার নারীলোলুপ, সুরাসক্ত, যথেচ্ছাচারী এইটাই সে বুঝেছিল এবং জেনেছিল। শুধু পুত্রকেই নয়, তিন কন্যাকেও রাধারাণী কোনোদিন স্বামীর কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। জীবনের যে বাৎসল্যের আনন্দময় দিকটা, তার আস্বাদ চার-চারটি সন্তানের জনক হয়েও হতভাগ্য সুমন্তনারায়ণ কোন দিনই পাননি। স্ত্রীর প্রেম বা ভালবাসা তো পানই নি, সন্তানের ভালবাসা ও স্নেহও কোনদিন পাননি জীবনে সুমন্তনারায়ণ।

অথচ বুকভরা ছিল সুমন্তনারায়ণের ভালবাসা। পাবার ও দেবার আকাঙ্ক্ষা। যে আকাঙ্ক্ষার পথ ধরেই তাঁর জীবনে এসেছে হেমাঙ্গিনী, সুরধুনী, ক্যাথারিন, মুন্নাবাঈ।

কিন্তু কেউ—কেউ দিতে পারেনি তাঁকে বুঝি সেই আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসার স্বাদ।

শুধু রূপ নয়, হিয়ার পরশের জন্যও বুঝি তাঁর হৃদয়ভরা ছিল এক ব্যাকুল ক্রন্দন। আর তাই বুঝি তাঁর রোজনামচার শুরুতেই তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি' কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর,
হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।

কিন্তু সত্যিই কি সুমন্তনারায়ণ তাঁর জীবনে ভালবাসার স্বাদ পাননি ?

পেয়েছিলেন বৈকি। পেয়েছিলেন।

সুমন্তনারায়ণ তাঁর রোজনামচায় কোথাও সে স্বীকৃতি স্পষ্টভাবে না রেখে গেলেও, তাঁর ছিন্নভিন্ন অসংলগ্ন জীবনলিপির অনেক স্থানেই প্রক্ষিপ্ত রয়েছে সে কথা।

তাঁর জীবনের প্রথম নারী হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে তিনি ভালবাসা পেয়েছিলেন বৈকি। এবং পরবর্তী জীবনে আরো এক নারী তাঁর প্রেমে আপনাকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। সে সুরধুনী।

তবু—তবু তাঁর অতৃপ্তি কেন ? কেন জীবনভোর ঐ বুক-চাপা কান্না ? কেন সারাটা জীবন ধরে একক নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি ? সে কথার জবাব কে দেবে ? তাঁর রোজনামচার পাতাতেও কোথাও তার হদিস পাওয়া যায় না।

তাঁর জীর্ণ জীবনলিপির পাতার পর পাতা পড়তে গিয়ে কেবলই মনে হবে অতৃপ্ত একটা মানুষ যেন বার বার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। কি বলতে গিয়েও যেন বলতে পারছে না। তার মনের নাগাল যেন কেউ পেল না।

দৈব-দুর্বিপাকে হার্মাদদের হাতে হেমাঙ্গিনী অপহৃতা হওয়ার কথাটা জ্ঞান ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন জানতে পারলেন, সেই যে তাঁর বুকের সমস্ত পাঁজরগুলো কাঁপিয়ে হাহাকার একটা জেগেছিল, বাইরের কেউ কোনদিন তা জানতে না পারলেও, পরবর্তীকালে নর্তকী মুন্নাবাঈ প্রসঙ্গে যেন মধ্যে মধ্যে রোজনামচার কোন কোন পাতায় হঠাৎ উঁকি দিয়ে গিয়েছে সে কথাটা।

স্পষ্টই লেখা আছে রোজনামচার শেষাশেষি এক জায়গায় মুন্নাবাঈ প্রসঙ্গ।

গত রাত্রের কথাটা যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে আমার মনের সন্দেহটা হয়তো সত্যিই অমূলক নয়। সর্বনাশী হেমাঙ্গিনী, হার্মাদ-হস্তে নিপীড়িতা, জাতি ও ধর্মচ্যুতা হেমাঙ্গিনী নিশ্চয়ই মরেনি। হয়তো মুন্নাই সেই হতভাগিনী। নচেৎ হেমাঙ্গিনীর প্রেত ঐ মুন্নাবাঈ।

তাই যদি হয় তো হতভাগিনীর মৃত্যু হলো না কেন ? জ্বলতো না হয় জীবনটা এই বুকটার মধ্যে সেই হতভাগিনীর স্মৃতির আগুন। তারপর চিতার আগুনে সেই আগুন একদিন নির্বাপিত হতো। কেউ জানতো না।

ওর হাসি, ওর কথার ভঙ্গি, ওর চাউনি একেবারে যেন হুবহু সেই সর্বনাশীরই।

সমস্ত সন্দেহ আমার মিটে যেত, যদি—যদি একটিবার ওর নাভিমূলটা কোনমতে দেখতে পারতাম। হেমাঙ্গিনীর নাভিমূলের বামদিকে একটা রক্তবর্ণ জরুলচিহ্ন ছিল।

কিন্তু দেখবো কি করে, গায়েই ও আমাকে আজ পর্যন্ত হাত দিতে দিলে না। এক-একবার তাই ইচ্ছা যায়, ক্যাথারিনের মত ওকেও বিষ দিয়ে হত্যা করে তারপর ওর বস্ত্রাবরণটা সরিয়ে দেখি আমার সন্দেহ সত্য কিনা। এ সংশয়ের মধ্যে আর কাটাতে পারছি না।

কিন্তু সুমন্তনারায়ণের মনে যতই সংশয় থাক, বিভূতি হলপ করে বলতে পারে, সুমন্তনারায়ণের রোজনামচার পাতায় যেটুকু মুন্নাবাঈ সম্পর্কে লেখা আছে এদিক ওদিক, তা থেকেই মুন্নাবাঈয়ের মধ্যে একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে আর কেউ নয়—সুমন্তনারায়ণের হারানো হেমাঙ্গিনীই।

কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বৎসর আগে হার্মাদ-হস্তে লুণ্ঠিতা হেমাঙ্গিনী যে কেমন করে মুন্নাবাঈয়ের মধ্যে রূপান্তরিত হলো সেটাই থেকে গিয়েছে অস্পষ্ট, আবছা ধোঁয়াটে।

হয়তো এমনও হতে পারে হার্মাদরা লুণ্ঠিতা হেমাঙ্গিনীকে কোন একদিন সুতানুটির হাটে বিক্রি করেছিল কোন ধনী ক্রেতার কাছে ক্রীতদাসীরূপে। এবং ক্রমশ একদিন হয়তো সেই ক্রীতদাসীই রূপান্তরিত হয়েছিল মুন্না-বাঈতে। তবে আবার দুজনের যোগাযোগটা যে বিচিত্র তাতে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। আর তার চাইতেও বিচিত্র বোধ হয় নারীর মন। নইলে যে হেমাঙ্গিনী সুমন্তনারায়ণের মত পুরুষকেও ভালবাসা দিয়ে বশীভূত করেছিল, সেই হেমাঙ্গিনী কেমন করে, কোন্ লজ্জায় পরবর্তীকালের কালামুখী মুন্নাবাঈয়ের মধ্যে বেঁচে রইলো। এবং কি আশাতেই বা সে বেঁচে ছিলো?

আবার একদিন সুমন্তনারায়ণকে দেখবে বলে কি?

তাই যদি হয় তো সুমন্তনারায়ণকে দেখবার পরও কেন বেঁচে রইল সে? কি-ই বা প্রয়োজন ছিল? অবিশ্যি সুমন্তনারায়ণের মৃত্যুর পর মুন্নাবাঈয়ের কোন সন্ধানই নাকি আর পাওয়া যায়নি।

পিতার রক্ষিতা মুন্নাবাঈয়ের কথা কন্দর্পনারায়ণ জানতো।

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর একদিন কন্দর্পনারায়ণ গিয়েছিল নাকি বাগানবাড়িতে নর্তকীকে তাড়িয়ে দিয়ে বাগানবাড়ির দরজায় তালা দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর তার কোন সন্ধানই পায়নি। বাগানবাড়ির সেখানকার যা সাজানো-গোছানো তেমনই পড়ে আছে, কেবলই নেই সেখানে মুন্নাবাঈ।

এমন কি বাগানবাড়ির নীচের একটি ঘরে—যেখানে তাঁর পিতৃসখা

কবিয়াল নরোত্তম দাস থাকতেন সে ঘরটিও খালি।

দারোয়ান বললে, মাইজী তো নেহি হ্যায়!

কোথায় গেল?

কেয়া জানে?

যাবার সময় তোকে কিছু বলে যায়নি?

নেহি তো!

কন্দর্পনারায়ণ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মাকে সব কথা বললে।

কেননা মায়ের নির্দেশেই সে বাগানবাড়ি থেকে মুন্নাবাঈকে বিতাড়িত করতে গিয়েছিল।

যাই হোক, সুমন্তনারায়ণের মৃত্যুর পর মুন্নাবাঈয়ের আর কোন সংবাদ পাওয়া না গেলেও দুটি দিনের দুটি ঘটনা যতই অস্পষ্ট ও রহস্যময় হোক না কেন, বিভূতির ধারণা আরো দুবার সেই হতভাগিনীকে দেখা গিয়েছিল।

প্রথমটি হচ্ছে, সুমন্তনারায়ণের মৃত্যুর পর শবযাত্রীরা যখন তাঁর পুষ্প-মাল্যভূষিত মৃতদেহটা বহন করে গঙ্গাতীরে নিয়ে চলেছে, বিভূতির সদু ঠাকরুন—সৌদামিনী দেবীর মুখেই শোনা, কার মুখে পরবর্তীকালে তিনি যেন শুনেছিলেন, কে নাকি পুরনারীদের মধ্যে দেখেছিল, সর্বাঙ্গ একটি চাদরে আবৃত ও আবক্ষগুণ্ঠন কে এক নারী দূর থেকে শবযাত্রীদের পিছু পিছু চলেছে নিঃশব্দে!

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আরো বছর দুই পরবর্তীকালের ঘটনা।

রাধারাণী তখন রায়বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী। লৌহকঠিন হাতে সে তখন সংসারের রাশটা টেনে ধরেছে। এ ঘটনাটা সৌদামিনীর মুখেই শোনা। তিনি শুনেছিলেন কঙ্কাবতীর বিধবা কন্যা তাঁর নির্মলাদিদির মুখে। ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে নির্মলা উপস্থিত ছিল।

সাগরসঙ্গম থেকে পুণ্যস্নান সেরে ফিরেছে কন্দর্পনারায়ণ-জননী রাধারাণী দেবী ঐ দিনই। সারাটা দিন আত্মীয়স্বজন আশ্রিতের দল ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখাশোনা ও কুশলবার্তার পর রাধারাণী তার নিজস্ব কক্ষে বসে বিশ্রাম করছে, পাশে বসে নির্মলা পদসেবা করছে। সন্ধ্যার পর। এমন সময় দাসী জানালো, একজন স্ত্রীলোক কত্তামার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভ্রূকুটি করে ক্লান্ত কণ্ঠে শুধালো রাধারাণী, কে আবার এসময় দেখা করতে চায়! ভিক্ষে চায় বোধ হয়! বৌমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে দিগে যা—

দাসী বললে, সে কথা বলেছিলাম মা, কিন্তু সে বললে, সে নাকি ভিক্ষে চায় না।

ভিক্ষে চায় না তবে কি চায়?

তা কেমন করে বলবো?

কি জাত?

তা তো জানি না।

কি ভেবে রাধারাণী বলে, যা এই ঘরেই পাঠিয়ে দিগে যা।

এই ঘরে !

হ্যাঁ, যা—

একটু পরেই অবগুণ্ঠনবতী এক শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা নারী দরজাপথে কক্ষে এসে প্রবেশ করলো।

কক্ষমধ্যাস্থিত মৃদু দীপালোকে তাকালো রাধারাণী আগন্তুকার দিকে।

আশ্চর্য 'আপনি' বলে সম্বোধন না করে আগন্তুকা নারী অবগুণ্ঠনের তল থেকে মৃদু কণ্ঠে বললে, তোমাকে দেখতে এলাম—

বিস্মিতা রাধারাণী অবগুণ্ঠনবতীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আমাকে দেখতে এলে ! কিন্তু তোমায় তো চিনলাম না, কে তুমি, কোথা থেকেই বা আসছো ?

কে আমি !

হ্যাঁ—আর ঘোমটা টেনেই বা রয়েছো কেন ? এ ঘরে তো কোন পুরুষ নেই ?

মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস যেন শোনা গেল।

কিন্তু শুধু মুখ দেখেই কি আমাকে তুমি চিনতে পারবে ? বলতে বলতে বাঁ হাত দিয়ে মাথার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল নারী।

বয়েস হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তবু যেন নির্মলার মনে হয়েছিল, ঐ মুখ-পঙ্কজের বুঝি সত্যিই তুলনা হয় না ! রূপের যেন সীমা-পরিসীমা নেই !

চিনতে পেরেছিলো কিনা রাধারাণী কে জানে ? কিন্তু কেমন যেন চমকে উঠেছিল।

কে ? কে তুমি ?

একটু যেন চেনা-চেনা লাগছে, তাই না রাধা ?

রাধারাণী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাকুল কণ্ঠে পুনর্বার প্রশ্ন করে, বল, বল কে তুমি ?

কে আবার, আমি কেউ নই ! আচ্ছা চলি—

কথাটা বলেই আর ক্ষণমাত্রও দাঁড়ায়নি সেই রহস্যময়ী নারী। ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করে দাসীর নাম ধরে ডেকেছিল রাধারাণী, শ্যামা, শ্যামা—না, গঙ্গা, গঙ্গা—

ছুটে আসে শ্যামা আর গঙ্গা, কি—কি হলো মা ?

একটু আগে যে এঘরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, দেখ্ তো, দেখ্ তো—সে কোথায় গেল ! যেমন করে হোক তাকে ধরে নিয়ে আয় !

শ্যামা আর গঙ্গা দাসী ছুটে বের হয়ে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এসে বললে, কোথাও দেখতে পেলাম না মা তাকে।

পেলি না ?

না।

॥ ৪ ॥

কিন্তু বলছিলাম সুমন্তনারায়ণের মৃত্যুর কথা।

সুমন্তনারায়ণ যখন মারা যান নির্মলার বয়স তখন পনের বৎসর। নির্মলার কাছ থেকে সে সব দিনের কাহিনী সৌদামিনী শুনেছেন কতবার।

বড় ভালবাসতো নাকি নির্মলাদিদি সৌদামিনীকে।

নির্মলাদি বলতো, সুমন্তনারায়ণকে কে নাকি কি খাইয়েছিল তাতেই সুমন্তনারায়ণের সর্বাঙ্গে ঘা ফুটে বেরিয়েছিল। রোগশয্যার পাশে কেউ যেত না তাঁর। একমাত্র সুরধুনী ব্যতীত। রায়বাড়ির পশ্চিমের দিকে একটা ঘরে সুমন্তনারায়ণ পড়ে থাকতেন। কি সেবাটাই করেছে তাঁর সে সময়টা সুরধুনী।

নির্মলা বলতো, সর্বাঙ্গে এমনি ঘা হয়ে গিয়েছিল যে কি বলবো! আর সে কি দুর্গন্ধ!

সত্যি, মৃত্যুর পূর্বে ছয় মাসকাল ব্যাধিতে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন সুমন্তনারায়ণ। দেহের সেই সুবর্ণকান্তি আর নেই। সর্বাঙ্গে কুৎসিত ঘা। কবিরত্ন বলেছিলেন, ফিরিঙ্গী রোগ! যে ছয় মাস শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন, তার আগে অবিশ্যি ডান পা-টা টেনে টেনে চললেও এবং জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট ভাবে কথা বললেও প্রতি সন্ধ্যায় বাগানবাড়িতে তখনও না গেলে তাঁর চলতো না।

প্রতি সন্ধ্যায় বাগানবাড়িতে তাঁর যেন যাওয়া চাইই। পাল্‌কিতে চেপে প্রতি সন্ধ্যায় বাগানবাড়িতে যেতেন এবং ফিরতেন আবার পাল্‌কিতে চেপেই রাত্রির সেই শেষ যামে একেবারে নাকি যেন গঙ্গাস্নান সেরে। পাল্‌কি সমেতই নাকি পাল্‌কি-বাহকেরা তাঁকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে নিয়ে আসতো।

রাতের অন্ধকার তখনও একেবারে নিঃশেষে মুছে যেতো না। অস্পষ্ট আলো-ছায়ার একটা লুকোচুরি সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে।

পাল্‌কি-বাহকেরা এসে শেষ রাতের সেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারে হুম্‌ব্রো হুম্‌ব্রো শব্দ করতে করতে রুপো-বাঁধানো বিরাট পাল্‌কিটা এনে রায়বাড়ির চত্বরের একপাশে নামাতো।

পাল্‌কির ভিতর থেকে তখন শোনা যেতো কত্তাবাবু সুমন্তনারায়ণের জড়ানো কণ্ঠস্বর ঃ

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ আপো জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম ॥

হুম্‌ব্রো হুম্‌ব্রো শব্দটা কানে যেতেই সুরধুনী নীচে ছুটে যেতো। তাড়াতাড়ি কত্তাবাবুকে দু হাতে ধরে আগলে ধীরে ধীরে অন্দরে তাঁর মহলে এনে শয্যায় শুইয়ে দিত।

সুমন্তনারায়ণের ঘরের দরজাটা বেশীর ভাগ ভেজানোই থাকতো। সে ঘরের দরজার ছায়া কেউ যেন ভুলেও মাড়াতো না। এমন কি কত্তা-মা রাধা-রাণী বা পুত্র কন্দর্পনারায়ণও না।

নির্মলা তার বালিকাসুলভ কৌতূহলে মধ্যে মধ্যে সেই ঘরের ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি দিত। বিশেষ করে দ্বিপ্রহরে যে সময়টা সুরধুনী ঘরে থাকতো না, আহারাদি করতে যেতো।

ফুটফুটে ননী দিয়ে গড়া কাচের পুতুলের মতো কিশোরী নির্মলাকে একদিন উঁকি দিতে দেখে সুমন্তনারায়ণ ডেকেছিলেন, কে রে! আয়, আয় না—

কিন্তু নির্মলা ভয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর একদিন মধ্যরাত্রে সুমন্তনারায়ণ শেষ নিঃশ্বাস নিলেন। শেষের মাসখানেক নাকি তিনি শয্যায় পাশ ফিরতেও পারেননি।

জ্ঞান আছে অথচ বাকশক্তিহীন। সবাই বলাবলি করতো মৃত্যুতন্দ্রা।

অনেকে বলেছিল ভাগীরথী-তীরে নিয়ে গিয়ে অন্তর্জলি করার জন্য। কিন্তু কেন যেন ব্যবস্থা হয়নি। দুর্গন্ধে কেউ সামনেই যেতে পারতো না তাই বোধ হয় অন্তর্জলির ব্যাপারে কেউ গা করেনি।

তাঁর মৃত্যুর পর মৃতদেহটা চন্দন কাঠ ও ঘৃত ঢেলে দাহ করা হয়েছিল ভাগীরথী-তীরে।

মানুষ আসে মানুষ যায়। জন্ম ও মৃত্যুর পরিক্রমা নিয়েই তো এ জগৎ।

মৃত ব্যক্তির জন্য দু-চার দিন সবাই শোক করে, তারপর ক্রমশ স্মৃতিটা ঝাপসা হয়ে যায়। ভুলে যায় শোক।

তা সুমন্তনারায়ণের জন্য সেটুকু শোক করবারও তো কেউ ছিল না। যে শোক করতো—সুরধুনী, সে তো সহমৃতাই হয়েছিল।

আরো একটি নারী হয়তো কাঁদতো—ক্যাথারিন। তা তাকেও তো নিজ হাতেই বিষ দিয়ে সুমন্তনারায়ণ হত্যা করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

আর—আর কি কাঁদেনি মুন্নাবাঈ? কে জানে!

স্ত্রী রাধারাণী? জীবনের শেষের চারটে বছর তো রাধারাণী স্বামীর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতো না ঘৃণায় বিরক্তিতে।

এবং কন্দর্পনারায়ণও পিতাকে ঘৃণাই করতো। সেও দূরে দূরে থাকতো।

সুমন্তনারায়ণই যেমন রায়-বংশের সৌভাগ্য-সূর্য, তেমনি তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সৌভাগ্য-সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হয়েছিল।

সুমন্তনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনটে বৎসরও অতিবাহিত হলো না, সংবাদ এলো স্বামী-পুত্রসহ রূপবতী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে।

সংবাদটা রাধারাণীর কানে পৌঁছালো যেন বজ্রাঘাতের মতই। কারণ বহু-পূর্বেই জ্যেষ্ঠা কন্যা তার মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিল। তারই কন্যা

নির্মলা।

কয়েকটা দিন খুব কান্নাকাটি করলো রাধারাণী। এবং সে শোক সামলাবার আগেই হৈমবতী ছয় বৎসরের শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লোহা খুইয়ে রাধারাণীর কাছেই আবার ফিরে এলো।

একটি শোকের আঘাত সামলাতে না সামলাতে আবার শোক।

রাধারাণী যেন সদ্য-বিধবা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলো।

॥ ৫ ॥

সুমন্তনারায়ণের পর কন্দর্পনারায়ণের মাত্র বারোটি বৎসরের ইতিহাস।

সুমন্তনারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণের কিন্তু কোন দিকেই যেন দৃষ্টিপাত নেই।

পিতার সারা জীবনের অর্থের নেশাটা তো আগেই তার রক্তের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে নতুন আর একটা নেশাও তার মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে। কিশোরী উদ্ভিন্নযৌবনা নির্মলা।

কর্মী পুরুষ ছিলেন সুমন্তনারায়ণ। উদয়-অস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় অর্জন করেছিলেন প্রায় শূন্য রিক্ত অবস্থা থেকে বিপুল ধনসম্পত্তি মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি। নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন তিনি।

কন্দর্পনারায়ণের জীবনে সে দিন কখনও আসেনি। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র হয়ে জন্মেছিল। চারিদিকে তার ঐশ্বর্য আর ঐশ্বর্য। অফুরন্ত ঐশ্বর্য। বিরাট বাড়ি. আমলা গোমস্তা কর্মচারী, দাসদাসী একেবারে জমজমাট চারিদিক।

তাছাড়া ঐ সময় বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চারিদিকে জমিদারগোষ্ঠীর মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে।

হেস্টিংসের ছিল মাত্র পাঁচ বছরের জন্য ইজারাবিলি ব্যবস্থা। কিন্তু কর্নওয়ালিস করে দিলেন একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা।

ফলে তখন দেশের সদ্য-গজিয়ে-ওঠা ধনিকসম্প্রদায়, জমিদারগোষ্ঠীর তীব্র অর্থলালসাটা ক্ষুধার্ত সাপের বিষাক্ত জিহ্বার মতই গরীব দুঃস্থ প্রজাদের লেহন করে বেড়াচ্ছে যেন সারা দেশ জুড়ে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো নয় যেন ধ্বংসের ক্ষুরধার। প্রজার চাষ-আবাদ মঙ্গলামঙ্গল কোন কিছুর জন্যই যেন জমিদারের কোন দায়িত্ব নেই।

তারা তখন কেবল এক স্বরে চেঁচাচ্ছে, খাজনা বাড়াও নয় তো উচ্ছেদ করো। প্রজাদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। কারও মাথা ফাটিয়ে, কারও ভিটেমাটি উচ্ছেদ হচ্ছে. কারও সুন্দরী যুবতী বৌকে জমিদারের পাইক-পেয়াদারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে জমিদার প্রভুর খাসকামরায় বা তার জলসাঘরে।

আর কলকাতায় বসে নব্য ধনী বাবুরা কখনও ওড়াচ্ছেন বুলবুলি, কখনও অন্দরমহলে জাঁকিয়ে বসাচ্ছেন হাফ-আখড়াইয়ের আসর, বা শখের

যাত্রা চলেছে সারা রাত ধরে। ঐ সঙ্গে মদ আর মেয়েমানুষ। স্ফূর্তি আর স্ফূর্তি। আর তো সব এ দুনিয়ায় মিথ্যে আর ভুয়ো।

কন্দর্পনারায়ণও সেই দলে ভিড়ে যায়।

শেষ বয়সে নদীয়াতে সুমন্তনারায়ণ প্রচুর জমিদারী ক্রয় করে গিয়েছিলেন। বৎসরে প্রচুর আয় আসছে তখন সেই জমিদারি-স্বত্ব থেকে।

শহর তো শহর, গ্রামের বিত্তবানেরাও তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বা তাদের দেখাদেখি সব এক একটি বুর্জোয়া হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই নয়, লর্ড কর্নওয়ালিস সাহেব আরো অনেক কিছুই অদল-বদল করলেন—নতুন নতুন ব্যবস্থা করলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন, যার ফলে যথেচ্ছ অবৈধ উপার্জনের পথটা তাদের কিছুটা রুদ্ধ হয়ে গেল।

সমস্ত প্রদেশটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে অনেকগুলো জেলার সৃষ্টি হলো। জেলাতে জেলাতে বসলো বিচারালয়, বিচারের ক্ষমতা নিয়ে নিযুক্ত হলো সব বিচারকের দল।

পুলিশ বিভাগকে নতুন করে ক্ষমতা দেওয়া হল।

এমন কি দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্যও আলাদা আলাদা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপিত হলো শহরে।

ব্যবসা-বাণিজ্য আর জৌলুসে ভাগীরথীর তীরভূমিতে কলকাতা শহর যেন ঝলমল করতে লাগলো। নতুন নতুন সব পাকা রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে যাতায়াতের জন্য। গঙ্গার ধারে ধারে নতুন নতুন সব ঘাট তৈরী হচ্ছে , কত কি তার নাম!

বনমালী সরকারের ঘাট, শোভারাম বসাকের ঘাট, টুনুবাবুর ঘাট, মদন দত্তের ঘাট, আহিরীটোলার ঘাট, জোড়াবাগান ঘাট—শহরের ধনবান ব্যক্তি আর বনেদী পাড়ার নাম জড়িয়ে সব ঘাট।

তার সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত কলকাতা শহরের চেহারাটাও যেন পাল্টে যাচ্ছে। শৈশব, বয়ঃসন্ধি পার হয়ে এ যেন নবযৌবনা কলকাতা শহর।

নব নব সৃষ্টি ও বৈচিত্র্যের সমুদ্রপথে যেন এগিয়ে চলেছে ভাগীরথীর স্রোতধারা।

ভাগীরথীর পদপ্রান্তে উজ্জ্বল নগরী কলকাতা শহর।

তারপর একদিন লর্ড কর্নওয়ালিসও চলে গেলেন, শূন্য সিংহাসন এসে দখল করে বসলেন জর্জ বার্লো। তারপর তিনিও একদিন গেলেন, এলেন লর্ড মিণ্টো।

হাতের মুঠোর মধ্যে বিরাট সম্পত্তি ও প্রচুর অর্থ পেয়ে কন্দর্পনারায়ণ বিলাস ও আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়েছে।

তা ভাসাক। বয়সকালে অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে। সেজন্য

রাধারাণীর দুঃখ নয়।

রাধারাণীর অন্য কারণে দুঃখ। পুত্রের বিবাহ দিয়ে এত সাধ করে সোনার প্রতিমা নিয়ে এলো ঘরে, কিন্তু দীর্ঘ চৌদ্দটা বৎসর চলে গেল অথচ আজও পৌত্রমুখ দেখবার তার সৌভাগ্য হলো না। কত মানত পূজা স্বস্ত্যয়ন কবচ মাদুলী, কত দেবতার দোরে ধন্না দিলো রাধারাণী, কিন্তু রাজেশ্বরী যে নিষ্ফলা সেই নিষ্ফলাই রয়ে গেল।

অবশেষে স্থির করল পুত্রের আবার বিবাহ দেবে রাধারাণী।

কিন্তু মায়ের প্রস্তাবটা শুনে কি জানি কেন কন্দর্পনারায়ণ বেঁকে বসলো, বললে, না, বিয়ে আর আমি করবো না। তাছাড়া ব্যস্ত হচ্ছো কেন মা, মনে নেই তোমার, গুরুদেব বিবাহের পূর্বে ওর কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন ও পুত্রবতী হবে।

গুরুদেবের নামোল্লেখে বহুকাল পরে রাধারাণীর আবার তার গুরুদেব করালীশঙ্করের কথা মনে পড়লো।

হ্যাঁ ঠিক, গুরুদেবের পরামর্শই সে নেবে। পরের দিনই লোক পাঠালো রাধারাণী কাটোয়ায় গুরুদেবকে আনবার জন্য।

এবং দিন পনের বাদেই করালীশঙ্কর এসে শিষ্যগৃহে পদার্পণ করলেন, কোথায়, আমার মা-জননী কই গো?

রাধারাণী এসে গুরুর চরণে প্রণতা হলো।

মঙ্গল হোক। শুভায় ভবতু। আমাকে স্মরণ করেছো কেন মা-জননী?

বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি গুরুদেব। আপনি ব্যতীত এ সংকটে আর কোন পথই দেখছি না।

সংকট! কিসের সংকট মা?

সবই বলবো, আগে বিশ্রাম করুন।

তাড়াতাড়ি পাদ্য-অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করে দেয় রাধারাণী।

ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে করালীশঙ্কর যে-কক্ষে মৃগচর্মাসনের উপরে উপবেশন করে সন্ধ্যা-আহ্নিকের পর কারণবারি সেবন করছিলেন, সেই কক্ষে এসে প্রবেশ করলো রাধারাণী। প্রবেশ করে কক্ষের দুয়ারে অর্গল তুলে দিলো।

গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতেই করালীশঙ্কর বললেন, বোস মা বোস—এবারে বল মা তোমার কিসের সংকট?

নারায়ণের বিবাহ দেবার পূর্বে বধূমাতার জন্মপত্রিকা তো আপনার কাছে বিচারের জন্য পাঠিয়েছিলাম—

হ্যাঁ, বিচার করে তো আমি বলেছিলাম, যতদূর আজও স্মরণ আছে, রাজযোটক হয়েছে। তবে শনি বধূমাতার কিছু বক্র বিংশোত্তরী মতে। কিন্তু মা কোনরকম কিছু কি—

তা নয়—সে সব কিছু নয়। আজ চোদ্দ বৎসর হয়ে গেল অথচ আজ পর্যন্ত কোন সন্তান-সম্ভাবনা নেই—

সে কি! কন্দর্পনারায়ণের কোন সন্তান হয়নি আজ পর্যন্ত?

না। আপনি তো বধূমাতার জন্মপত্রিকা বিচার করে বলেছিলেন সে সন্তানবতী হবে!

যদি বলে থাকি তো নিশ্চয় হবে। তারা ব্রহ্মময়ী—তা সে তো অনেক কালের কথা, কাল দ্বিপ্রহরের দিকে বরং তুমি একবার ওদের দুজনেরই জন্ম-পত্রিকা দুটি আমাকে দিও। আমি পুনর্বার বিচার করে দেখবো।

বেশ তাই দেবো।

পরের দিন সন্ধ্যার পরে করালীশঙ্কর নিজেই রাধারাণীকে ডাকিয়ে পাঠালেন।

আমাকে ডেকেছেন গুরুদেব? ঘরে প্রবেশ করে রাধারাণী গুরুর চরণে আবার প্রণতা হলো।

হ্যাঁ মা, বোস—তোমার সঙ্গে কথা আছে। গুরুর কণ্ঠস্বরটা যেন একটু অস্বাভাবিক শোনায়।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে রাধারাণী তাকায় করালীশঙ্করের মুখের দিকে।

জন্মপত্রিকা বিচার করলেন গুরুদেব?

করেছি মা। সেই কথা বলতেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার বধূমাতার জন্মপত্রিকায় সন্তান-সম্ভাবনা আছে। তবে—

তবে?

তোমার পুত্রের জন্মপত্রিকায় সেরকম কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সে কি গুরুদেব! তাহলে কি আমার স্বামীর বংশ—

নিয়তি অলঙ্ঘনীয় মা। তবে শঙ্করীর প্রসাদে কি না সম্ভব হয়!

রাধারাণীর পৌত্র না হওয়ায় চিন্তিত হবার আরও কারণ হয়েছিল। কেবল যে বংশরক্ষা হবে না তাই নয়।

চিন্তার আরও গুরুতর কারণ হয়েছিল বৈকি!

রাধারাণী জানতো তার স্বামীর দুই জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ রায় আছে।

অতএব কন্দর্পনারায়ণের যদি কোন পুত্রসন্তান বা এমন কি একটি কন্যা-সন্তানও না হয় তো ঐ সূর্যনারায়ণ চন্দ্রনারায়ণ বা তাদের বংশধরেরাই হবে তাঁর স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তাঁর স্বামীর যাবতীয় সব কিছুর উত্তরাধিকারী হবে ঐ সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিরাই, অর্থাৎ স্বামীর এত কষ্টের উপার্জিত এই অর্থ ও সম্পত্তি কি তবে ঐ সূর্য ও চন্দ্র ও তাদের বংশধরেরাই ভোগ করবে!

মনে মনে তাই আরও বেশি রাধারাণী অস্থির হয়ে উঠেছিল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে রাধারাণী, সম্ভব—সত্যিই বলছেন গুরুদেব, সম্ভব?

নিশ্চয়ই মা। শঙ্করীর প্রসাদে কি না হয় মা!

কিন্তু আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না গুরুদেব, নারায়ণের জন্ম-

পত্রিকার বিচার যদি আপনার নির্ভুল ও সত্য হয়, তাহলে কি করে তা সম্ভব! কোথায় আমি ভেবেছিলাম বধূমাতার একান্তই যদি সন্তান-সম্ভাবনা না থাকে তাহলে নারায়ণের আবার পুনর্বিবাহ আমি দেবো। কিন্তু—

কোন ফল হবে না মা। বিচার আমার নির্ভুল ও সত্য। তাছাড়া ভবিতব্য অখণ্ডনীয়। আরও পর পর দশটি বিবাহ দিলেও নারায়ণের ঔরসে কোন সন্তান জন্মাবে না। এই তার ভবিতব্য।

গুরুদেব তা হলে কি হবে?

ব্যাকুল হয়ো না জননী। আমাকে দুটো দিন ভেবে দেখতে দাও মা।

কিন্তু যাই বলুন করালীশঙ্কর, ঐ কথার পর রাধারাণী যেন একেবারে ভেঙে পড়ে।

এ কি ভয়ানক কথা সে শুনলো! কন্দর্পনারায়ণের দ্বারা কোন দিনই তার কোন পুত্রসন্তান জন্মাবে না!

কন্দর্পনারায়ণ নিষ্ফল! পুরুষ হয়েও সন্তান-উৎপাদনের তার কোন শক্তিই নেই! নির্বীর্য, পুরুষত্বহীন সে!

ইদানীং কিছুকাল ধরে পুত্রবধূকে নিষ্ফলা, বন্ধ্যা ভেবে রাজেশ্বরীর উপরে যে বিতৃষ্ণার কারণ তাঁর মনের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল, আজ যেন সেই বিতৃষ্ণাটাই গভীর সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হয় সহসা। আহা বেচারী! কোন দোষ নেই তো ওর! তার নিজের পুত্রই যে নিষ্ফল!

কিন্তু সত্যিই কি তা সম্ভব যা গুরুদেব বললেন? পুরুষ পুরুষত্বহীন? এও কি কখনও হয়?

গভীর রাত্রে বিশ্বরূপার চরণ-প্রান্তে গিয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে রাধারাণী, এ তুই কি করলি মা—এত সাধ করে তোর প্রতিষ্ঠা করলাম! আশীর্বাদের বদলে এ কি নিদারুণ অভিশাপ দিলি পাষাণী!

আবার মনে হয়, না, না—এত বড় পরাজয় সে স্বীকার করে নেবে না, যা হোক এর একটা কিছু বিহিত তাকে করতেই হবে। ঐ সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিরা যদি এ সম্পত্তির অধীশ্বর হয়ে বসে তবে যে মরেও সে শান্তি পাবে না!

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয়, করবেই বা সে কি? কিই বা সে করতে পারে? যত ব্যাপারটা ভাবে রাধারাণী, ততই যেন অস্থিরতা তার বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিদারুণ একটা নিষ্ফল জ্বালায় তার সমস্ত বুকটা জ্বলতে থাকে।

এক এক সময় মনের মধ্যে প্রবল বাসনা জাগে ঐ সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণও তাদের সন্তান-সন্ততিদের কৌশলে এখানে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে, রাতারাতি কালীচরণের সাহায্যে হত্যা করে, মাটিতে ওদের গোষ্ঠী-গোত্তরকে পুঁতে ফেলে!

তার কন্দর্পর বংশের কেউ যখন এ সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না তখন যাক সব উড়ে পুড়ে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক সব! সব বারো ভূতে লুটে খাক, তবু

ওরা নয় !

স্বামীর মুখেই একদিন গল্প শুনেছিল রাধারাণী—ঐ সূর্য ও চন্দ্রের পিতামহের চক্রান্তেই নাকি স্বামীকে তাঁর একদিন পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছিল। আজ তাঁরই পৌত্রেরা করবে তার সম্পত্তি ভোগ? না—কিছুতেই না!

॥ ৬ ॥

আবার গভীর রাত্রে করালীশঙ্কর রাধারাণীকে তাঁর ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

করালীশঙ্করের ঘরের কপাট দুটো ভেজানো ছিল। ভেজানো কপাট ঠেলে ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে যেন থমকে দাঁড়ায় রাধারাণী।

করালীশঙ্কর বলেছিলেন বাড়ির সবাই ঘুমোলে চুপি চুপি নিঃশব্দে যেন আসে রাধারাণী তাঁর ঘরে।

সেই মতোই এসেছিল রাধারাণী।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কোথায়ও জেগে নেই।

কিন্তু রাধারাণী সেরাত্রে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি—বাড়ির সবাই ঘুমোলেও একজন কিন্তু ঘুমোয়নি।

সে নির্মলা। নির্মলাকে দিয়েই সংবাদটা পাঠিয়েছিলেন রাধারাণীকে করালীশঙ্কর।

অতিবড় সতর্ক ও সাবধানীও সময়-বিশেষে ভুল করে।

রাধারাণীও ভুল করেছিল।

কারণ যার সতর্ক দৃষ্টিকে সুমন্তনারায়ণ কোনদিন ফাঁকি দিতে পারেনি, পুত্র কন্দর্পনারায়ণ কিন্তু ফাঁকি দিতে পেরেছিল, কারণ পুত্রস্নেহে অন্ধ ছিল রাধারাণী।

নির্মলা তার নিজের তাগিদেই রাধারাণীর সর্বপ্রকার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছিল করালীশঙ্কর ঐ গৃহে আসা অবধি। এবং তার কারণও ছিল।

নিজ মনমতো পাত্রের সঙ্গেই রাধারাণী নির্মলার বিবাহ দিয়েছিল, কিন্তু নির্মলাকে কোনদিন স্বামীর ঘর করতে পাঠাতে পারেনি।

অনেক সাধ্যসাধনা, অনুনয়-বিনয় এমন কি জোর-জুলুম, ক্রোধপ্রকাশ করেও নির্মলাকে স্বামীর গৃহে একটি দিনের জন্যও পাঠাতে পারেনি বিয়ের পর রাধারাণী। শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, বিশেষ করে তার স্বামী ও রাধারাণী উভয় পক্ষই।

পোড়ারমুখী স্বামীর ঘর করবেই না তো থাক এখানেই পড়ে। ওর কপালে স্বামীর ঘর নেই তা রাধারাণী কি করবে!

মাতুলালয় ছেড়ে, বিশেষ করে যেখানে সে চিরদিন বলতে গেলে মানুষ, শ্বশুরগৃহে যেতে হয়তো কিশোরী নির্মলার মন চায় না, এটাই বুঝেছিল

রাধারাণী। তার বেশী তলিয়ে দেখবার চেষ্টাও করেনি, জানতেও পারেনি বুঝি কোনদিনই কেন নির্মলা স্বামীর ঘরে জীবনে গেল না !

তার মূলে ছিল কন্দর্পনারায়ণ, তারই পুত্র, স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেনি রাধারাণী সেটা। আর ভাববেই বা কেমন করে ?

কল্পনাই কি করা যায় নাকি ব্যাপারটা ? তবে কল্পনা না করা গেলেও ঘটনাটা সত্যি !

সুমন্তনারায়ণের রক্তে যে উচ্ছৃংখলতার বিষ ছিল, সেই বিষই যে অলঙ্ঘ্য নিয়মে তার আত্মজ কন্দর্পনারায়ণের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে সেটাই ভাবতে পারেনি কোনদিন রাধারাণী।

নির্মলার প্রতি যে কন্দর্পর আসক্তি জন্মাতে পারে এ যে কল্পনাতীত।

আর তাই রাধারাণীর কন্দর্পনারায়ণের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেবার কল্পনায় মনে মনে শিউরে উঠেছিল নির্মলা।

রাজেশ্বরীকে নির্মলা ভয় করতো না। অপ্সরীর মত রূপ নিয়েও রাজেশ্বরী যে কন্দর্পনারায়ণকে বাঁধতে পারেনি, সে সংবাদটা নির্মলার অবিদিত ছিল না বলেই হয়তো নির্মলা রাজেশ্বরীকে কোনদিনও ভয় করেনি।

কিন্তু নতুনের একটা মোহ আছে প্রত্যেক পুরুষেরই। তাছাড়া সে কেমন মেয়ে হবে তাই বা কে বলতে পারে ! রাজেশ্বরীর মত নিরীহ গোবেচারী মেয়ে নাও তো হতে পারে। তার মত শান্ত ধীর নির্বিকার মেয়ে হয়তো হবে না।

নির্মলা কিন্তু রাজেশ্বরীকে ভুল বুঝেছিল। রাজেশ্বরী তার স্বামীর সঙ্গে নির্মলার সম্পর্কটা জানে না—নির্মলার সে ধারণাটা কত বড় ভুল নির্মলা কোনোদিনই জানতে পারেনি। তাই যেদিন সেটা জানতে পারল বিস্ময়ে সে একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সে আরও অনেক পরের কথা।

নির্মলা রায়বাড়িতে করালীশংকরের আগমনের কারণটা দৈবক্রমে জানতে পেরেই সর্বক্ষণ করালীশংকর ও রাধারাণীর গতিবিধির উপর কান পেতেছিল।

তাই রাধারাণী স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সেই রাত্রের গুরুর আহ্বানে তাঁর নিভৃত কক্ষে যখন সে প্রবেশ করছে, এক জোড়া সতর্ক তীক্ষ্ন দৃষ্টি আড়াল থেকে তার সর্ব গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

মৃদু আলোকিত ঘরের মধ্যে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো আবার রাধারাণী। ঘরের পশ্চিম কোণে পিলসুজের উপর প্রদীপটি জ্বলছে।

প্রথমটায় সেই স্বল্পালোকে কিছুই নজরে পড়ে না রাধারাণীর।

কিন্তু পরক্ষণেই করালীশংকরের ভারী সতর্ক কণ্ঠস্বর কানে এলো, কে ? রাধারাণী, এসো—দরজাটা বন্ধ করে দাও !

মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দিয়ে নিঃশব্দে এসে গুরুর চরণে প্রণতা হলো রাধারাণী।

বোস।

মৃগচর্মাসনের উপরে উপবিষ্ট করালীশঙ্কর। পরিধানে রক্তকষায় বস্ত্র। সম্মুখে পাত্রপূর্ণ কারণবারি।

অত্যধিক কারণ-পানে তখন করালীশঙ্করের দুটি চক্ষু রক্তবর্ণ।

চিন্তা করে দেখলাম, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধির একটি উপায় আছে মা।

আছে?

হ্যাঁ। কিন্তু—

কি দেবতা?

বড় কঠিন, তুমি কি পারবে রাধারাণী?

আপনার আশীর্বাদ থাকলে কেন পারবো না দেবতা!

আশীর্বাদ! নিশ্চয়ই, আমার আশীর্বাদ তো পাবেই। তবু—

আর সংশয়ের মধ্যে রাখবেন না দেবতা। বলুন কি করতে হবে? যত কঠিনই হোক, আমি প্রস্তুত জানবেন।

কিন্তু মা—

বলুন দেবতা—

আমাদের পুরাণে ও শাস্ত্রে একটি বিশেষ প্রথার উল্লেখ আছে। প্রথাটি অত্যন্ত দুরূহ। এক্ষেত্রে সেই প্রথাটি প্রয়োগের দ্বারা তুমি ইচ্ছা করলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে।

কি! কি সে প্রথা দেবতা? খুবই কি দুরূহ?

দুরূহ বৌক।

তবু, তবু আমি শুনতে চাই, বলুন।

নিয়োগ-প্রথা!

নিয়োগ-প্রথা?

হ্যাঁ, মহাভারত পড়েছো নিশ্চয়ই। শান্তনু-মহিষী সত্যবতী মহামুনি ব্যাসের দ্বারা যে প্রথায় পৌত্র পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রকে লাভ করেছিলেন—

দেবতা! চাপা দীর্ণ একটা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে রাধারাণী নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি।

প্রদীপের ম্লান আলো করালীশঙ্করের রক্তবর্ণ দুটি চক্ষুর তারায় প্রতি-ফলিত হয়ে মনে হয় যেন দুটি প্রেতের চক্ষু।

করালীশঙ্কর আবার বললেন, হ্যাঁ। ঐ একটি মাত্র পথ ব্যতীত তোমার বংশরক্ষার আর কোন উপায়ই নেই জেনো। তাছাড়া এ শাস্ত্রের বিধি, ধর্মের নির্দেশ। মহামুনি ব্যাস যাকে নিজে পর্যন্ত সমর্থন করে গিয়েছেন, বংশরক্ষার প্রয়োজনে।

না-না, এ—এ আপনি কি বলছেন গুরুদেব, এ—এ যে আমি ভাবতেও পারছি না। আমার সতী-লক্ষ্মী বৌমা। না, না—এ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।...অন্য, অন্য কোন উপায় বা পন্থা থাকে যদি তো বলুন!

আর কোন পথ নেই। ইচ্ছা হয় তুমি এই পথ গ্রহণ করতে পারো, নচেৎ

জেনো পুন্নাম নরকবাস তোমার সপ্তদশ শ্বশুরকুলের জন্য প্রেতলোকে লেখা আছে। আর কেনই বা পারবে না বলতে পারো রাধারাণী ?

সে—সে আপনি বুঝবেন না গুরুদেব। আমি—আমিও যে নারী, নিজে নারী হয়ে অন্য এক নারীর এতবড় সর্বনাশ—

মূর্খের মত কথা বলো না রাধারাণী। প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন করালীশঙ্কর তাঁর শিষ্যাকে। নারী। সত্যবতী কি তোমারই মত এক নারী ছিলেন না ? তিনি যদি সক্ষম হয়ে থাকেন তো তুমিই বা পারবে না কেন ? তাছাড়া এ তো বিলাস বা অন্যায় আচরণ বা কামের জন্য সাধারণ রতিক্রীড়া নয়, এ ধর্মাচরণ। তোমার স্বামীর অবর্তমানে সহধর্মিণীর ধর্মাচরণ হিসাবে এ তোমার অবশ্যকরণীয়, তোমার পবিত্র শ্বশুরকুলের বংশধারার পবিত্র গোমুখীকে ফলপ্রসূ করে তোলা—জেনো তোমার ইহলোক ও পরলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ একটা নিছক খেয়াল বা অনুষ্ঠান মাত্র নয়। এক গণ্ডূষ জলের অভাবে তোমার শ্বশুরকুলের সপ্তদশ পূর্বপুরুষগণ, তোমার স্বামী, পুত্র সকলে প্রেতলোকে তৃষ্ণায় হাহাকার করে বেড়াবে—নিশ্চয়ই তুমি তা চাও না !

প্রভু আমি নির্বোধ, অবলা নারী, আপনার ঐ সূক্ষ্ম ধর্ম বুঝি না। আমি শুধু জানি—

রাধারাণী ?

দেবতা !

আমার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করো।

প্রভু !

কে তুমি, কতটুকু তোমার সংশয় ? সব সেই শঙ্করীর ইচ্ছা। আমরা তো তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র !

প্রভু ! · কেমন জড়িয়ে যায় যেন রাধারাণীর কণ্ঠস্বর। চোখের পাতা দুটি যেন ভারী হয়ে নেমে আসতে চায় উদ্‌গত অশ্রুতে করালীশঙ্করের দৃষ্টির সম্মুখে।

করালীশঙ্কর বলেন, আমরা ভাবি সবই বুঝি আমরা করি, কিন্তু কিছুই আমরা করি না। তিনি যেমন করান তেমনি করি—সবই সেই তিনি, বিশ্ব-বিমোহিনী, জগৎপালিনী জগন্মাতা !

কিন্তু দেব, আপনি যা বলছেন তা কেমন করে সম্ভব ?

তার উপায় তিনিই করে দেবেন।

আমি আর ভাবতে পারছি না দেবতা—আমাকে দুটো দিন ভাববার সময় দিন প্রভু। টলতে টলতে রাধারাণী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কি করবে এখন সে ? এ কি নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা তার সামনে ? শ্বশুর-কুলের সপ্তদশ পুরুষের পুন্নাম নরকবাস ! প্রেতলোকে সপ্তদশ পুরুষের তৃষ্ণায় হাহাকার ! না, না,—সে আর ভাবতে পারছে না।

পরের দিন করালীশংকরের সঙ্গে দেখা করে সে বলে, সে প্রস্তুত।

এই তো সত্যকারের সহধর্মিণীর কথা। করালীশংকর বলেন।

ব্যবস্থা তা হলে আপনিই করবেন।

কিছু তোমায় আর ভাবতে হবে না। কেবল আমি যেমন নির্দেশ দেবো তুমি পালন করে যাবে।

কি করতে হবে আমাকে তাহলে বলবেন।

আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর মধ্যরাত্রে সেই শুভ কার্য সুসম্পন্ন করতে হবে। একটা ব্যাপারে কেবল নজর রেখো, ঐ রাত্রে কন্দর্পনারায়ণ যেন এখানে না উপস্থিত থাকে।

সে তো নেই, মহাল-দর্শনে গিয়েছে। এখনও দিন কুড়ির আগে সে ফিরবে না।

ঠিক জানো?

হ্যাঁ।

তবে আর কি! আজ তুমি যাও, আগামী পরশু রাত্রে এই সময় এসে আবার তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। এই মহাযজ্ঞে আনুষঙ্গিক আর যা যা সব করণীয় সে সম্পর্কে তোমাকে সেই সময়েই জানাবো।

আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে! মাত্র ছয়দিন পরে!

কেমন যেন মোহাচ্ছন্নের মত রাধারাণী করালীশংকরের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিজের শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হলো।

শয়নকক্ষের আলোটা কখন যেন নিভে গিয়েছে। অন্ধকার শয়নকক্ষ। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনমতে এসে শয্যায় গা ঢেলে দিল রাধারাণী।

সমস্ত শরীরের শিরা উপশিরা বেয়ে এখনো যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচল করছে।

মাথাটার মধ্যে এখনও যেন কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে।

মনের অস্থিরতায় ঘরের দরজাটা পর্যন্ত টেনে দিতে রাধারাণীর মনে ছিল না।

অন্ধকার দ্বারপ্রান্তে পুত্রবধূ রাজেশ্বরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মা!

কে? চমকে ওঠে রাধারাণী!

আমি মা।

বৌমা!

হ্যাঁ, গুরুদেবের কক্ষ থেকে এসে শুয়ে পড়লেন, মুখে তো কিছুই দিলেন না মা! অন্ধকার করে রেখেছেন, আলোটা জ্বালাই মা?

আলো! না থাক মা। ক্ষুধা নেই, আজ আর কিছু খাবো না বৌমা। তুমি যাও শোওগে।

একেবারে রাত-উপোসী থাকবেন মা? সেই কোন্ দ্বিপ্রহরে সামান্য

চারটি অন্ন মুখে দিয়েছেন কি দেননি—

ক্ষুধা নেই বৌমা।

সামান্য একটু দুধ এনে দিই মা, বরং সেইটুকু খেয়ে—

বেশ। তাই না হয় নিয়ে এসো।

একটু পরেই শ্বেতপাথরের বাটিতে করে একবাটি দুধ নিয়ে এসে রাজেশ্বরী ঘরের আলোটা জ্বাললো।

প্রদীপের আলোয় আপনা থেকেই যেন রাধারাণীর দৃষ্টিটা সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজেশ্বরীর মুখখানির উপর গিয়ে পড়লো।

সোনার প্রতিমা। রাধারাণীর কত সাধের সোনার প্রতিমা। যেমনি মুখ-খানি তেমনি গঠন। কি সুন্দর শান্ত কালো দুটি চোখের তারা। কপাল আর সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর।

শুধুমাত্র ঐ ইন্দ্রাণীর মত রূপের জন্যই দুঃস্থ গরীবের ঘর থেকে রাজেশ্বরীকে এনেছে সে।

রাজেশ্বরীর হাত থেকে দুধের বাটিটা রাধারাণী নিল বটে, কিন্তু গলা দিয়ে তবু দুধ নামতে চায় না।

গুরুদেব, গুরুদেব—এ কি কঠোর ব্যবস্থা তোমার!

কেমন করে—কেমন করে মা হয়ে বিষের বাটি তুলে দেবো আমার ঐ সোনার প্রতিমার মুখে? না, না—প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই তার শ্বশুর-কুলের বংশরক্ষার। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ে শ্বশুরকুলের সবাই তৃষ্ণার্ত হয়ে প্রেতলোকে দিশেহারা হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দু'হাত পেতে বলছে, বড় তৃষ্ণা, জল—একটু জল দে!

কেউ নেই—কেউ নেই গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ভরে গঙ্গোদক নিয়ে বলবার—এতৎ সলিল গঙ্গোদকেন তৃপ্তম্ব···

না। যত কঠোর, যত মর্মান্তিকই হোক, তাকে এ গুরুদায়িত্ব পালন করতেই হবে। জন্ম-জন্মান্তরের ইহকাল ও পরকালের ধর্ম আজ দু-বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সামনে, স্নেহ মায়া মমতা সব—সব কিছু তাকে বুক থেকে আজ ছিঁড়ে ফেলতেই হবে।

কিন্তু তবু তাকাতে পারে না পুত্রবধূ রাজেশ্বরীর মুখের দিকে রাধারাণী। গলা দিয়ে তরল দুধটুকুও নামতে চায় না। নামিয়ে রাখে রাধারাণী দুধের বাটিটা।

খেলেন না মা?

পারছি না বৌমা। এ তুমি নিয়ে যাও।

উঠে গিয়ে মুখটা ধুয়ে এসে রাধারাণী শয্যায় পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

রাজেশ্বরী দুধের বাটিটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে।

রাত কত হয়েছে কে জানে!

চৈত্র শেষ হয়ে বৈশাখ এলো বলে।

মধ্যরাত্রি।

অসহ্য গ্রীষ্মের তাপ। নিঃশব্দে খিড়কীর দুয়ার খুলে গৃহের পশ্চাতে উদ্যান-মধ্যস্থিত সাগরদীঘিতে অবগাহনের জন্য চললো রাজেশ্বরী।

এই সময়টা কোথাও কেউ জেগে থাকে না, একা একা নিঃসংকোচে অনেকক্ষণ ধরে দীঘির জলে স্নান করতে পারে রাজেশ্বরী নিশ্চিন্তে। কাক-চক্ষুর মত জল। আর কি ঠাণ্ডা! গ্রীষ্মতাপদগ্ধ দেহটা যেন জুড়িয়ে যায়।

এত রাত্রে যে রাজেশ্বরী সাগরদীঘিতে স্নান করতে যায় কেউ জানে না। কেউ টের পায়নি অনেকদিন। একমাত্র নির্মলা একদিন টের পেয়ে গিয়েছিল।

রাজেশ্বরীর থেকে বয়সে সামান্য ছোটই হবে নির্মলা। রাজেশ্বরীকে কোনদিনই তাই নির্মলা মামী বলে সম্বোধন করেনি। বরাবরই বৌ বলেই ডেকেছে। রাধারাণী আপত্তি করেছে, কিন্তু শোনেনি নির্মলা। বৌ বলেই ডেকেছে রাজেশ্বরীকে সে।

ব্যাপারটা জানতে পেরে নির্মলা বলেছিল, তোর তো সাহস কম নয় বৌ!

কেন?

কেন কি, ভয় করে না এত রাতে একা একা বাগানের সাগরদীঘিতে যেতে!

কই না।

নির্মলা মিথ্যে বলেনি। সত্যি ভয় করার কথাই।

দীঘির চারপাশে বিরাট বিরাট শাখাপত্রবহুল আম জাম আর তেঁতুল গাছ। রাতের বেলা তো কথাই নেই, দিনের বেলাতেও দীঘির চারপাশটা এমন ছায়ানিবিড় হয়ে থাকে যে একা একা ওদিকে যেতে পর্যন্ত গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। কিন্তু সত্যিই এতটুকু ভয় করতো না কোন দিন রাজেশ্বরীর।

প্রশস্ত শান-বাঁধানো রানা। বিরাট একটা জোড়া নিম গাছের মস্তবড় একটা পত্রবহুল ডাল রানার উপরে এসে যেন ছাতার মত ছড়িয়ে পড়েছে। তার পাশেই বিরাট একটা বকুল গাছ।

টিপ টিপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মত গাছটা থেকে বকুল ফুল ঝরে ঝরে পড়ে। রাতের বাতাসে সেই মিষ্টি গন্ধটা ছড়িয়ে যায়।

ঠাণ্ডা রানাটার উপর বসে থাকতে অন্ধকারে ভারি ভালো লাগে রাজেশ্বরীর। দীঘির চারপাশে ঝোপেঝাড়ে অন্ধকারে লাখো লাখো জোনাকীর আলো জ্বলছে নিভছে, নিভছে জ্বলছে।

একটানা ঝিল্লীর রব। ঝিঁ-ঝি, ঝিঁ-ঝি—অনেক—অনেক দূরে যেন কারা অন্ধকারে ঘুঙুর পায়ে নাচছে! সারারাত ওরা নাচে!

স্বামী কন্দর্পনারায়ণ যখন গৃহে থাকে, দূর থেকে রায়বাড়ির বহির্মহলে জলসাঘরের আলোটা দেখা যায়।

কখনও কখনও শোনা যায় বাঈজীর সুললিত কণ্ঠস্বর। কে একজন বাঈজী নাকি প্রায়ই আসে।

একবার সেই বাঈজীর একটা গান রাজেশ্বরী শুনেছিল। ভারি সুন্দর লেগেছিল দূর থেকে ভেসে আসা সেই গানের দুটি চরণ:

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা !
জীবন যৌবন সফল করি' মানলুঁ
দশদিশ ভেলে নিরনন্দা ॥

দীঘির রানায় বসে অন্ধকারে আপনমনে গুনগুনিয়ে কতদিন ঐ চরণ দুটি গেয়েছে রাজেশ্বরী। আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা !

রানার উপর বসে থাকতে থাকতে ওর মনে হয়, রাতটুকু ও ওইখানে বসে বসেই কাটিয়ে দেয়। কি হবে শয়ন-ঘরে গিয়ে! সেই তো ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখে বা নিভিয়ে দিয়ে মৃদু আলোয় বা অন্ধকারে একা একা সারাটা নিশি যাপন ?

সে কি আজকের কথা—প্রায় চোদ্দ বছর হতে চললো, এ বাড়ির বধূ হয়ে এসেছে সে। কতই বা বয়স তখন তার, কিশোরী বালিকা বৈ তো নয়।

কিন্তু প্রথম প্রথম তা এমন ছিল না। প্রথম প্রথম রাত জাগতে পারতো না রাজেশ্বরী। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে এ বাড়ির অনেক রাত হয়ে যেতো। শাশুড়ী ঠাকরুনের ঘরেই সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। তারপর অনেক রাত্রে আহারাদির পর হাত ধরে তাকে পৌঁছে দিয়ে যেতো রাধারাণী তার বিরাট শয়নকক্ষে।

স্বামী কিন্তু তার অনেক আগেই এসে ঘরের মধ্যে শয্যায় শুয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতো। কিন্তু তাই বলে আসলে কি ঘুমোতো! মোটেই না। ঘুমের ভান করে চোখ বুজে পড়ে থাকত।

শাশুড়ী ঠাকরুন চলে যাবার পর চোখ চেয়ে শয্যার উপর উঠে বসতো।

সে কি রাগ, কি অভিমান! বলতো, যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না! সেই কখন থেকে ঠায় জেগে বসে আছি, এই আসো, এই আসো বুঝি!

কি করবো, আমি কি ইচ্ছা করে দেরি করি ? মা না পৌঁছে দিয়ে গেলে—

কেন, পা দুটো তো আছে, চলে আসতে পারো না!

ছিঃ!

ছিঃ মানে ?

বা রে, লজ্জা করে না বুঝি ?

লজ্জাই যদি এত তো বাকী রাতটুকুর জন্যই বা এঘরে আসো কেন ? না এলেই হয়।

বলতে বলতে স্বামী শয্যায় শুয়ে পাশ ফিরতো।

রাগ করলে ?

সাড়া নেই স্বামীর।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা সে রাগ, সে অভিমান! সহসা এক সময় তার পর বিশাল দুই বাহু দিয়ে বক্ষের উপর টেনে নিতো কন্দর্পনারায়ণ

কিশোরীকে।

তারপর কত অসংলগ্ন কথার পর কথা।

অর্থহীন তবু যেন তার শেষ নেই।

ঘুমে দু চক্ষু রাজেশ্বরীর জড়িয়ে আসতে চাইতো, কিন্তু ঘুমোবার কি জো ছিল নাকি!

এই ঘুমোচ্ছো বুঝি? তোমার কেন এত ঘুম বল তো রাজু, দেখ কেমন আমি জেগে আছি—

অমনি করেই একসময় ভোর হয়ে যেতো।

সে কি আক্ষেপ কন্দর্পনারায়ণের, রাতগুলো এত ছোট কেন?···

কিন্তু একটা বছরও গেল না। ফুরিয়ে গেল সে রাতগুলো।

রাজেশ্বরীর জীবন থেকে সে রাতগুলো যেন কোথায় কোন্ বিস্মৃতির অতলতলে মিলিয়ে গেল। আর ফিরে এলো না। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন রাজেশ্বরীর দু চোখের যত ঘুম লুট করে নিয়ে গেল তার নির্মম ভাগ্যদেবতা।

তারপর? তারপর থেকেই তো এই সুদীর্ঘ কাল ধরে চলেছে রাত্রি-জাগরণের পালা!

প্রথম প্রথম একাকিনী ঘরের মধ্যে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় জেগে বসে থাকতে থাকতে দু চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইতো ক্ষণে ক্ষণে।

কিন্তু না, কিছুতেই ঘুমোবে না রাজেশ্বরী।

স্বামী যদি এসে তাকে ঘুমোতে দেখে বলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? কিংবা তাকে ঘুমোতে দেখে যদি না ডেকেই ফিরে যান?

না, না—ছিঃ ছিঃ, তার চাইতে যে মরণও ভালো।

স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ঘুমোবো না ঘুমোবো না করতে করতে, রাতের পর রাত জাগরণের মধ্য দিয়ে কবে যে ঘুমই একদিন তার চোখ থেকে চলে গেল, রাজেশ্বরী টেরই পেল না।

রাজেশ্বরী, রায়বাড়ির বধূ জেগেই রইলো, কন্দর্পনারায়ণ আর ফিরে এলো না।

কেন এলেন না? আজ ভাবে রাজেশ্বরী, কেন এলেন না তিনি? নিশ্চয়ই স্বামীর চরণে তারই কোন অপরাধ হয়েছে। স্বামীর চেহারাটাও যেন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে।

দীর্ঘ ঘোমটা টেনে নানান কাজে এঘর থেকে ওঘরে যেতে যেতে এখন কেবল শোনে রাজেশ্বরী স্বামীর কণ্ঠস্বরটুকুই। আর সবই যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বুক-ভরা অভিমানটাও বুঝি ক্রমশ থিতিয়ে এসেছে আজকাল।

তবে শোনে বৈকি। রাত নাকি কাটে স্বামীর জলসাঘরেই।

তা কাটুক। তাতেই যদি তাঁর সুখ হয় তো তাই নিয়েই তিনি থাকুন।

ঝুর ঝুর ঝুর বকুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে বুকে পিঠে মাথায়। বাতাসে

তারই গন্ধ।…

কল্পনা—মনে মনে কল্পনা করতে ভারি ভাল লাগে বিভূতির। রায়বাড়ির সেই নিঃসঙ্গ বধূটিকে কল্পনার তুলির পর তুলি টেনে আঁকতে ভারি ভাল লাগে বিভূতির।

রায়বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমঙ্গল, দুর্নীতি, কদাচার, অভিশাপ আর পঙ্কিলতা। তারই মাঝে যেন ঐ একটি মঙ্গলশিখা। জ্বলতো যেন স্বাতন্ত্র্যে, গৌরবে আপন স্বকীয় মর্যাদায়।

শয়নঘরের মধ্যে একাকী রাত কাটানোও যা, নির্জন এই দীঘির রানায় বসে থাকাও তাই। তাই নিশ্চুপ বসে থাকতো ঐ বধূটি কত রাত পর্যন্ত উদ্যান দীঘির নির্জন রানার ওপর। তারপর একসময় দীঘির শীতলজলে অবগাহন করে সিক্তবস্ত্রে ফিরে যেতো ঘরে। ভোরের প্রত্যাশী নিশি-জাগা শুকতারাটি নির্নিমেষে চেয়ে থাকতো হয়তো দূর আকাশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে সিক্তবস্ত্রা গৃহাভিমুখিনী ঐ বধূটির দিকে।

জলসাঘরের বাতি তখন হয়তো নিভে গিয়েছে।

সে রাত্রেও গৃহে ফিরে সিক্ত বস্ত্র পরিবর্তন করতে করতে সহসা মনে পড়ে যায় রাজেশ্বরীর ফাল্গুন প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবারে নাকি চৈত্রের শেষেই রাস। গত বছব নির্মলার সঙ্গে বাগবাজারে গোকুল মিত্রের বাড়িতে রাস-লীলার উৎসব দেখতে গিয়েছিল রাত্রে। মস্তবড় ধনী লোক ছিলেন নাকি ঐ বাগবাজারের গোকুল মিত্তির। এখন অবিশ্যি তিনি নেই, কিন্তু তবু তাঁর গৃহে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে।

গতবারে মিত্তিরদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের সেই দীঘিটা। চারপাশে তার আলোর মেলা। নৌকা ভাসিয়ে তার উপর বসে মেয়েদের সেই কবিগান।

সেই যে গানটা তারা গেয়েছিল—

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
আর বলা হলো না।
একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।

॥ ৮ ॥

রক্তরাগ

'পলাশীর যুদ্ধ' আজি সহস্র জিহ্বায়
ঘোষিতেছে জনরব—প্রভঞ্জন গতি ;
'পলাশী যুদ্ধ' আজি মর্মরে পাতায়,
ধ্বনিতেছে সমীরণ গায় ভাগীরথী।

॥ ১ ॥

রক্তকষায় বস্ত্র পরিধানে, মৃগচর্মাসনে বসেছিলেন কুলগুরু করালীশঙ্কর। নিয়মিত অত্যধিক মাত্রায় কারণ পানে রক্তবর্ণ দুটি চক্ষু। আর সম্মুখে তাঁর উপবিষ্ট রাধারাণী। ঘরের কোণে প্রদীপটি মিটি মিটি জ্বলছে।

শুধু পুত্রসন্তান হলেই তো চলবে না মা তোমার, চাপা কণ্ঠে বলেছিলেন করালীশঙ্কর : তেজোদীপ্ত শক্তিমান সন্তান চাই। সেই কারণেই ক্ষেত্রে এমন বীজ রোপণ করতে হবে, যে বীজ থেকে মহীরুহ জন্ম নেবে।

কিন্তু সে বীজ কোথা থেকে আসবে দেবতা ?

সে বীজ আমিই রোপণ করতে পারতাম, কিন্তু বধূমাতা আমার কন্যাসদৃশা। নিয়োগ-প্রথায় পিতা নিয়োজিত হতে পারে না। এবং কন্দর্পনারায়ণের উচ্ছিষ্টা—উচ্ছিষ্টা পাত্রী আমার স্পর্শযোগ্যও নয়। তাই মনে মনে আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি।

কি—কি ব্যবস্থা দেবতা ? কে—কে সে ?

ব্যাকুলিতা হয়ো না রাধারাণী, যথাসময়েই জানতে পারবে।

কিন্তু দেবতা, এ কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে, তাহলে এর পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছেন ?

রাধারাণী !

তখন যে আর আমার আত্মঘাতিনী হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না প্রভু।

কিন্তু জানবেই বা কেন ? কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। অবশ্যই সাহসে বুক বাঁধতে হবে তোমায়। এতটুকু দুর্বল হলে চলবে না। এখন তোমাকে যা যা করতে হবে সেই রাত্রে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো।

বলুন—

বধূমাতাকে বলবে একটি ব্রত পালনের জন্য তাকে সারাদিন নিরম্বু উপবাসী থাকতে হবে এবং শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বসনে থাকতে হবে। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তুমি আমার ঘরে একপাত্র কাঁচা দুগ্ধ নিয়ে আসবে। সেই দুগ্ধের সঙ্গে আমি একটি দ্রব্য মিশ্রিত করে দেবো—

কোন ক্ষতি হবে না তো দেবতা ?

না। বিচলিত হচ্ছো কেন ? শোন, সেই দুগ্ধ নিয়ে তুমি বধূমাতাকে পান করিয়ে দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিদ্রাভিভূতা হবে। নিদ্রিতা হলে তুমি তার শয়নকক্ষের দ্বার খুলে রেখে আমাকে এসে সংবাদ দেবে। তারপর যা করবার আমি করবো। যাও এখন শয়নকক্ষে যাও। আমি এখন একবার বিশবরূপার মন্দিরে যাবো। ভাল কথা, তোমার সেই লেঠেল পাইক কালীচরণকে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে মন্দির-চত্বরে দেখা করতে বলেছ তো ?

হ্যাঁ—কিন্তু তাকে দিয়ে কি হবে প্রভু ?

প্রয়োজন আছে। তার সাহায্যে আমার প্রয়োজনীয় বন্য ঔষধি লতা ও মূল সংগ্রহ করিয়ে রাখতে হবে। আচ্ছা এখন তুমি যাও।

গলবস্ত্রে অতঃপর গুরুর চরণে প্রণাম করে রাধারাণী কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সম্মুখস্থিত পাত্রের শেষ কারণবারিটুকু নিঃশেষে গলাধঃকরণ করে করালীশঙ্করও গাত্রোত্থান করলেন। তারা ব্রহ্মময়ী মা !

কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে করালীশঙ্কর বহির্মহলে বিশবরূপার মন্দির-চত্বরের দিকে চললেন। সুষুপ্তি-মগ্ন রায়বাড়িব অলিন্দপথে তাঁব কাষ্ঠ-পাদুকার খট্‌খট্‌ শব্দটা ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

মন্দির-সম্মুখস্থিত পাষাণচত্বরে দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তির মতই দাঁড়িয়ে ছিল করালীশঙ্করের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে কালীচরণ।

কালীচরণ।

সাষ্টাঙ্গে দূর থেকে প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ালো কালীচরণ।

নাটমন্দিরেব ওদিকটায আয, নিরিবিলিতে তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

দুজনে এগিয়ে যায় নাটমন্দিরের দিকে। আরও অন্ধকার সেখানে।

তোকে একটা কাজ করতে হবে কালী।

আজ্ঞা করুন দেবতা।

দেখ একটা গুরুতর কঠিন কাজ তোকে করে দিতে হবে, মায়ের আদেশ হয়েছে আমার উপরে, কাজটা একমাত্র তোকে দিয়েই সম্পন্ন করতে হবে।

নিশ্চয়ই করবো দেবতা, আদেশ করুন। মায়ের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাও দেবো দেবতা।

সামনে ঐ মায়ের মন্দির। মায়ের নামে শপথ কর—যা আদেশ করবো পালন করবি নির্বিচারে !

প্রতিজ্ঞা করলাম, তাই করবো।

করবি ?

করবো।

আবার বল্‌।

করবো। এবারে আদেশ করুন দেবতা কি করতে হবে ?

সামনের শনিবার রাত্রির তৃতীয় যামে এই মন্দির-চত্বরে তোর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে, তখন বলবো। এখন যা।

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরবর্তীকালের মানুষ শিউরে উঠলেও বিভূতি জানে কি করে সেদিন সেই বীভৎস নারকীয় কাণ্ড সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্রম-পরিবর্তিত ইতিহাসের পাতাগুলো ওল্টালেই আর বুঝতে কষ্ট হতো না। শুধু সে যুগ কেন, যুগ-যুগেরই সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় নিয়েই তো যুগ-যুগান্তের ইতিহাস।

হ্যাঁ, ইতিহাস।

মুসলমানী আমলে বা প্রতিপত্তিরও পূর্বে ভারতবর্ষে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেইটারই একটা পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের আমলে ক্রমশ এবং পরবর্তীকালে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেরই উন্নতি-বিধায়ক যে সংস্কৃতি বা কালচার সেটা পরিবর্তিত হওয়ায়, ঐ দুটো ব্যাপারে কোনটাই আর রইলো না। অর্থাৎ এককূল ওকূল দুকূলই গিয়েছিল তাদের মুসলমানী আমলে।

এদিকে ইহলোকে উন্নতির আর কোন আশা না থাকায়, পার্থিব কামনায় জলাঞ্জলি দিয়ে ক্রমশ তারা এক অন্ধ আবেগে ছুটেছে তখন বিচিত্র অলৌকিক ধর্মের এক অন্ধকার গুহাপথে। ফলে সত্যিকারেব ধর্ম থেকে তো আগেই তাদের বিচ্যুতি ঘটেছিল, সেই সঙ্গে তাদের দিক থেকে সরস্বতী তো মুখ ফেরালেনই, লক্ষ্মীও ফেরালেন মুখ। শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ একসঙ্গে সবই গিয়েছে তখন। ইহকাল ও পরকাল দুইই অন্ধকার।

অন্ধকার পথে ঐ সময় এলো একদল ব্রাহ্মণ কুল-পুরোহিত যারা নিজেদের আপন আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সমাজ ধর্মের নামে আমদানি শুরু করেছেন অকল্যাণ ও অবিদ্যা। *ধর্মের নামে মিথ্যে কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান,* দৈবিক, আধিদৈবিক ও অনৈসর্গিক ক্রিয়াকর্ম। যার মধ্যে ছিল না কোন বিচার নীতি—শুভ বা এতটুকু সত্যিকারের মঙ্গল।

শুধু ভেদ-বুদ্ধি আর ভেদ-বুদ্ধি! চরম দুর্গতি—চরম অধঃপতন!

আর সেই অকল্যাণ, অবিদ্যা, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের প্রতীক ছিল তান্ত্রিক বামাচারী করালীশঙ্কর, রায়দের কুলগুরু। করালীশঙ্কর যতই শিষ্যকে ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা বোঝান না কেন, রাধারাণী নারী এবং সমস্ত ধর্মের চাইতেও বড় যে—নারীর জন্মগত সংস্কার সেই সংস্কারের বন্ধনই যেন বার বার তার গতিরোধ করবার চেষ্টা করছিল সেদিন।

একদিকে ধর্ম ও ইহলোক ও পরলোকের সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীগুরু, যিনি জীবমাত্রের একমাত্র গতি, তাঁর আধিপত্য, অন্যদিকে জন্মগত নারীসংস্কার ও স্নেহ যেন তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে রাধারাণীর মনে।

দেবতা!

কিছু বলবে রাধারাণী ?

আমি তাকে জ্যান্ত দেওয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেলবো—সমস্ত চিহ্ন প্রমাণ আমি একেবারে লুপ্ত করে দেবো স্থির করেছি !

সবিস্ময়ে করালীশঙ্কর শিষ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বলছো রাধারাণী, কাকে তুমি—

যাকে আপনি বীজ রোপণের জন্য নিয়োগ করবেন বলে স্থির করেছেন তাকে।

মুহূর্তকাল কি যেন ভাবলেন করালীশঙ্কর। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, বেশ—তাই হবে। তুমি উচিত কথাই বলেছো। সত্যি ওর চাইতে মঙ্গল ও শুভ কিছু হতে পারে না।

হ্যাঁ, তাই করবে রাধারাণী। একেবারে মুছে দেবে, লুপ্ত করে দেবে সে সমস্ত চিহ্ন এ পৃথিবী থেকে। কেউ—কেউ কোনদিন যেন না জানতে পারে ! অন্ধকারেই সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে !

বধূ রাজেশ্বরী এসে ঘরে ঢুকলো, আমাকে ডেকেছিলেন মা ?

হ্যাঁ, কাল তুমি নিরম্বু উপবাস করবে। বিশেষ একটি ব্রতপালন তোমাকে দিয়ে করাবো।

তাই করবো মা।

হ্যাঁ, আর—আর কাল রাত্রে, আচ্ছা থাক, কাল রাত্রেই শুনো—সহসা রাধারাণীর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। রাজেশ্বরীর কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর, তার শান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে রাধারাণীর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।

রাধারাণী পারে না তাকিয়ে থাকতে রাজেশ্বরীর মুখের দিকে। মুখটা ফিরিয়ে নেয়।

আমি যাচ্ছি মা।

এসো। রাজেশ্বরী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বধূর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা রাধারাণীর দুটি চক্ষুর দৃষ্টি জলে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। কত আদরের মনোনীত বধূ তার !

মনে হয় দশ বছর নয়, এই বুঝি সেদিন কন্দর্পের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রক্ত-লাল রেশমী শাড়ি পরিহিতা, পাথরের থালায় রাখা দুধে-আলতায় পা ডুবিয়ে, সেই দুধে-আলতা-মাখা পা দুটি ফেলে এই গৃহে এসে প্রবেশ করেছিল। শঙ্খধ্বনি করে উলুধ্বনি দিয়ে বধূবরণ করেছিল সে।

না, আর ভাবতে পারে না রাধারাণী ! মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

গুরুদেব—গুরুদেব শাস্ত্র থেকে নির্দেশ দিয়েছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ। ধর্মের নির্দেশ। তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভুল নেই, অন্যায় নেই, পাপ নেই।

ওদিকে রাজেশ্বরী রাধারাণীর ঘর থেকে বের হয়ে আসতেই নির্মলা তাকে প্রশ্ন করে, কত্তা-মা কেন তোকে ডেকেছিলেন রে বৌ ?

কিসের ব্রতপালন করতে হবে কাল, তাই উপবাস করতে বললেন।

ব্রতের উপবাস ! কিসের ব্রত ?

তা তো জানি না।

ওমা সে কি কথা ! ব্রত করবি, উপবাস করবি, অথচ জানিস না কি সে ব্রত ?

নিশ্চয়ই কোন গুহ্য ব্রত আছে, নইলে বলবেন নাই বা কেন ?

তা শুধালি না কেন, কিসের ব্রত ?

গুরুজন নির্দেশ দিয়েছেন, তাই কখনও প্রশ্ন করা যায় নাকি ?

কেন, যাবে না কেন শুনি ? তাছাড়া ব্রত করছি আমি—তা জানবো না কি সে ব্রত !

আর কোন জবাব দেয় না রাজেশ্বরী। মৃদু হেসে স্থানত্যাগ করে।

নির্মলা তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপন মনেই বলে, তুমি অত সহজেই বিশ্বাস করতে পারো, কিন্তু আমি করবো না। গুরুর সঙ্গে এত গোপন পরামর্শই বা কিসের !

সৌদামিনী ঐ সময় পাশে এসে দাঁড়ায়, অ নির্মলাদি, আমার চুলটা বেঁধে দাও না।

নির্মলার সে কথা কানেও যায় না।

সৌদামিনী আবার ডাকে, নির্মলাদি গো—

কি ?

আমার চুলটা বেঁধে দাও না—

এখন বিরক্ত করিস নে সদু, যা তোর মায়ের কাছে যা।

না, মা পারে না ফিরিঙ্গি খোপা বাঁধতে, তুমি বেঁধে দাও না গো।

এখন পারবো না যা। নির্মলা চলে গেল।

সৌদামিনীর বিধবা মা হৈমবতী ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, মেয়ের ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে শুধান, কি হয়েছে রে সদু ?

নির্মলাদি আমার চুল বেঁধে দিলে না।

যাস কেন ল্যা ঐ ঠ্যাকারীর কাছে ! মা কেমন অন্ধ, সারাটা জীবন ভাতারের ঘর করলো না !

কে ভাতারের ঘর করলো না মা ?

কেন, ঐ যে সোহাগী ! ভাবে মানুষের চোখ নেই, আমরা কিছু দেখি না, কিছু বুঝি না।···

চিরদিনই একটু অকালপক্ক ছিল সৌদামিনী। বয়স তখন তার মাত্র আট কি নয় বৎসর। ঐ বয়সেই তার কচি মুখে পাকা পাকা কথার খই ফুটতো যেন।

সৌদামিনীও মায়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, যা বলেছো মা ! সত্যিই গা জ্বালা করে—

চমকে ওঠে হৈমবতী মেয়ের কথায়। বলে, কেন, তুই আবার কি দেখলি ?

দেখার আর বাকী কি লা! দেখতে দেখতে তো চোখ যাবার যোগাড়!

এবার সদুর কথায় না হেসে পারে না হৈমবতী।

সত্যি, ঐ এক ধরন ছিল সৌদামিনীর।

একে ছোটখাটো দেখতে ছিল, তার উপরে উঁচু করে সাত-হাতি একটা লাল ডোরাকাটা শাড়ি পরে, আঁচল কোমরে বেঁধে, পায়ে তোড়া নূপুরের ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে অতবড় রায়বাড়ির সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াতো সৌদামিনী।

ঐ বয়সেই কি চুল ছিল সৌদামিনীর। সমস্ত পৃষ্ঠদেশটা যেন ঢেকে রাখতো। আর সেই ছোটবেলা থেকেই ভারি শখ ছিল তার ফিরিঙ্গি খোঁপা বাঁধা।

শৌখিন নির্মলাই একমাত্র রায়বাড়িতে বাঁধতে পারতো ফিরিঙ্গ খোঁপা।

সৌদামিনী কিন্তু অত সহজে নিষ্কৃতি দেবার পাত্রী নয়, নির্মলা যেদিকে একটু আগে গিয়েছিল সেইদিকেই যায় সৌদামিনী।

হৈমবতী পিছন থেকে ডাকে, অ সদু, শোন্ শোন্…

বেলা গড়িয়ে গেল এখনও আমার চুলই বাঁধা হলো না বলে! বলতে বলতে অলিন্দপথে অদৃশ্য হয়ে যায় সৌদামিনী।

॥ ২ ॥

কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত।

রাধারাণী করালীশংকরের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো রাত্রির দ্বিতীয় যামে।

অস্থির পদে পায়চারি করছিলেন করালীশংকর কক্ষমধ্যে। পদশব্দে চোখ তুলে তাকালেন।

কে ? রাধারাণী! এসো, তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি। ঐ দেখো কক্ষের পশ্চিম কোণে একটি কালো পাথরের বাটিতে ঔষধি আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। দুগ্ধ এনেছো ?

হ্যাঁ প্রভু, এই যে—

দুধের বাটি হাতে এগিয়ে আসে রাধারাণী।

যাও, ঐ দুধের সঙ্গে ঔষধিটা মিশ্রিত করে এবারে গিয়ে বধূমাতাকে পান করাও। বধূমাতা নিদ্রাভিভূতা হলে আমাকে এসে সংবাদ দেবে। হ্যাঁ শোন, আসবার পূর্বে কক্ষের আলোটা নির্বাপিত করে আসবে।

রাধারাণী দুধের বাটি হাতে এগিয়ে গেল কক্ষের পশ্চিমকোণে এবং যথা-নির্দেশে দুধের সঙ্গে সেই ঔষধি মিশ্রিত করে নিয়ে পুনরায় কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

উপবাসে ক্লান্ত রাজেশ্বরী তার নিজের কক্ষে খোলা বাতায়ন-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বৌমা!

রাধারাণীর কণ্ঠস্বরে ঘুরে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী।

এই চরণামৃতটুকু খেয়ে নাও মা।

রাধারাণীর হাত থেকে বাটিটা নিয়ে এক চুমুকে সমস্তটুকু দুধ পান করে নিল রাজেশ্বরী।

দুগ্ধপানের পর পনের মিনিট যায় না, রাধারাণীকে বলে, আমার যে বড্ড ঘুম পাচ্ছে মা!

বেশ তো, শয্যায় শুয়ে পড়ো।

ঘুমোবো?

কেন ঘুমোবে না, ঘুমোও।

রাজেশ্বরী শয্যার উপর তখন শয়ন করে। সত্যি, ঘুমে সর্বশরীর তখন যেন তার শিথিল অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু ঠিক ঘুম নয়। রাজেশ্বরী বোধ হয়, ভুল করেছিল। ঘুমের মতই ঠিক, তবু যেন ঘুম নয়—কেবল শিথিল অবশ, অনাসক্ত চৈতন্য।

আরও কিছুক্ষণ পরে রাধারাণী ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং করালীশংকরের পূর্ব নির্দেশমতো যাবার আগে নিঃশব্দে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে যেমন বাইরের অলিন্দে পা দিয়েছে রাধারাণী, বাইরে অন্ধকারে পেচকের কর্কশ চিৎকার শোনা যায়।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় যেন রাধারাণী। কিন্তু সেও বুঝি মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই মনকে দৃঢ় করে দ্রুত এগিয়ে যায় করালীশংকরের কক্ষের দিকে পুনর্বার।

সুষুপ্তিময় বিরাট রায়বাড়ি। কোথাও কোন শব্দ নেই। সামান্য সূচ পতনের শব্দটুকু পর্যন্ত বুঝি শোনা যায়।

অন্যান্য দিন পুত্র গৃহে থাকলে জলসাঘরে অনেক রাত পর্যন্ত গীত-বাদ্য চলে, কিন্তু কিছুদিন হলো পুত্র গৃহে না থাকায় জলসাঘরেও আলো জ্বলে না। সেদিকটায়ও কোন সাড়া-শব্দ নেই।

করালীশংকরের কক্ষমধ্যে এসে পুনরায় প্রবেশ করলো রাধারাণী।

কে? রাধারাণী?

হ্যাঁ—

এবারে কক্ষমধ্যে অন্ধকার ছিল না, ছোট্ট একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বলছিল উপবিষ্ট করালীশংকরের সম্মুখে।

এসো—ঐখানে উপবেশন করো, এত বিলম্ব হলো যে?

সে ঘুমোলো তবে তো এলাম।

রাধারাণীর গলার স্বরটা যেন কেমন কেঁপে ওঠে।

গাঢ় নিদ্রা হবে না। একটা নিদ্রা ও স্বপ্নের মাঝামাঝি শারীরিক ও মানসিক শৈথিল্য আনবে মাত্র আমার প্রদত্ত ঔষধি, কিন্তু তোমাকে যেন একটু বিচলিত মনে হচ্ছে রাধারাণী! ভয় কি, শংকরীকে স্মরণ করো, সর্বমঙ্গলার ইচ্ছায় সবই মঙ্গল হবে। বলতে বলতে সম্মুখস্থিত একটি পাত্র এগিয়ে দিয়ে করালী-

শঙ্কর বললেন, মায়ের এই প্রসাদটুকু পান করে ফেল, দেখবে সমস্ত অবসাদ সমস্ত ক্ষয় দূর হবে।

গুরুর নির্দেশে পাত্রটি মুখের কাছে তুলে ধরতেই তীব্র একটা কটু গন্ধ রাধারাণীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল।

একি দেবতা ?

মায়ের প্রসাদী, পান করো।

বড় যে উগ্র গন্ধ—

পান করো।

কোনমতে গলায় ঢেলে দিল প্রসাদীটুকু রাধারাণী। গলনলী ও পাকস্থলীর সমস্ত শৈল্মিক ঝিল্লী যেন জ্বলে যায়।

মাথার মধ্যে যেন কেমন ঝিমঝিম করছে দেবতা! রাধারাণী বলে।

সত্যি সর্বাঙ্গ দিয়ে তখন যেন একটা অগ্নির প্রবাহ বের হচ্ছে। সমস্ত দেহ যেন অতীব হাল্কা মনে হয়।

ঠিক আছে, তুমি এইখানে অপেক্ষা করো, আমি বাকী কাজটুকু সেরে আসি।

করালীশঙ্কর কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। স্থিরদৃষ্টিতে জ্বলন্ত প্রদীপ-শিখাটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলো একাকিনী কক্ষমধ্যে রাধারাণী।

সেই পাষাণচত্বর। করালীশঙ্কর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন, অন্ধকারে সব যেন ঠিক ঠাহর হয় না।

দেবতা ?

কে ?

ঠিক যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে ফুঁড়ে উঠে সামনে এসে দাঁড়ায় কালীচরণ। দীর্ঘ পেশীবহুল দেহ।

গায়ের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ যেন অন্ধকারে মিলে গিয়েছে একাকার হয়ে।

বস্ত্রান্তরাল থেকে একটা বোতল বের করে এগিয়ে দিলেন সেটা করালী-শঙ্কর কালীর দিকে। বললেন, মায়ের এই প্রসাদী কারণটা সবটা আগে পান করে নে—

মদ্যপানে সামান্যই অভ্যস্ত ছিল কালীচরণ। তাও নিয়মিত সে পান করতো না। উৎসবে পালা-পার্বণে যা কিছু মধ্যে মধ্যে পান করতো। কিন্তু আজ করালীশঙ্করের নির্দেশে সমস্ত বোতলটা ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল।

বলুন দেবতা এবারে কি করতে হবে ?

ক্ষণকাল তুই এখানে অপেক্ষা কর আমি আসছি—অন্ধকারে আবার অদৃশ্য হলেন করালীশঙ্কর।

সোজা ফিরে এলেন নিজের কক্ষে করালীশঙ্কর। কিন্তু আশ্চর্য, কক্ষ শূন্য, টিম্ টিম্ করে প্রদীপটি জ্বলছে, রাধারাণী কক্ষমধ্যে কোথাও নেই।

নিঃশব্দে আবার ফিরে এলেন সেই মন্দির-সম্মুখবর্তী পাষাণচত্বরে।

কালীচরণ তখনও সেখানে দণ্ডায়মান।

তীব্র মদের নেশায় সে তখন বুঁদ হয়ে আছে।

কালী?

দেবতা!

তোর চক্ষু বেঁধে এবার তোকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

কোথায় দেবতা?

সব বলছি, আয় আগে তোর চক্ষু দুটি এই বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধে দিই! বলতে বলতে একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেশ করে কালীর চক্ষু দুটি বেঁধে দিলেন করালীশংকর।

কালীচরণ?

দেবতা!

খবরদার, আজ নিশিরাত্রে যা ঘটবে কখনও যেন তা কারো কাছে প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হলে দেবতার অভিশাপে তুই পাষাণে পরিণত হবি মনে থাকে যেন।

না, কেউ জানবে না।

হ্যাঁ—এখন তুই যেখানে যাবি, যা করবি সবই জানবি দেবতার নির্দেশ। মা চামুণ্ডার নির্দেশ। ভাগ্যবান তুই, মা তোর উপর এই কাজের ভারটুকু দিয়েছেন। আয়—

করালীশংকর চক্ষুবাঁধা অবস্থায় কালীচরণের হাত ধরে তাকে নিয়ে এবারে নিঃশব্দে অন্ধকারে অন্দরের দিকে অগ্রসর হলেন।

চাপা কণ্ঠে যেন ফিস্ ফিস্ করে করালীশংকর কালীচরণের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, এবারে তোর চোখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর—মা চামুণ্ডার নির্দেশে এক নারী তোরই আশা-পথ চেয়ে এই অন্ধকার কক্ষমধ্যে তোর জন্য পালঙ্কে শয়ন করে অপেক্ষা করছে। মায়ের নির্দেশে ঐ নারীর গর্ভে তোকে সন্তান উৎপাদন করতে হবে। যা, সামনেই পালঙ্কে সেই নারী তোর—

করালীশংকর চোখের বাঁধন খুলে দিলেন কালীচরণের।

অন্ধকার। পূর্ববৎ অন্ধকার। মদের নেশা ও করালীশংকরের প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই অন্ধকারেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল হাতড়াতে হাতড়াতে কালীচরণ কক্ষমধ্যে।

ঠিক জাগরণ নয়, আবার ঠিক নিদ্রাও নয়—জাগরণ ও নিদ্রার মাঝামাঝি অবস্থা তখন রাজেশ্বরীর। কেমন যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা। সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেই অন্ধকারে দুটি বলিষ্ঠ পেশল বাহু তাকে নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেলে।

কে!

আমি—

তুমি—সত্যিই তুমি এসেছো !
জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর রাজেশ্বরীর।

বন্ধ দরজার সামনে কান পেতে দাঁড়িয়েছিলেন অধীর উৎকণ্ঠায় করালী-শঙ্কর। সহসা মৃদু একটা পদশব্দে যেন চমকে পশ্চাতে তাকাতেই পাথর হয়ে গেলেন।

কে ?

অদূরবর্তী অলিন্দ-পথের সামান্য আলো কক্ষের সামনে এসে পড়েছে, সেই আলোয় দেখলেন সম্মুখেই তাঁর দণ্ডায়মান রাধারাণী। আঁচলটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কটিদেশে বাঁধা। আর তার হাতে প্রকাণ্ড এক খড়্গ। মাথার অবগুণ্ঠন স্খলিত। এলায়িত রুক্ষ কুন্তল।

রাধারাণী !

হ্যাঁ, কিন্তু এ কি সর্বনাশ আপনি করলেন দেবতা ! শেষ পর্যন্ত ঐ চণ্ডালের রক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের রক্তের সঙ্গে—

চণ্ডাল হলেও সে বীর্যবান পুরুষ—

বীর্যবান, তাই না ! এবারে আপনি এখান থেকে যান—যান গুরুদেব ! আপনি আপনার করণীয় করেছেন, এবারে আমার করণীয় আমাকে সম্পন্ন করতে দিন !

রাধারাণী—

গুরুদেব, সত্বর আপনি এস্থান ত্যাগ করুন। অন্যথায় হয়তো আমাকে দ্বিতীয়বার মহাপাতকের ভাগী হতে হবে—

চামুণ্ডা সদৃশা বিভীষণা রাধারাণীর সামনে আর দাঁড়াবার সাহস হলো না বুঝি করালীশঙ্করের সেই মুহূর্তে। দ্রুতপদে তিনি স্থানত্যাগ করলেন।

ঠিক পরমুহূর্তেই টলতে টলতে বের হয়ে এলো দরজাপথে কালীচরণ। পরক্ষণেই রাধারাণীর হাতের ধারালো খড়্গটা বিদ্যুৎবেগে মাথার উপর উঠে কালীচরণের দেহ থেকে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে দিল যেন চক্ষের পলকে। দড়াম করে সশব্দে মুণ্ডহীন দেহটা অলিন্দে আছড়ে পড়লো। মুণ্ডুটা কয়েক হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। রক্তে অলিন্দ ভেসে গেল।

মাথার মধ্যে বুঝি তখন খুন চেপে গিয়েছে রাধারাণীর। বুকটার মধ্যে একটা তীব্র আগুনের জ্বালা যেন পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিচ্ছে তখন তাকে।

এখনও সুপ্তিময় সমস্ত রায়বাড়ি। এখনও রাত্রির শেষ যাম বাকী।

ঐ মৃতদেহের একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। কাক-পক্ষী জাগবার আগেই সব একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। কিন্তু কি করে—কি করে সব নিশ্চিহ্ন করবে রাধারাণী ? একা তো কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, সাহায্য কারো নিতে হবেই।

কিন্তু কার—কার সাহায্য সে নেবে ! এই একান্ত গোপনীয় ব্যাপারে কার

উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় ? একান্তভাবে নির্ভরশীল যার উপরে হওয়া যেতো, একান্তভাবে যাকে বিশ্বাস করা যেতো তাকে সে আজ মুহূর্তপূর্বে খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করেছে। সে আজ নাগালের বাইরে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। বেহারী দারোয়ান রঘুনন্দন সিং। হ্যাঁ, তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

আর কালবিলম্ব না করে তখুনি ছুটে গেল রাধারাণী বহির্মহলে যেখানে খাটিয়া পেতে ছোট একটা ঘরের মধ্যে রঘুনন্দন তখন পরম নিশ্চিন্তে এক লোটা সিদ্ধি গলায় ঢেলে নাক ডাকাচ্ছে।

রঘু, রঘুনন্দন—

খুব সতর্ক ঘুম রঘুনন্দনের। চল্লিশের কোঠায় বয়েস হলেও যুব-জনোচিত চেহারা তখনও। বিশাল বলিষ্ঠ।

রঘুনন্দন—

ঘুম ভেঙে যায় রঘুনন্দনের। চকিতে খাটিয়ার উপর উঠে বসে, কৌন ?

পরক্ষণেই সামনে রাধারাণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, মাইজী !

রঘুনন্দন, ডাকাত পড়েছে—

ডাকু ! কিধার মাইজী ? চকিতে হাত বাড়িয়ে পাশেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা পাঁচহাত বাঁশের লাঠিটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রঘুনন্দন।

ব্যস্ত হয়ো না, তাকে আমি শেষ করে দিয়েছি।

খতম হো গিয়া !

হ্যাঁ, আয় আমার সঙ্গে, এখুনি চল্। লাশটাকে রাতারাতি দীঘির ধারে বাগানের মধ্যে পুঁতে ফেলতে হবে।

একদম খতম্ কর দিয়া মাইজী !

হ্যাঁ। আমার মনে হয় ওই বেটাই ডাকাতের দলের সর্দার ছিল। লাশটাকে রাতারাতি পাচার করে না ফেললে ওরা যদি সন্ধান পায় তো মুস্কিল হবে রঘু।

ও তো ঠিক বাত্ হ্যায় মাইজী। আপনে সাচ্ কাহা।

তাই বলছিলাম আর দেরি করিস না, জলদি আয়।

লেকেন ও মুর্দা কিধার হ্যায় মাইজী ?

অন্দরমে।

অন্দরমে ?

হ্যাঁ।

তব চলিয়ে মাইজী।

রাধারাণীর পিছনে পিছনে রঘুনন্দন অগ্রসর হয়।

॥ ৩ ॥

কি করে যে ঐ সময় রাধারাণীর মাথার মধ্যে অমন সুসংবদ্ধ চিন্তা এসেছিল তা কি রাধারাণীই জানে এবং অত সহজে রঘুনন্দন তার কথা বিশ্বাস করে নেবে তাই বা রাধারাণী কি করে ভেবেছিল ?

তবে দেহাতী সরল মানুষ, মূর্খ রঘুনন্দন—অত তলিয়ে কিছু ভাববার ক্ষমতাও হয়তো তার ছিল না। তাছাড়া রাধারাণী তার কর্ত্রীঠাকরুন।

ভৃত্য সে, তার নির্দেশ পালন করতেই অভ্যস্ত চিরদিন নির্বিচারে।

সমস্ত রায়বাড়ি তখনও তেমনি সুপ্তিময়। চারিদিক নিঃসাড়। কেউ কোথাও জেগে নেই।

কিন্তু রাধারাণী জানতো না! জেগে ছিল—একজন সে রাত্রে জেগে ছিল। নির্মলা! নির্মলা আত্মগোপন করে অলক্ষ্যে কয়েক দিন ও রাত সর্বক্ষণ তার প্রতিটি গতিবিধির উপরে সুতীক্ষ্ন নজর রেখেছিল।

যাই হোক, সেই অন্ধকারেই রাধারাণীর নির্দেশমত রঘুনন্দন কালীচরণের রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত দেহটা উদ্যান-মধ্যে দীঘির ধারে বয়ে নিয়ে এলো। দীঘির রাণার পাশে বিরাট শাখা ও পত্র-বহুল বকুল বৃক্ষটা যেন একটা অন্ধকারের মধ্যে স্তূপীকৃত ছায়ার মতই মনে হয়। সেই বকুলতলায় এনে মৃতদেহটা নামিয়ে রাখলো রঘুনন্দন।

যা রঘু, চটপট্ এবারে একটা কোদালি নিয়ে আয়।

রাধারাণীর নির্দেশে তখনই রঘুনন্দন ছুটে গিয়ে বহির্বাটি থেকে একটা বড় কোদালি নিয়ে এল।

ঐখানে গর্ত খোঁড়।

ঝুপ···ঝুপ···ঝুপ, অন্ধকারে রঘুনন্দন ক্ষিপ্রহস্তে মাটির বুকে কোদাল চালায়।

কিন্তু অন্ধকারে ভাল দেখতে পায় না বলে একসময় বলে, বহুৎ আঁধেরা মাইজী! আঁধেরা মে কুছ্ দেখাই নাহি যাতা!

দেখতে পাচ্ছিস না—আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটা আলো নিয়ে আসছি।

দ্রুতপদে রাধারাণী আবার অন্দরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা মশাল নিয়ে এসে জ্বালালো। মশালের রক্তাভ আলোয় স্থানটি এবারে আলোকিত হয়ে ওঠে। মশালের আলো আশপাশের গাছপালার উপর গিয়ে পড়েছে। আলোছায়া অন্ধকারে যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

অন্ধকার থাকতে থাকতেই কবন্ধ মৃতদেহটা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেয় রঘুনন্দন।

লেকেন ওই ডাকুকা শির কিধার মাইজী ?

কালীর মাথাটা পূর্বেই সরিয়ে ফেলেছিল রাধারাণী, পাছে মৃতদেহটা সনাক্ত করতে পারে রঘুনন্দন। কর্তিত মুণ্ডুটা রাধারাণী একটা কাপড়ে জড়িয়ে তারই শয়নকক্ষে একটা চুপড়ির মধ্যে আগেই সরিয়ে রেখে এসেছিল।

রাধারাণী বলে. সে মুণ্ডুটা আমি আগেই ঐ দীঘির জলে ফেলে দিয়েছি রঘু।

তব্ তো ঠিক হ্যায়। রঘু বলে।

রঘুর সাহায্যে মৃতদেহটা মাটির নীচে চাপা দিয়ে রাধারাণী তাকে বিদায় দেয় এবং যাবার সময় তাকে সাবধান করে দিয়ে বলে, খুব হুঁশিয়ার রঘু, কেউ যেন একথা ঘুণাক্ষরেও না টের পায়।

নেই মাইজী?

আচ্ছা তুই যা, হ্যাঁ এই যে—

চারটে সোনার মোহর রঘুনন্দনের হাতে গুঁজে দেয় রাধারাণী।

এ কেয়া মাইজী?

তোর বকশিশ।

অতঃপর রঘুনন্দন হৃষ্টচিত্তে কর্ত্রীঠাকুরাণীকে দীর্ঘ এক সেলাম জানিয়ে স্থানত্যাগ করে।

রাধারাণী মশালটা নিভিয়ে আবার নিজের শয়নকক্ষে ফিরে এলো। এবারে কর্তিত মুণ্ডুটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখনও রাত পোহাতে কিছু বাকী।

আঁচলের তলায় কাপড়-জড়ানো কালীর কর্তিত মুণ্ডুটা ও একটা খুরপি নিয়ে রাধারাণী আবার উদ্যানে গিয়ে প্রবেশ করলো। ক্ষিপ্রহস্তে খুরপির সাহায্যে মাটি খুঁড়ে গর্তের মধ্যে মুণ্ডুটা চাপা দিয়ে এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হলো রাধারাণী। নিশ্চিন্ত সত্যই এবার নিশ্চিন্ত রাধারাণী।

অতঃপর দীঘির জলে স্নান করে খুরপিটা আঁচলের তলায় নিয়ে রাধারাণী যখন নিজের শয়নকক্ষে পুনরায় ফিরে এলো, পূবের আকাশে দেখা দিয়েছে তখন প্রথম আলোর ইশারা। দু-একটি কাক ডাকছে।

কক্ষমধ্যে যে বিরাট সেগুনকাষ্ঠের সিন্দুকটা ছিল, তার মধ্যেই রাধারাণী খুরপিটা রেখে দিল একটা ন্যাকড়া জড়িয়ে পুনরায়। খুরপিটা ঐ সিন্দুকের মধ্যেই ছিল। গৃহের ভিত্ প্রতিষ্ঠার সময় ঐ খুরপিটাই ব্যবহার করেছিলেন সুমন্তনারায়ণ, তাই সযত্নে খুরপিটা ঐ সিন্দুকের মধ্যেই এতকাল তোলা ছিল।

তীব্র ঔষধির ক্রিয়া, নিদ্রার ঘোরটা তখন ধীরে ধীরে রাজেশ্বরীর কেটে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বসলো রাজেশ্বরী। তখনও সর্বাঙ্গে অসহ্য একটা ক্লান্তি, মাথার মধ্যে তখনো যেন কেমন ঝিমঝিম একটা নিস্তেজ ভাব। সমস্ত চিন্তাশক্তি এলোমেলো বিশৃঙ্খল।

রাত্রিশেষের অস্পষ্ট আলো উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে কক্ষমধ্যে এসে উঁকি দিচ্ছে। সেই অস্পষ্ট আলোতেই শিথিল বাস ও বিস্রস্ত শয্যার দিকে তাকালো রাজেশ্বরী। অনেক—অনেকদিন পরে, যেন দীর্ঘ এক যুগ পরে আবার কাল রাত্রে নিদ্রার ঘোরে রাজেশ্বরী রতিক্রিয়ার আনন্দ অনুভব করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় গতরাত্রের কথা রাজেশ্বরীর।

যখন সে গভীর নিদ্রাভিভূত, স্বামী এসেছিলেন তার শয্যায়। তার সেই নিবিড় আলিঙ্গন, তারপর—তারপর সেই চরম পুলক, নিদ্রার ঘোরে হলেও সে যেন সেই আনন্দ, সেই পুলক অনুভব তখনও করছিল দেহের প্রতি শিরায় শিরায়। তাহলে সত্যি সত্যি স্বামী তার এতকাল পরে আবার তার শয়নকক্ষে পদার্পণ করেছিলেন! এতকাল পরে তাঁর রাজুকে তাহলে আবার মনে পড়েছিল গত নিশায়!

হায় হতভাগিনী, কি ঘুম যে তার পেয়েছিল! কেন, কেন জাগেনি? চির-আকাঙ্ক্ষিত মধুরাতি তার ঘুমের ঘোরেই এলো, আবার ঘুমের ঘোরেই চলে গেল কখন! কেন, কেন রাক্ষুসী তোর ঘুম ভাঙ্গলো না রে! কেন ঘুম ভাঙলো না!

কিন্তু কাল রাত্রে কখন—কখন তার স্বামী ফিরলেন? তিনি তো আজ দিন পনেরো হল মহাল পরিদর্শনে গিয়েছেন। প্রত্যাবর্তনের তো কিছু স্থির ছিল না।

হয়তো হঠাৎই প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু এলেনই যদি তার কক্ষে এতকাল পরে কাল রাত্রে, তবে কেন হতভাগিনীর ঘুম ভাঙ্গালেন না, কেন একটিবার ডেকে বললেন না, রাজু আমি এসেছি! আর নাই যদি ঘুম ভাঙ্গালেন, তবে ভোর হতে না হতেই বা কেন গেলেন চলে!

এসেছিলেনই যদি পথ ভুলে এতকাল পরে তার ঘরে, তাকে না জানিয়ে অত ভোরে চলে যাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তবে কি তার এই দেহটার জন্যই এসেছিলেন? হায় রে! যে দেহের অধিকার একমাত্র তাঁরই জন্ম-জন্মান্তরের, সেই দেহটা এমনি করে নিশিরাতে চোরের মত চুরি করে এসে ঘুমের মধ্যে ভোগ করবার তো প্রয়োজনই ছিল না। মুখের কথাটি খসালেই তো সে তাঁকে উন্মুক্ত করে দিতো! কেন তার নিদ্রাভঙ্গ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না? এতকাল পরে এলেন তার কক্ষে, দাসী তাঁর চরণে একটি প্রণামও করতে পারলো না—প্রণামের অবকাশটুকুও তাকে দিলেন না!

কিলো বৌ, ঘুম ভাঙ্গলো?

চেয়ে দেখে রাজেশ্বরী সামনে দাঁড়িয়ে তার নির্মলা।

কে নির্মলা, এসো!

উঃ কি ঘুম রে তোর বৌ! নির্মলা বলে।

খুব ঘুমিয়েছি বুঝি?

দু-দুবার এসে দেখে গিয়েছি, অসাড়ে ঘুমুচ্ছিস। কাল রাতে বুঝি স্নানও করিসনি?

না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তা চল, দীঘিতে যাবি নাকি?

ঠাকরুন কোথায় নির্মলা?

কেন? মন্দিরে—

তাহলে চলো স্নানটা সেরেই একেবারে মন্দিরে যাবো।

চল।

খিড়কীর দুয়ার দিয়ে দুজনে এলো উদ্যানে। উদ্যানের দীঘি সাগরদীঘি রায়বাড়ির বৌ-ঝিদের ব্যবহারের জন্যই, বাইরের কোন পুরুষের সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল। তাই ভোর হলেও নিশ্চিন্তে রাজেশ্বরী নির্মলার সঙ্গে সঙ্গে দীঘির ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, রাজেশ্বরী যেন একটু বিস্মিতই হয়েছিল নির্মলার ব্যবহারে। নির্মলা ও সে প্রায় সমবয়সী হলেও নির্মলা তার দিকে বড় একটা ঘেঁষতো না কখনও। একটু যেন বিশেষভাবে রাজেশ্বরীকে বরাবর নির্মলা এড়িয়েই চলতো! এবং খুব প্রয়োজন না হলে বড় একটা রাজেশ্বরীর সঙ্গে নির্মলা কথাবার্তাও বলতো না। সেই নির্মলার ঈদৃশ আচরণটা রাজেশ্বরী ঠিক বুঝতে না পারলেও ঐ কারণে মনে তার কোন আক্ষেপ ছিল বলেও মনে হয় না।

তাই নির্মলা আজ তাকে নিজে তার শয়নকক্ষ থেকে যখন ডেকে নিয়ে এলো স্নান করবার জন্য দীঘিতে, পথে চলতে চলতে সেই কথাটাই ভাবছিল বোধহয় রাজেশ্বরী। কিন্তু তার চাইতেও বেশী ঐ সময় তার মনটা আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল গত রজনীর স্বপ্নের মতই সুখস্মৃতিটা। সব অঙ্গ দিয়ে গত রজনীতে সে স্বামীর সঙ্গে যে মিলনানন্দ উপভোগ করেছে সেই মিলনের আনন্দানুভূতিটাই। নাই থাকলো তার ঘরে আলো, না হয় ছিল অন্ধকার, তবু—তবু তো স্বামী তার কক্ষে পদার্পণ করেছিলেন!

অন্ধকারে সেই বলিষ্ঠ নিষ্পেষণের পুলকানুভূতি এখনও যেন তার সমস্ত দেহের রোমকূপে কূপে ছড়িয়ে আছে। গত রজনীর সেই সুখস্বপ্নের ঘোরটা যেন এখনও কাটেনি। রাজেশ্বরী যেন এখনও স্বপ্নের ঘোরেই পা ফেলে ফেলে চলে দীঘির ঘাটের দিকে।

কেন ভাঙ্গলো ঘুমটা? আর কিছুক্ষণ ঘুমোলে কিই বা ক্ষতি হতো কার?

কিংবা নাইবা যদি ভাঙ্গতো তার ঘুমটা তাতেও তো কোন ক্ষতি ছিল না! সেই রতি-সুখ-নিদ্রার মধ্যেই না হয় সে তলিয়ে যেতো, নিঃশেষে হারিয়ে যেতো চিরজন্মের মত! অখণ্ড অনির্বচনীয় সেই আনন্দ-স্বপ্নে কল্প-কল্পান্ত কাল ধরে না হয় সে মগ্ন হয়েই থাকতো!

কেন—কেন ভাঙ্গলো ঘুম? নির্মলার পাশে চলতে চলতে সেই উদ্যান-মধ্যস্থিত নির্জন পথরেখা ধরে রাজেশ্বরীর মনের মধ্যে সেদিন প্রভাতে এমনি কত আবোল-তাবোল চিন্তাটাই না উদয় হচ্ছিল।

আর রাজেশ্বরীর পাশে পাশে চলতে চলতে নির্মলার মনের মধ্যে যে কথাটা সেদিন বারবার উদয় হচ্ছিল, বলি বলি করেও যেন সেই কথাটা সে উচ্চারণ করতে পারছিল না। কোথায় যেন একটু সংকোচ, কোথায় যেন একটু দ্বিধা বুঝি বোধ করছিল নির্মলা। গত রাত্রে রাধারাণীর অলক্ষ্যে থেকে

থেকে সে অনেক কিছুই দেখেছে, আবার অনেক কিছুই দেখতে পায়নি। খানিকটা দেখলেও বেশীটাই তার অনুমান।

আর রাধারাণী! বিশ্বরূপার মন্দিরাভ্যন্তরে বসে জপ করতে করতে সহসা একটা পরিচিত শব্দে যেন চমকে ওঠে।

হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো !...পাল্‌কি-বেহারাদের মিলিত কণ্ঠস্বর যেন অগ্নি-গোলকের মতই রাধারাণীর শ্রবণ-বিবরকে এসে বিদ্ধ করলো। কি ব্যাপার! কে এলো পাল্‌কি চেপে এত ভোরে!

তবে কি পুত্র কন্দর্পনারায়ণই ফিরে এলো? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো তার ফিরবার কথা নয় মহল থেকে! জপ আর করা হয় না রাধারাণীর। উৎকর্ণ হয়ে একটা পরিচিত পদশব্দ শোনবার চেষ্টা করে রাধারাণী। যদি সত্যি সত্যিই কন্দর্পনারায়ণ হয় তো এখুনি সে পাল্‌কি থেকে নেমে সর্বাগ্রে সোজা তার চিরপ্রিয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রণাম করতে আসবে, তারপর আসবে বিশ্বরূপার মন্দিরে।

কি একটা অজানিত আশঙ্কায় রাধারাণীর বুকের ভিতরটা যেন ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। যদিও কাল নিশিরাতের ব্যাপারটা একান্ত সংগোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছে, কাকপক্ষীরও জানবার কথা নয় এবং একমাত্র যে জানতো তার দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহটাও মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছে সে, কিন্তু সে সময় তো একটা কথা তার একটিবারও মনে হয়নি, কন্দর্পনারায়ণের বিশেষ প্রিয়পাত্রই কালীচরণ, যখন কন্দর্পনারায়ণ কালীর সন্ধান করবে তখন কি জবাব দেবে রাধারাণী তার প্রশ্নের?

এই যে কালীচরণের মত দুর্ধর্ষ একটা মানুষ রাতারাতি উধাও হয়ে গেল—কন্দর্পনারায়ণ যদি কথাটা তার বিশ্বাস না করতে চায়? যদি বলে সে, মা আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা—তুমি রহস্য করছো!

যদি সে তার অনুসন্ধান শুরু করে দেয়? না বিশ্বাস করুক, করুক অনুসন্ধান যত খুশি তার—শুধু অনুসন্ধানই সার হবে, এ জীবনে আর তার কোন সন্ধান পেতে হবে না কাউকে।

আর পুত্রবধূ রাজেশ্বরী সম্পর্কেও রাধারাণী নিশ্চিন্ত। গুরুদেব করালীশঙ্কর বলেছেন, রাজেশ্বরী কিছুই জানতে পারবে না। যা কিছু ঘটেছে গত নিশায়, মন্ত্রঃপূত ঔষধির প্রভাবে সব কিছুই তার কাছে চিরদিন অজ্ঞাত থেকে যাবে।

তবে মিথ্যা রাধারাণীর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে কেন? হাতের মালা হাতেই ছিল, সহসা পরিচিত পদশব্দে মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই কন্দর্পনারায়ণের বিরাট দেহটা তার দৃষ্টিপথে পতিত হলো।

পুত্রও মন্দিরাভ্যন্তরে উপবিষ্ট জননীকে দেখতে পেয়েছিল। দূরে থেকেই মন্দির-দ্বারের চৌকাঠের উপরে প্রথমে বিশ্বরূপাকে প্রণাম করে মাতার উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানালো কন্দর্পনারায়ণ।

ভালো ছিলে তো মা ?

হ্যাঁ। তুমি এ সময় ফিরলে—এত শীঘ্র তো তোমার ফিরবার কথা ছিল না নারায়ণ !

না, তবে ওদিককার কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তাই চলে এলাম।

বেশ করেছো। যাও ভিতরে যাও, বস্ত্র পরিবর্তন করে আগে সুস্থ হও।

কন্দর্পনারায়ণ অন্দরের দিকে চলে গেল।

আসলে কিন্তু কন্দর্পনারায়ণ অন্য কারণে অত শীঘ্র কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিল।

ইদানীং স্ত্রী রাজেশ্বরীর সঙ্গে তার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকলেও, মনের মধ্যে রাজেশ্বরী সম্পর্কে অতীতের একটা দুর্বলতা তখনও অবশিষ্ট ছিল বুঝি কন্দর্পনারায়ণের।

কখনও এতটুকু কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে, স্বামীর সমস্ত অবহেলাকে নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়ে যে নিঃশব্দচারিণী পুত্রবধূ রায়-বাড়ির অন্দরে ইদানীং যেন ছায়ার মতই অবস্থান করছিল, তার প্রতি কন্দর্পনারায়ণের মনের মধ্যে তার অজ্ঞাতেই তখনও কিছুটা মমতা বুঝি অবশিষ্ট ছিল।

বিশেষ করে গত কয় রাত্রি রাজেশ্বরীকে নিয়ে তার বিচিত্র দুঃস্বপ্ন-স্মৃতিটা যেন কন্দর্পনারায়ণ মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না।

বিচিত্র স্বপ্ন ! এবং একই স্বপ্ন সে তিনরাত্রি পর পর দেখেছে। দীঘির জলে যেন রাজেশ্বরী ডুবে যাচ্ছে। আর দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হাসছে কবালীশঙ্কর।

বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও—

কন্দর্পনারায়ণ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে কিন্তু তবু রাজেশ্বরীকে উদ্ধার করতে পারেনি। কালো কালো পিচ্ছিল কতকগুলো লতা যেন রাজেশ্বরীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কেবলই টানছে তাকে নীচের দিকে—তাকে টেনে নিচ্ছে !

আপ্রাণ শক্তিতে চেষ্টা করেও কন্দর্পনারায়ণ রাজেশ্বরীকে উদ্ধার করতে পারেনি।

পর পর তিন রাত্রি কেন ঐ স্বপ্ন দেখলো কন্দর্পনারায়ণ ? তাই ছুটে এসেছে কন্দর্পনারায়ণ কলকাতায়—সেখানকার কাজ সব অর্ধ-সমাপ্ত রেখেই ছুটে এসেছে কলকাতায় কন্দর্পনারায়ণ। রাজেশ্বরীর কথা ভাবতে ভাবতেই অন্দরের দিকে হেঁটে চলে কন্দর্পনারায়ণ।

॥ ৪ ॥

নির্মলা !

কেন রে বৌ ?

বাবু কাল রাত্রে মহাল থেকে ফিরেছেন বুঝি রে ? প্রশ্নটা আর বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না রাজেশ্বরী। দীঘির শীতল জলে গলা পর্যন্ত

ডুবিয়ে পার্শ্বে জলের মধ্যে আবক্ষ-নিমজ্জিত নির্মলাকে প্রশ্নটা করে রাজেশ্বরী।

কি বললি—তোর বর?

হুঁ!

তোর কি মাথা খারাপ হলো বৌ?

কেন, মাথা খারাপ হতে যাবে কেন?

কিন্তু ছিঃ ছিঃ, নির্মলার কাছে সে কি বলা যায় নাকি? হাসি-হাসি মুখখানি তুলে কেবল তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী নির্মলার মুখের দিকে।

তা নয় তো কি স্বপ্ন দেখছিলি?

স্বপ্ন!

তোর বর আবার ফিরলো কবে? কালও তো সকালে শুনেছি মহাল থেকে ফিরতে তার এখনও পাঁচ-সাতদিন দেরি আছে—

কথাগুলো বলে আড়চোখে তাকালো নির্মলা রাজেশ্বরীর দিকে।

ঠাণ্ডা দীঘির জলে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত দেহটা তখন যেন রাজেশ্বরীর জমে একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে। তবে—তবে গতরাত্রের সব কি মিথ্যে? স্বপ্ন দেখেছে কি সে?

কিন্তু অন্ধকারে সেই বিশাল বলিষ্ঠ দুটি বাহুর পেষণ! শ্বাসরোধকারী সেই আলিঙ্গন! তারপর—তারপর সারাটা দেহে সেই আনন্দ, চরম পুলকের উপলব্ধি! না, না—কেমন করে মিথ্যে হবে, ঘুমের মধ্যে তো নয়, জাগরণে!

নির্মলা!

কি?

ঠিক সত্যি বলছিস তুই?

আ মরণ মাগীর! মিথ্যে বলতে যাবো কেন? কিন্তু কতক্ষণ আর জলের মধ্যে থাকবি, ওঠ! চল—

কিন্তু কে উঠবে তখন? নিমজ্জিত দেহটা তখন পাথরের মতই অনড়, অচল রাজেশ্বরীর।

তবে কি ঘটলো? কি ঘটলো কাল রাত্রে?

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে রাজেশ্বরীর; সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

চল, উঠ্‌বি নে বৌ?

কোন সাড়া দেয় না রাজেশ্বরী।

নির্মলা আবার ডাকে, বৌ!

উঁ—

ওঠ, চল—বেলা হলো যে অনেক!

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই যেন এবারে রাজেশ্বরী জল থেকে উঠে দীঘির রানার উপর দাঁড়ায়।

অনেক—অনেক পরে কন্দর্পনারায়ণ তার স্ত্রী রাজেশ্বরীর ঘরের দিকে পা বাড়ালো। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে যেন টানছে রাজেশ্বরীর ঘরটা তাকে আজ।

শুধু সেদিনেই নয়, মধ্যে মধ্যে যে রাজেশ্বরীর ঘরটা তাকে টানতো না তা নয়, কিন্তু নির্মলা—নির্মলার আকর্ষণ, তার অভিমানের ভয়, কন্দর্প-নারায়ণকে যেন ঐ ঘরের দিকে পা বাড়াতে দেয়নি।

অথচ এতকাল একটি দিনের জন্যও, একটিবারও নালিশ জানায়নি রাজেশ্বরী। দেখা যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একেবারে হয়নি বা হতো না তাও নয়, কিন্তু সেও যেমন আকস্মিক তেমনই যেন সংক্ষিপ্ত। ছোট্ট একটি প্রশ্ন হয়তো এবং ছোট্ট তার জবাব, হ্যাঁ বা না।

নিঃশব্দে স্ত্রীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কন্দর্প নারায়ণ স্ত্রীর শয্যার উপর এসে উপবেশন করলো। এবং খোলা জানালা-পথে বাইরের বাগানে বড় আমলকী গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কন্দর্পনারায়ণ।

কে!

চমকে ঘুরে তাকাতেই কন্দর্পনারায়ণের দুচোখের দৃষ্টি যেন আর ফিরতে চায় না। স্নানান্তে পরিধানে সিক্ত শাড়ি, রাজেশ্বরী দীঘির ঘাট থেকে একেবারে তার শয়নঘরে এসেই ঐ মুহূর্তে স্বামীকে ঘরের মধ্যে দেখে বিস্ময়ে যেন রাজেশ্বরী একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন শব্দই তার মুখ দিয়ে বের হয় না। মুহূর্তের জন্য বুঝি ভুলেও যায় যে সিক্ত বস্ত্র তার যৌবনস্ফুট দেহকে একেবারে জড়িয়ে রয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, ক্ষণপূর্বে নির্মলা যা তাকে বলেছিল, তার স্বামী নাকি এখনও মহাল থেকে ফেরেননি।

কিন্তু ঐ তো—ঐ তো তার স্বামী তার চোখের সামনে! উঃ সর্বনাশী নির্মলা এমনি ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল তাকে! মুহূর্তে রাজেশ্বরীর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্নিবার লজ্জায় সেই সিক্ত বস্ত্র নিয়ে দ্রুতপদে কক্ষান্তরে গিয়ে যেন রাজেশ্বরী স্বামীর দৃষ্টির সামনে থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

পাশের ঘরে এসে নিজেকে সামলাতে রাজেশ্বরীর আরও কিছুক্ষণ যায়।

শুধু রাত্রির অন্ধকারেই নয়, দিনের আলোতেও স্বামী তার ঘরে এসেছেন! কতদিন—কতদিন পরে স্বামী তার ঘরে এলেন!

বস্ত্র পরিবর্তন করে রাজেশ্বরী পুনরায় যখন তার শয়নঘরে প্রবেশ করলো কন্দর্পনারায়ণ তখনও তেমনি ভাবেই শয্যার উপর বসে আছে।

কতদিন ঐ পা দুটি ছুঁয়ে প্রণাম করেনি রাজেশ্বরী! গলবস্ত্রা হয়ে রাজেশ্বরী উপবিষ্ট স্বামীর পায়ের তলায় মাথা নত করলো।

রাজু!

রাজেশ্বরী তাকাল স্বামীর মুখের দিকে!

অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কন্দর্পনারায়ণ রাজেশ্বরীর মুখের দিকে। স্নানসিক্ত দু-একগাছি চূর্ণ কুন্তল রাজেশ্বরীর শঙ্খশুভ্র চারু কপালখানির উপর লতিয়ে নেমেছে। এত সুন্দরী রাজেশ্বরী! কেমন করে এতকাল ভুলেছিল সে ঐ মনোমোহিনীকে? অনাদরে এই নারীর প্রতি এই দীর্ঘদিন কন্দর্পনারায়ণ কিনা একবারও ফিরে তাকায়নি!

কয়েকটা মুহূর্ত পরস্পরের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দুজনেই নির্বাক। কারো মুখে কোন কথা নেই।

সহসা একসময় কন্দর্পনারায়ণ উঠে দাঁড়ায়।

যাচ্ছো!

হ্যাঁ, যাই—

আর একটু বোস।

এখন নয়—

তবে কখন?

হাত বাড়িয়ে রাজেশ্বরীর চিবুকটা সস্নেহে ঈষৎ নেড়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কন্দর্পনারায়ণ বলে, রাত্রে।

তারপর এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

দরজার কাছবরাবর গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায় কন্দর্পনাবায়ণ, আসতে যদি একটু রাত হয়, ঘুমিয়ে পড়ো না কিন্তু, কেমন!

আচ্ছা।

ঘুমোবে না তো?

না।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ো না—আমি আসবো।

কন্দর্পনারায়ণ কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। রাজেশ্বরী ঘরের মধ্যে পূর্ববৎ দাঁড়িয়েই থাকে।

দাসী গঙ্গা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, বৌমা!

য়্যাঁ! ফিরে তাকালো রাজেশ্বরী গঙ্গার ডাকে।

রাণীমা ডাকছেন তোমাকে ঠাকুরঘরে।

যা, যাচ্ছি।

বিশ্বরূপার মন্দিরের পূজার আয়োজন সেই মায়ের প্রতিষ্ঠার দিনটি থেকে রাধারাণী নিজেই স্বহস্তে করে এসেছে। আর শ্যামসুন্দরের পূজার যাবতীয় ভার রাজেশ্বরী এ বাড়িতে বধূ হয়ে আসবার পর থেকে রাধারাণী তারই হাতে তুলে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের যাবতীয় কাজ রাজেশ্বরী আনন্দেই করতো। ভোরের আলো ভালো করে ফুটে ওঠার আগেই, সেই যে রাজেশ্বরী শ্যাম-সুন্দরের মন্দিরের এসে প্রবেশ করতো—পুরোহিত তর্কালঙ্কার ঠাকুর এসে পূজা শেষ না করে যাওয়া পর্যন্ত মন্দিরেই থাকতো রাজেশ্বরী। আবার

সন্ধ্যার দিকে এসে আরতির ব্যবস্থা করতো এবং রাত্রে শয়ন-আরতি শেষ হলে তবে অন্দরে যেতো।

ঐ নিত্যনৈমিত্তিক শ্যামসুন্দরের সেবায় এই সুদীর্ঘ দশ বৎসরের এতটুকু ত্রুটিও হয়নি কখনও রাজেশ্বরীর। শেষকালে তো ইদানীং কয়েক বৎসর ধরে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় ছিন্ন হয়ে আসায় রাজেশ্বরী শ্যামসুন্দরকেই সমস্ত মন প্রাণ ও চিন্তা যেন সমর্পণ করেছিল।

ইদানীং শয়ন-আরতির পর তর্কালঙ্কার ঠাকুরের প্রস্থানের পরও তাই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রায়ই রাজেশ্বরীর শ্যামসুন্দরের মন্দিরেই কেটে যেতো। কোথায় কোন্ শূন্য শয়নঘরে প্রতীক্ষায় রজনী জাগতে যাবে, তার চাইতে এই তো ভাল!

সম্মুখে তার শ্যামসুন্দর ও রাধার যুগল মূর্তি। মাথায় শিখী-চূড়া, গলে বনমালা, অধরে হাসি, হাতে মোহন বাঁশরী।

যাক না ঐ মুখখানির দিকেই চেয়ে চেয়ে রাত কেটে! অনেক শান্তি এখানে—কেঁদেও বুঝি শান্তি এখানে!

শ্যামসুন্দরের সমস্ত দায়িত্ব পুত্রবধূ রাজেশ্বরীর উপর অর্পণ করলেও রাধারাণী একেবারে নিশ্চিত হয়ে থাকতো না কখনও, একবার শ্যামসুন্দরের মন্দিরটা ঘুরে যেতোই। সেদিনও মায়ের মন্দিরের পূজার আয়োজন শেষ করে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে এসে রাধারাণী দেখলো, রাজেশ্বরী তখনও মন্দিরে আসেনি।

রাতের শয্যাতেই ঠাকুর তখনও শুয়ে আছেন। ক্ষণকাল যেন মনে মনে কি ভাবলো রাধারাণী, তারপর নিজেই কাজ করতে শুরু করে দেয় এবং পূজার আয়োজনে সে যখন ব্যস্ত—ঐ সময় গঙ্গাদাসী তার খোঁজে আসায় বলে, যা তো গঙ্গা, বোমাকে পাঠিয়ে দেগে—বোমা এলে আমি যাচ্ছি।

গঙ্গা চলে গেল।

সলজ্জ কুণ্ঠিতপদে মন্দিরে প্রবেশ করে শাশুড়ীকে পাটায় চন্দন ঘষতে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো রাজেশ্বরী। মৃদুকণ্ঠে বললে, আমাকে আগে ডেকে পাঠাননি কেন মা?

কেমন যেন কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকালো রাধারাণী পুত্রবধূর মুখের দিকে। যেন অবাকই হয়ে যায় রাধারাণী পুত্রবধূর আনন্দোজ্জ্বল হাসি হাসি মুখখানি দেখে।

তোমার বিলম্ব দেখে আমিই সব গুছিয়ে রেখেছি বোমা। কেবল চন্দনটা ঘষা বাকী।

আপনি উঠুন মা, আমি ঘষে রাখছি।

নারায়ণ ফিরে এসেছে, শুনেছো?

শাশুড়ীর কথায় নত দৃষ্টিতে সলজ্জভাবে মৃদু ঘাড়টা একবার হেলায় রাজেশ্বরী।

রাধারাণী উঠে দাঁড়ায়।

তাহলে তুমি এদিকটা দেখো, আমি একবার দেখে আসি—গুরুদেবের পূজাহ্নিক বোধ হয় সারা হলো।

রাধারাণী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

চন্দন-পাটার সামনে বসে রাজেশ্বরী চন্দর ঘষায় মন দেয়। সামনেই তামার টাটে একরাশ বকুল ও চাঁপা ফুল। সেই পুষ্পসুবাস ও চন্দনগন্ধ মেশামিশি হয়ে রাজেশ্বরীর নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করে।

চন্দন ঘষতে ঘষতে রাজেশ্বরী তাকাল সামনেই সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মান শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধার দিকে। ঠাকুর—ওগো প্রেমের দেবতা, সত্যিই কি এতদিন পরে তাকিয়েছো মুখ তুলে এই অভাগিনীর দিকে!

রাজেশ্বরীর নিমীলিত দুই চক্ষুর কোণ বেয়ে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করতে থাকে। হায়? কে জানতো হত-ভাগিনী রাজেশ্বরীর জীবনে আবার এমনি সুদিন আসবে!

নিয়মিত সূর্য সেদিনও অস্ত যায়। নিত্যকার মত সেদিনও সন্ধ্যায় ধূসর ছায়া ঘনিয়ে আসে। নিজের ঘরে বসে নির্মলা কবরী বন্ধন করে, প্রসাধনে দেহকে সাজিয়ে তোলে। কপালে কাঁচপোকার টিপ, চক্ষে কজ্জল, ওষ্ঠে তাম্বুলরাগ।

দর্পণে প্রতিফলিত নিজের দেহ-প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে নির্মলা।

রায়বাড়ির ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ওঠে। পুরাঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি করে। ক্রমে ক্রমে মায়ের মন্দির ও শ্যামসুন্দরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির বাদ্যধ্বনি থেমে গেল।

বহির্মহলের বিরাট ফরাসের উপর উপবিষ্ট কন্দর্পনারায়ণ। সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বৃদ্ধ নায়েব উমাচরণ। মাথার উপরে উজ্জ্বল ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটি আলোকিত। সহসা দ্বারের বাহিরে নারীকণ্ঠে চাপা ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল।

কে? কে যেন বাইরে কাঁদছে কাকা? ব্যগ্রকণ্ঠে কন্দর্পনারায়ণ উমাচরণকে প্রশ্ন করলো।

দেখছি—

উমাচরণ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন ব্যস্ত হয়ে।

স্পষ্ট শুনতে পায় ঘরে বসেই কন্দর্পনারায়ণ উমাচরণের গলা।

আ মোলো, মাগী কেঁদেই ভাসালো! বলবি তো নচ্ছার মাগী কি হয়েছে?

নারীকণ্ঠে চাপা কান্না তখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

এই মাগী, চুপ কর বলছি—

কন্দর্পনারায়ণ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

চত্বরে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বারো তেরো বছরের একটি কিশোর বালকের হাত ধরে অবগুণ্ঠনবতী এক নারী।

কে কাকা? কানাই না—সঙ্গে ও কে? কন্দর্পনারায়ণ প্রশ্ন করে।

কালীর পরিবার সৈরভী।

কি হলো, ও কাঁদছে কেন; কি হয়েছে?

এতক্ষণে কালীর পরিবার সৈরভী কাঁদতে কাঁদতে বলে, কাল সেঁজের বেলায় সেই যে মিনসে ঘর থেকে বের হয়ে এলো এ-বাড়িতে কাজ আছে বলে, এখনও ফিরলো না!

সে কি? কালীকে কোথাও আপনি পাঠিয়েছেন নাকি কাকা?

না, কালীর সঙ্গে তো দুদিন দেখাই হয়নি আমার।

তবে সে কোথায় গেল? মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল? মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসুক না, মা যদি কোথায়ও তাকে কোন কাজে পাঠিয়ে থাকেন!

কালীর ছেলে কানাই-ই এবারে জবাব দেয়, অন্দরে কত্তামার কাছে গিয়েছিলাম বাবু, তিনি কিছু জানেন না।

আশ্চর্য! কোথায় যাবে তাহলে সে?

সৈরভী কন্দর্পনারায়ণের পায়ের সামনে আছড়ে কেঁদে পড়ে, হেই গো কত্তা, মিন্‌সে আমার কোথায় গেল বল?

তুই বাড়ি যা সৈরভী, আমি দেখছি সে কোথায় গেল। যাবে আর কোথায় —তুই কিছু ভাবিসনি যা।

কাঁদতে কাঁদতে সৈরভী ছেলের হাত ধরে চলে গেল।

ব্যাপার কি বলুন তো কাকা? গেল কোথায় লোকটা? কন্দর্পনারায়ণ শুধায় উমাচরণকে।

আমি তো কিছুই জানি না। তবে পরশু একবার সন্ধ্যার দিকে গুরুঠাকুরের সঙ্গে নাটমন্দিরের একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম।

গুরুঠাকুরের সঙ্গে!

হ্যাঁ।

উমাচরণের কথা শুনে রীতিমত যেন বিস্ময়ই বোধ করে কন্দর্পনারায়ণ।

করালীশঙ্করের সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকারে নাটমন্দিরে কি এমন কথা বলছিল কালীচরণ! সে যাক, আপনি একটু খোঁজ নিন তো এখুনি।

যাচ্ছি। দেখছি খোঁজ নিয়ে।

হাঁ, খোঁজ পেলে আমাকে জানাবেন।

রাত্রি দশটা নাগাদ উমাচরণ এসে যে সংবাদ দিলেন তাতে কন্দর্পনারায়ণের বিস্ময় যেন আরও বেড়ে যায়। গতরাত্রে, মধ্যপ্রহর তখন উত্তীর্ণপ্রায়, দেউড়ির পাইক রামসিং নাকি কালীচরণকে নাটমন্দিরের দিকে যেতে দেখেছিল।

আশ্চর্য! অত রাত্রে কালী নাটমন্দিরের দিকে কি করতে গিয়েছিল? প্রশ্ন করে কন্দর্পনারায়ণ।

আমিও তো বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা ! উমাচরণ বলেন ।

॥ ৫ ॥

বহুকাল পরে আজ রাজেশ্বরীর কক্ষে যাবে বলে কন্দর্পনারায়ণ মদ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। কিন্তু কালীচরণের ব্যাপারে কন্দর্পনারায়ণের মনটা কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং চিন্তিত মনেই একসময় কন্দর্পনারায়ণ আহারের নিমিত্ত অন্দরে যায় ।

আহারের সামনে বসে কিন্তু কন্দর্পনারায়ণ আজ একটু বিস্মিতই হয়, বরাবর জননী তার আহারের সময় অদূরে একটি আসন পেতে বসেন, রাধারাণীর সেটি বহুদিনের অভ্যাস। আজ আসনটি শূন্য। মা উপস্থিত নেই।

এতদিন পরে সে মহাল থেকে ফিরেছে, সারাটা দিন তেমন মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয়নি। কন্দর্পনারায়ণ ভেবেছিল আহারে বসে মা হয়তো এটা-ওটা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। কারণ বিষয়-সম্পত্তি ও কাজ-কারবার সম্পর্কে প্রত্যহ না হলেও প্রায়ই পুত্রের সঙ্গে আলোচনা করে রাধারাণী জেনে নেয় সব কিছু।

আজ তাই মায়ের অনুপস্থিতিতে কন্দর্পনারায়ণ যেন একটু বিস্মিতই হয়।

বিধবা বোন হৈমবতীকে শুধায়, মা কোথায় রে হৈম ?

মা ঘরে শুয়ে আছেন।

শরীর খারাপ নাকি ?

জানি না।

হুঁ।

অতঃপর কোনমতে আহার্যপর্ব সমাপ্ত করে কন্দর্পনারায়ণ উঠে পড়ে এবং মুখ প্রক্ষালন করে সোজা মায়ের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। রাধারাণী শয্যায় শুয়ে !

মা !

নীচের ভূ-শয্যায় সোদামিনী শুয়েছিল। সে বললে, কত্তামা ঘুমোচ্ছে।

কন্দর্পনারায়ণ মার শয়নঘর থেকে বের হয়ে এলো ।

আরও একটু রাত গভীর না হলে রাজেশ্বরীর শয়নঘরে গিয়ে কোন লাভ নেই। কারণ সংসারের কাজ শেষ করে তবে সে শয়নঘরে যাবে।

বহির্মহলেই যাবার জন্য অলিন্দপথে অগ্রসর হয় কন্দর্পনারায়ণ। অন্দর ও বহির্মহলের সংযোগ ঐ অলিন্দপথটি সাধারণত নির্জন। আলোর পর্যাপ্ততাও তেমন নেই। সামান্য একটা দেওয়ালগিরি অপ্রশস্ত অলিন্দপথটিকে তেমন আলোকিত করতে পারে না, আবছা একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে মাত্র।

অন্যমনস্কভাবে কন্দর্পনারায়ণ সেই আলো-আঁধারির মধ্যে দিয়ে ধীর পদে বহির্মহলের দিকে চলেছে, সহসা পশ্চাৎ থেকে পৃষ্ঠদেশে কার মৃদু করাঙ্গুলি স্পর্শে চমকে ফিরে তাকায় সে।

কে ?

আস্তে। আমি।

অস্পষ্ট নারীমূর্তি আলো-আঁধারির মধ্যে।

নির্মলা?

হ্যাঁ। আমার ঘরে এসো।

আজ নয় নির্মলা, কাল যাবো।

এসো, এসো—জরুরী কথা আছে।

কাল শুনবো।

না, এসো—

না নির্মলা, কাল যাবো।

বৌয়ের ঘরে যাবে তো? তা যেও'খন!

তুমি—তুমি কেমন করে জানলে যে বৌয়ের ঘরে যাবো?

জানি গো জানি। কিন্তু হঠাৎ বৌয়ের প্রতি এত দরদ উথলে উঠলো কেন এতদিন পরে বল তো?

দরদ আবার কি, এমনি। যেতে নেই নাকি বৌয়ের ঘরে?

তা যাবে না কেন, একশ'বার যাবে। তোমার বিয়ে করা বৌ, পরস্ত্রী তো নয়!

নির্মলা!

কি? তারপরই হেসে ফেলে নির্মলা বলে, কিন্তু যাক্‌গে সে কথা। পেলে তোমার কালীর কোনো সন্ধান?

চম্‌কে ওঠে নির্মলার কথায় যেন কন্দর্পনারায়ণ। বলে, না—

জানি। পাবে না তার সন্ধান—

কি, কি বললে?

কি আবার, তার সন্ধান কোনো দিনই আর পাবে না।

কথাটা বলেই নির্মলা আর সেখানে দাঁড়ায় না। চকিতে অন্ধকারে ক্ষিপ্রপদে অলিন্দের অন্য প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

নির্মলা। নির্মলা!

অলিন্দের অন্য প্রান্ত থেকে ক্ষীণ একটা হাসির রেশ ভেসে এলো মাত্র।

নির্মলার ঘরটা কন্দর্পনারায়ণের তো অজানা নয়। অন্দরমহলের পশ্চিম প্রান্তে নিম্নতলের একখানা ঘর।

সোজা এসে কন্দর্পনারায়ণ নির্মলার ঘরেই প্রবেশ করে। ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল, দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে কন্দর্পনারায়ণ ভেতর থেকে দরজার অর্গল তুলে দিল।

ঘরের কোণে উঁচু পিলসুজের উপর প্রজ্বলিত প্রদীপের সলিতাটা একটা তামার কাঠির সাহায্যে ধীরে ধীরে উস্কে দিচ্ছিল নির্মলা, ঘরের মধ্যে কন্দর্পনারায়ণকে প্রবেশ করতে দেখে একবার তার দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে আবার নিজের কাজে মন দেয়। কোন কথাই বলে না।

কন্দর্পনারায়ণ সোজা এসে নির্মলার পশ্চাতে দাঁড়ায়।

অপরূপ সাজে সেজেছে আজ নির্মলা। অঙ্গে নীলাম্বরী শাড়ি, তাতে জরির সূক্ষ্ম কাজ করা। কবরীতে একটি বকুলের মালা জড়ানো।

নির্মলা!

কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করলে কেন? বৌ যদি জেনে ফেলে?

একটু আগে অলিন্দে কালী সম্পর্কে কি বলছিলে তুমি?

পূর্ববৎ প্রদীপের সলিতাটা কাঠির সাহায্যে উস্কাতে উস্কাতে নির্মলা বলে, কি আবার বলছিলাম!

বলিষ্ঠ দুহাতে সহসা নির্মলাকে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে কন্দর্প-নারায়ণ ডাকে, নির্মলা!

আঃ ছাড়ো ছাড়ো, লাগে না বুঝি?

কালীর কি হয়েছে আগে বল?

কালীর কি হয়েছে তা আমি কি করে জানবো?

নির্মলা!

প্রদীপের আলোয় এতক্ষণে কন্দর্পনারায়ণের চোখের তারার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই নির্মলা সহসা যেন কেমন চমকে ওঠে। নির্মলা জানতো না যে কন্দর্পনারায়ণের কতখানি প্রিয় ছিল কালীচরণ। শৈশবের খেলার সাথী বন্ধু এবং প্রথম যৌবনের নিত্যসহচর।

নির্মলা!

কি?

কি হয়েছে কালীর বল? কোথায় সে?

আমি—আমি জানি না।

নির্মলার কাঁধটা বলিষ্ঠ দু'হাতে ধরে টেনে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কঠোর কণ্ঠে এবারে কন্দর্পনারায়ণ বলে, তুমি জানো, বল শিগগির।

বিশ্বাস করো, আমি—

নির্মলা!

সে, সে আর—

কি—কি হয়েছে? বল বল—

সে আর বেঁচে নেই।

অ্যাঁ সে কি! বেঁচে নেই মানে? সে মারা গেছে?

হ্যাঁ, মারা গেছে।

কি বলছো নির্মলা?

কত্তামা তাকে দু-টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে।

নির্মলা! আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে কন্দর্পনারায়ণ, একথা সত্য? সত্যি বলছো, মা তাকে দু-টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে?

হ্যাঁ—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর যে উপলব্ধি করতেও কিছুক্ষণ সময় লাগল

কন্দর্পনারায়ণের। তার মা কালীকে দু-টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে! কিন্তু কেন? কেন—কেন কেটে ফেললো? না না—নির্মলা তুমি মিথ্যা বলছো!

মিথ্যা নয়, সত্যিই বলছি।

কিন্তু কেন? কেন কেটে ফেললো মা তাকে?

জানি না—আমি জানি না।

নির্মলা! আবার বাঘের মতই গর্জন করে ওঠে কন্দর্পনারায়ণ।

ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় কন্দর্পনারায়ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে যেন কেমন সিঁটিয়ে যায় নির্মলা।

বলিষ্ঠ দু-হাতে নির্মলার গলাটা চেপে ধরে বাঘের মতই পুনর্বার গর্জন করে কন্দর্পনারায়ণ বলে, তুমি জানো, বল মা কেন তাকে হত্যা করেছে?

জানি না, আমি জানি না—আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে নির্মলা।

জানো নিশ্চয়ই তুমি জানো—বল, বলতেই হবে তোমাকে। বলতে বলতে নির্মলার গলাটার উপর আরও চাপ দেয় কন্দর্পনারায়ণ।

জানি না, জানি না—

জানো জানো—নিশ্চয়ই জানো।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—জানি—জানি—

বল, বল—

গলাটা আমার আগে ছেড়ে দাও—হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে শ্বাস টেনে টেনে বলে নির্মলা।

বল! গলা ছেড়ে দিল কন্দর্পনারায়ণ।

নিদারুণ উত্তেজনায় তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে, বললে, বল!

কাল রাত্রে—

কি—কি কাল রাত্রে?

বলছি, বলছি—সে, মানে কালী—রাজেশ্বরী—তোমার স্ত্রীর ঘরে ঢুকে-ছিল।

কি—কি বললি! নির্মলা হারামজাদী, সবাই তোর মত ভ্রষ্টা স্বৈরিণী নয়, তোকে খুন করে ফেলবো! বলতে বলতে সহসা পরক্ষণেই আবার যেন বাঘের মতই হাত বাড়িয়ে নির্মলার গলাটা পুনরায় দু'হাতে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে কন্দর্পনারায়ণ অন্ধ আক্রোশে। ঝাঁকুনি দিতেই একসময় নির্মলার জ্ঞানহীন দেহটা গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে নেতিয়ে পড়ে।

নির্মলার জ্ঞানহীন দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পরক্ষণেই ঘরের দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে যায় কন্দর্পনারায়ণ ঝড়ের বেগে। ফিরেও তাকায় না পশ্চাতে।

স্বামী আসবেন! আবার কতকাল পরে আজ রাত্রে তার ঘরে স্বামী আসবেন! নিজে বলেছেন তিনি আসবেন তার ঘরে! জেগে থাকবে বৈকি। নিশ্চয়ই সে জেগে থাকবে। ঘুমোতে কি সে পারে? না, না—কিন্তু এখনও

আসছেন না কেন ? কত রাত হয়ে গেল, এখনও আসছেন না কেন ? রাজরাণীর মতই সেজে অপরূপ সাজে রাজেশ্বরী পালঙ্কের দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় জেগে বসেছিল।

সহসা দড়াম করে ভেজানো দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

পরক্ষণেই খোলা দ্বারপথে ঝড়ের মতই যেন কন্দর্পনারায়ণ এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

সহাস্যমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে পরক্ষণেই যেন পাথর হয়ে যায় রাজেশ্বরী স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই।

এ কি!

মাথার বাবরী চুল আলুথালু—ভ্রুকুটি-কুটিল চক্ষের দৃষ্টি!

স্বৈরিণী—

চিৎকার করে ওঠে আক্রোশে ও বেদনায় কন্দর্পনারায়ণ।

মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মতই যেন শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী।

কি—কি বললে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ,—স্বৈরিণী! ভ্রষ্টা—কলঙ্কিনী—

খাপমুক্ত অসির মতই যেন মুহূর্তে ঋজু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় রাজেশ্বরী। মাথার গুণ্ঠন স্খলিত হয়ে পড়েছে। অঞ্চল ভূমিতে লুটোচ্ছে—কোন্ সাহসে মদ খেয়ে আমার ঘরে তুমি ঢুকেছো ? এটা তোমার জলসাঘর নয়—

থাম্ হারামজাদী! লাথি মেরে ও-মুখ একেবারে থেঁতো করে দেবো! এতটুকু লজ্জা, এতটুকু ঘৃণা হলো না তোর ? তুই না রায়বাড়ির বৌ—তুই কিনা নির্লজ্জ কামুকের মত এবাড়ির চাকর অস্পৃশ্য শূদ্র কালীর সঙ্গে—

থাম—থাম! উঃ আর শুনতে পারছি না গো! আর শুনতে পারছি না! দু কানে হাত চাপা দিয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে রাজেশ্বরী যেন বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর মতই।

তোকে স্পর্শ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে! তুই মর মর—বিষ খেয়ে না হয় সাগরদীঘিতে ডুবে মর—না হয় গলায় দড়ি দে, গলায় দড়ি দে—

বলতে বলতে ঝড়ের মত ক্ষণপূর্বে যেমন কন্দর্পনারায়ণ রাজেশ্বরীর ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল, তেমনই ঝড়ের বেগে পুনরায় ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

অপমান, ক্ষোভ ও দুঃসহ ঘৃণার অগ্নিদাহে বুকখানা যেন তার তখন জ্বলে পুড়ে একেবারে খাক্ হয়ে যাচ্ছে। এ কি হলো! তার এ কি হলো!

রাজেশ্বরী শেষ পর্যন্ত কিনা—উঃ, শত বৃশ্চিক-দংশনে যেন বিষ ছড়ায় সর্বদেহে কন্দর্পনারায়ণের। পাগলের মতই ছুটে যায় সে জলসাঘরে।

সুরা, সুরা—সর্ব বিস্মৃতিদায়িনী সুরা! কিন্তু সুরার আলমারিটায় চাবি দেওয়া। পাছে নেশার টানে আজ অন্যান্য রাতের মত মদ্যপান করে বসে বলে নিজ হাতে সুরার আলমারিতে আজ সন্ধ্যার পূর্বে চাবি দিয়ে আটকেছিল কন্দর্পনারায়ণ।

চাবিটা যে কোথায় রেখেছে এখন আর মনে পড়ে না! প্রচণ্ড এক মুষ্টাঘাতে আলমারির কাচ ভেঙে ফেলে কন্দর্পনারায়ণ। ভাঙা কাচে হাতের কব্জির অনেকখানি কেটে গিয়ে দর দর ধারায় রক্ত পড়তে থাকে।

পাগলের মতই যেন আলমারি থেকে একটা বোতল টেনে নিয়ে কোনমতে মুখ দিয়ে কামড়ে ছিপিটা খুলে বোতলের সমস্ত নির্জলা সুরা ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দেয়। তরল আগুন শৈল্মিক ঝিল্লী পোড়াতে পোড়াতে গলা দিয়ে নেমে যায়।

রাজু—রাজেশ্বরী—এ কি করলো! এ সে কি করলো। কত আশা নিয়ে যে আজ তার কক্ষে সে নিশিযাপন করবে স্থির করেছিল!

॥ ৩ ॥

নির্মলার লুপ্ত-জ্ঞান একসময় ধীরে ধীরে ফিরে আসে।

প্রদীপের সলিতাটা পুড়তে পুড়তে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পিট্ পিট্ করে একটা শব্দ হচ্ছে। নিঃশেষিত-প্রায় সলিতার আলোয় স্বল্পালোকিত ঘরটি। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে হাতের উপর ভর দিয়ে নির্মলা উঠে বসলো। মাথাটা যেন লোহার মতই ভারী। অসহ্য ব্যথায় গলার চারপাশের পেশীগুলো টন টন করছে!

নির্মলার ঘরটা মহলের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বলে এদিকটা রাত্রে একেবারে নির্জন মনে হয়। তাছাড়া মধ্যরাত্রির সুষুপ্তিমগ্ন রায়বাড়ি। ঘুম নেমেছে রায়-ভবনের নাড়িতে নাড়িতে।

অস্পষ্ট চিন্তা ক্রমশ নির্মলার মস্তিষ্কের কোষে কোষে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ধোঁয়াটে অনুভূতিটা যেন ক্রমশ একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে পড়ে—নির্মলার ধীরে ধীরে সবই মনে পড়ে। লজ্জা, অপমান ও আক্রোশে বুকের ভিতরটা নির্মলার যেন জ্বলতে থাকে। সেই সকালবেলা থেকে আক্রোশের আগুনে পুড়ছিল নির্মলা, যে মুহূর্তে গোপনে আড়াল থেকে রাজেশ্বরীকে সম্বোধন করে কন্দর্পনারায়ণের কথাগুলো সে শুনেছিল। এতদিন পরে কন্দর্পনারায়ণ ফিরে এলো, তাও কিনা রাত কাটাবে সে রাজেশ্বরীর ঘরে! এই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত বিনিদ্র রজনীর পর রজনী এমনি করে শেষ পর্যন্ত রাজেশ্বরী ব্যর্থ করে দেবে তার! রাজেশ্বরী—যার ঐশ্বর্যকে সে আজ হাতের মুঠোর মধ্যে ভরে বিজয়িনী—সেই রাজেশ্বরীই কিনা আজ কন্দর্পনারায়ণকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে! না, কিছুতেই তা হতে পারে না!

অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনাই সে সহ্য করেছে। স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একটি দিনের জন্যও স্বামীর শয্যা স্পর্শ করেনি, স্বামীকে তাকে স্পর্শ করতে দেয়নি পর্যন্ত···সে ঐ কন্দর্পনারায়ণের জন্যই না!

রাধারাণী যখন নির্মলার বিবাহের সব স্থির করে ফেলেছে, আসন্ন উৎসবে রায়বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠছে, গোপনে গভীর রাত্রে সে যখন চোখ বুজে জাগ্রত অবস্থাতেই হৈমবতীর পাশে শুয়েছিল, কন্দর্পনারায়ণ এসে তাকে

অন্ধকারে চুপি চুপি পাঁজাকোলা করে তুলে সোজা একেবারে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়—উঃ, সে কি ভয়! তারপর নির্জন সেই ছাদে ক্ষীণ তারার আলোয় দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। নির্মলা, সত্যিই তাহলে তোমার বিয়ে! কন্দর্পনারায়ণ শুধায়।

হ্যাঁ—তাতে হয়েছে কি?

হয়েছে কি মানে? তোমার স্বামী তোমাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে না?

আমি গেলে তবে তো নিয়ে যাবে!

সত্যি বলছো নির্মলা?

দু'হাতে কন্দর্পনারায়ণের গলা জড়িয়ে ধরে তার বক্ষে মুখ গুঁজে বলেছিল নির্মলা, নিশ্চয়ই—

কিন্তু স্বামী যদি তোমায় জোর করে—

জোর!

হ্যাঁ—

তাহলে জ্যান্ত নির্মলাকে নয়, তার মৃতদেহটাই নিয়ে যেতে হবে।

মনে থাকবে তো?

থাকবে। কিন্তু তোমারও চিরদিন এমনি নির্মলার কথা মনে থাকবে তো?

কন্দর্পনারায়ণ কোন জবাব দেয়নি সে কথার, কেবল নিবিড় আলিঙ্গনে নির্মলার দেহটা বক্ষের উপর চেপে ধরেছিল।

বৌ রাজেশ্বরীর নেশা তার আগেই কন্দর্পনারায়ণের কেটে গিয়েছিল। সেই নির্মলার কাছ থেকে রাজেশ্বরী আজ তার কন্দর্পনারায়ণকে ছিনিয়ে নেবে! শুধু কি তাই—

রাধারাণী—কত্তামা একমাত্র তিনিই জানেন তাদের গোপন সম্পর্কের কথাটা। কিন্তু নির্মলা জানে উপায় নেই বলেই এবং ছেলের প্রকৃতি অজানা নেই বলেই রাধারাণী তাদের এই সম্পর্কটা সহ্য করে যায়। কিন্তু আজকের ঘটনার পর হয়তো আর সে সহ্য করবে না।

রাজেশ্বরীকে সে শেষ করেছে। রাধারাণী—কত্তামা, হ্যাঁ, তাকেও আজ শেষ করতে হবে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো নির্মলা এবং খুঁজতে খুঁজতে বহির্মহলে একেবারে জলসাঘরে এসে হাজির হলো।

তিন-তিনটি বোতল শেষ হয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে জলসাঘরের। আগুন জ্বলছে তখনো কন্দর্পনারায়ণের সর্ব দেহে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

নির্মলা এসে জলসাঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষণকালের জন্য তাকিয়ে দেখলো কন্দর্পনারায়ণের দিকে চেয়ে, তারপর শ্লেষভরা কণ্ঠে বলল, মদ্যপান করে ভুলবার চেষ্টা করছো! করো, করো—

নেশায় রক্তিম আঁখি তুলে তাকালো কন্দর্পনারায়ণ, কে? নি-র্ম-লা! এসো—বো-বোস। একটু খা-খাবে?

না, ও অমৃত তুমিই খাও। এবারে ছেলের বাপ হবে—আনন্দে ও অমৃত তুমিই পান করো! বাঃ চমৎকার, তোমার গর্ভধারিণীর ব্যবস্থা, কুলগুরু দিলেন নিয়োগপ্রথার নির্দেশ—আর শাশুড়ী ঠাকরুন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিল রাত্রে বধূমাতার শয়নকক্ষে—

কি—কি বললি নির্মলা—মুহূর্তে যেন নেশা কেটে যায় কন্দর্পনারায়ণের। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ.—শুধাও না গিয়ে জননীকেই তোমার—

হারামজাদী! হাতের অর্ধসমাপ্ত বোতলটাই ছুঁড়ে মারলো কন্দর্পনারায়ণ জোরে নির্মলাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু নেশার জন্যই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

জলসাঘরের নিরেট পাকা দেওয়ালে লেগে মদের অর্ধশূন্য বোতলটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

নির্মলা চকিতে সরে দাঁড়ালো।

খুন করবো, আজ তোকে খুনই করবো—

কিন্তু ততক্ষণে নির্মলা ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছে।

কিন্তু ছুটে পালালেও নির্মলা পারবে কেন কন্দর্পনারায়ণের সঙ্গে! মদমত্ত অবস্থাতেই ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে নির্মলার টুঁটি চেপে ধরে কন্দর্পনারায়ণ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে তারই বিস্রস্ত পরিধেয় শাড়ির আঁচলটা দিয়ে নির্মলার গলায় ফাঁস দিয়ে পাকাতে শুরু করে পৈশাচিক আক্রোশে কন্দর্পনারায়ণ।

চোখ দুটো ঠিকরে বের হয়ে আসে, নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে নির্মলার। দেহটা এলিয়ে পড়ে। সেই এলানো শ্লথ দেহটা পিঠের উপর তুলে নিয়ে কন্দর্পনারায়ণ গৃহের পশ্চাতে উদ্যানের দীঘির দিকে ছুটে যায়।

চারিদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে উদ্যানের গাছ-পালাগুলো যেন এখানে-ওখানে স্তূপীকৃত ভৌতিক ছায়ার মত জমাট বেঁধে আছে। কোথায়ও এক বিন্দু হাওয়া নেই। প্রচণ্ড একটা ঝড়ের পূর্বে যেন সমস্ত বিশ্বচরাচর থমথম করছে।

উন্মাদ আক্রোশে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কন্দর্পনারায়ণ নির্মলার দেহটা নিয়ে দীঘির জলে নেমে নরম পাঁকের মধ্যে অর্ধেক প্রোথিত করে আবার উঠে আসে।

সর্বাঙ্গে তখন তার বিষের ক্রিয়া চলেছে। ধারালো নখরাঘাতে নিজের দেহ নিজেরই ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে ইচ্ছা করছে। ছুটে চললো এবারে বিশৃঙ্খল পদে কন্দর্পনারায়ণ তার মায়ের শয়নকক্ষের দিকে।

মা—তার নিজের গর্ভধারিণী জননী—এতবড় সর্বনাশটা তার করলো!

মা—মা—

সেরাত্রে চোখে ঘুম ছিল না রাধারাণীরও। জেগে ঘুমের ভান করে চোখ বুজে মড়ার মত শয্যায় পড়েছিল, যখন কন্দর্পনারায়ণ তার ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল। কন্দর্পনারায়ণ যে তার প্রিয় অনুচর কালীচরণের সংবাদ নিতে তার কাছে আসবে তা রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল—যে মুহূর্তে সৈরভী তার

স্বামীর খোঁজে তার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল সন্ধ্যার দিকে।

তার সাড়া না পেয়ে কন্দর্পনারায়ণ ফিরে গেল বটে, কিন্তু এত সহজে তো মীমাংসা হবে না ব্যাপারটার। আজ হোক কাল হোক কন্দর্পনারায়ণ ব্যাপারটার মীমাংসা করতে চাইবেই। এবং শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বের হয়ে আসে তখন কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবে রাধারাণী তার ছেলের সামনে!

এমনিতেই কন্দর্পনারায়ণ অত্যন্ত মাতৃভক্ত। কিন্তু সে তার পিতার এক-গুঁয়েমি, জিদ ও আক্রোশ পুরোমাত্রাতেই পেয়েছিল এবং একবার ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলে তাকে শান্ত করা রাধারাণীর দুঃসাধ্য হবে তাও সে জানতো।

তাছাড়া কুলগুরু করালীশঙ্করের উপরে পিতা সুমন্তনারায়ণের মতোই সে-ও সন্তুষ্ট নয়। করালীশঙ্করকে ঠিক সে পছন্দও করে না।

শেষ পর্যন্ত নিদ্রার ভান করে শয্যায় আর শুয়ে থাকতে পারে না রাধারাণী। শয্যা থেকে উঠে পায়ে পায়ে সে রাজেশ্বরীর শয়নঘরের দিকে যায়। পূর্বেই শুনেছিল রাধারাণী আজ পুত্র তার বধূর ঘরে রাত্রিযাপন করতে আসবে।

কিন্তু দরজার গোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হতেই পুত্রের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে সহসা থমকে দাঁড়িয়ে যায় রাধারাণী। তপ্ত শলাকার মতই পুত্রের প্রতিটি কথা রাধারাণীর শ্রবণবিবরে এসে বিদ্ধ করে।

স্বৈরিণী—ভ্রষ্টা—কলঙ্কিনী—

সর্বনাশ! সব তো তাহলে ইতিমধ্যে পুত্রের কর্ণগোচর হয়েছে! আর সেখানে অপেক্ষা করে না রাধারাণী। দ্রুতপদে রাধারাণী তখনি একেবারে নিম্নতলে গুরুদেব করালীশঙ্করের কক্ষে গিয়ে হাজির হয়। নিশ্চিন্তমনে করালীশঙ্কর কারণবারি পান করছিলেন।

গুরুদেব!

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে করালীশঙ্করের সামনে দাঁড়ালো রাধারাণী।

কে? এ কি রাধারাণী—

সর্বনাশ হয়েছে দেবতা!

সর্বনাশ! কিসের সর্বনাশ?

কন্দর্পনারায়ণ সব জেনে ফেলেছে।

সে কি! শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন করালীশঙ্কর।

হ্যাঁ—

উপায়?

উপায় আর কিছু দেখছি না, এখুনি এই মুহূর্তে এখান থেকে আপনি পালান। নচেৎ সে হয়তো আপনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলবে।

পালাবো, কিন্তু কেমন করে? এই নিশিরাত্রে—

বিলম্ব করবেন না দেবতা, বিলম্বে সর্বনাশ ঘটবে!

কন্দর্পনারায়ণের বিরাট পেশীবহুল চেহারাটা করালীশঙ্করের মানসপটে

ক্ষণিকের জন্য ভেসে ওঠে। যেমন রাগী তেমনি প্রচণ্ড গোঁয়ার লোকটা!

কি হবে তাহলে রাধারাণী—

করালীশঙ্কর প্রায় কেঁদে ফেলেন। নেশা তখন তাঁর টুটে গিয়েছে।

আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি···

ব্যবস্থা—কি ব্যবস্থা তুমি করবে রাধা?

ঘাটে পানসি আছে চলুন—রাতারাতি বদন মাঝিকে বলবো আপনাকে হুগলী পৌঁছে দিতে। সেখান থেকে আপনি অন্য নৌকায় চেপে কাটোয়া চলে যাবেন।

তাই, তাই চল মা, তুমি আমাকে বাঁচাও। তারা ব্রহ্মময়ী—একি নিদারুণ বিপাকে ফেললি মা তোর এ অধম সন্তানকে—

আসুন আপনি আমার সঙ্গে—

চল মা চল—

খিড়কির দ্বারপথে বের হয়ে রাধারাণী করালীশঙ্করকে নিয়ে একেবারে গঙ্গার ঘাটের দিকে চললো।

কন্দর্পনারায়ণের ছয় মাল্লার পানসি বনমালী সরকারের ঘাটেই বাঁধা থাকে। বাঁধানো ঘাট। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে ভাগীরথী-বক্ষে। রাত্রির তৃতীয় যামে দুজনে এসে ঘাটে পৌঁছালেন।

বিরাট পত্রবহুল বটবৃক্ষটি ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে। নিশীথের হাওয়ায় বট-বৃক্ষের পাতায় পাতায় শিপ শিপ শিপ শিপ একটা শব্দ হচ্ছে। ঘাটের পাশেই পানসি বাঁধা থাকে।

বদন! বদন!

রাধারাণীর দু-তিন ডাকেই বদন মিঞার সজাগ ঘুম ভেঙে গেল।

কে রে! কে ডাকে?

নৌকার পাটাতনেই ঘুমিয়ে ছিল বদন মাঝি।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়—কে?

বদন, এদিকে আয়!

ঘাটের উপর এসে দাঁড়াতেই নিশীথের মৃদু আলোয় পলকমাত্র রাধা-বাণীকে দেখেই চিনতে পারে বদন মাঝি।

সবিস্ময়ে বলে ওঠে, রাণীমা! কিন্তু নিশিরেতে গাঙের ঘাটে এলেন কেন রাণীমা! আমাকে একটা হুকুম পাঠালেই হতো—

বড্ড জরুরী দরকার বদন।

বলেন!

গুরুদেবকে রাতারাতি যে হুগলী পৌঁছে দিতে হবে বদন।

তাই তো রাণীমা, গাঙে যে এখন জোয়ারের টান—উজান ঠেলে রাতারাতি তো হুগলী পৌঁছানো যাবে না রাণীমা!

চেষ্টা করে যেমন করে হোক পৌঁছে দিতেই হবে।

বেশ, চেষ্টার কসুর হবে না রাণীমা—

করালীশঙ্করকে একেবারে নৌকায় চাপিয়ে রওনা করে দিয়ে রাধারাণী ফিরে এলো।

নিজের ঘরে ঢোকার পরমুহূর্তেই টলতে টলতে এসে কন্দর্পনারায়ণ ঘরে ঢুকলো, মা?

কে!

দড়াম করে মায়ের পায়ের উপর আছড়ে পড়লো কন্দর্পনারায়ণ পরক্ষণেই এবং আক্ষেপভরা কণ্ঠে বলে উঠলো, 'এ—এ তুমি কি করলে মা, এ তুমি কি করলে মা, এ তুমি কি করলে! এমনি করে মা হয়ে তোমার পুত্র ও পুত্রবধূর বুকে ছুরি বসালে!

পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকে রাধারাণী। নির্বাক নিস্পন্দ। একটি ছোট্ট সান্ত্বনা-বাক্যও তার কণ্ঠ হতে বের হয় না।

বল মা বল—কেন, কেন এ কাজ করলে?

নির্বাক নিস্পন্দ রাধারাণীর দুই চক্ষু বেয়ে কেবল দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

কোন—কোন কথাই সে বলতে পারে না।

উঃ, এর চাইতে এক বাটি করে বিষ তুমি তোমার পুত্র ও পুত্রবধূর মুখে তুলে দিলে না কেন মা!

নারায়ণ অধীর হয়ো না, এ শাস্ত্রের নির্দেশ, গুরুর নির্দেশ—

কথাটা রাধারাণীর শেষ হলো না।

ক্ষিপ্তের মতই ঘূর্ণিত লোচনে উঠে দাঁড়ালো এবারে কন্দর্পনারায়ণ এবং কঠিন কণ্ঠে বললে, শাস্ত্রের, গুরুর নির্দেশ—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই হারামজাদা শয়তান—ওকে, ওকে আমি জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো! বলতে বলতে ঘর থেকে একপ্রকার যেন ছুটেই বের হয়ে গেল কন্দর্পনারায়ণ।

কিন্তু কোথায়? কোথাও খুঁজে পায় না কন্দর্পনারায়ণ করালীশঙ্করকে!

কন্দর্পনারায়ণের তখন আর বুঝতে বাকী থাকে না সবই তার মায়ের কারসাজি। মা নিশ্চয় পূর্বেই সব জানতে পেরে তাকে কাটোয়ায় প্রেরণ করেছেন রাতারাতি।

শয়নঘর থেকে টোটা-ভর্তি দোনলা বন্দুকটা নিয়ে তখুনি ছুটে যায় কন্দর্পনারায়ণ গঙ্গার ঘাটের দিকে। কতদূর—কতদূর পালাবে সেই শয়তান!

কিন্তু গঙ্গার ঘাটে পেঁছে কন্দর্পনারায়ণ দেখলো বড় পানসিটা নেই। ছোট পানসিটাই আছে—তার মাঝিই সংবাদটা দিল।

ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র করালীশঙ্করকে নিয়ে রাণীমার নির্দেশে বদন মাঝি হুগলীর দিকে গিয়েছে।

একলাফে পানসিতে উঠে কন্দর্পনারায়ণ মাঝিকে নির্দেশ দেয়, চল্—আগের পানসি যেমন করে হোক ধরতে হবেই। প্রাণপণে বেয়ে চল্—

চারটে দাঁড় একসঙ্গে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জলের উপর পড়লো।

ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্—একসঙ্গে চার-চারটে দাঁড় জল কেটে চলে।

পাটাতনের ওপর টোটা-ভর্তি দোনলা বন্দুকটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কন্দর্পনারায়ণ একদৃষ্টে আলোছায়া-ঘেরা গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে সম্মুখে।

॥ ৭ ॥

জ্বলে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গ বিষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে রাজেশ্বরীর। হায় অভাগিনী রাজেশ্বরী! সহস্র সহস্র ক্লেদাক্ত ক্রিমিকীট যেন সর্ব দেহ তার ছেঁকে ধরেছে। এ কি হলো, এ কি হলো তার! ঘুমের ঘোরে সুধাভ্রমে আকণ্ঠ গরল পান করলো সে!

কাকে—কাকে সে দেহ দিল?

শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী সে শেষে কিনা এমনি করে তার সতীত্বকে জলাঞ্জলি দিল! স্বৈরিণী সে, কুলটা সে ভ্রষ্টা—

শ্যামসুন্দর, এ কি করলে প্রভু, তুমি এ কি করলে! এমনি করে হতভাগিনীর মাথায় এই দুঃসহ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে! কি—কি অপরাধ করেছিল অভাগিনী রাজেশ্বরী তোমার ও চরণে?

বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় জলে ডুবে মর।

হাঁ, হাঁ,—মরবে, মরবে নিশ্চয়ই মরবে। মরবে বৈকি, মরবে।

দুড়ুম!

প্রচণ্ড সেই শব্দটা উন্মুক্ত গঙ্গাবক্ষে একটা শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যাবার পূর্বেই মনুষ্যকণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

কন্দর্পনারায়ণের অব্যর্থ নিশানা ব্যর্থ হয়নি সেদিন। করালীশংকরের গুলিবিদ্ধ দেহটা ঝপাং করে পড়ে গেল গঙ্গার জলে।

কাছাকাছি একেবারে পাশেই এসে গিয়েছে তখন কন্দর্পনারায়ণের পানসি। গঙ্গার ঘোলাটে জলে খানিকটা রক্ত, তারপরই গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললো। আক্রোশ তখনও বুঝি মেটেনি কন্দর্প-নারায়ণের। দ্বিতীয়বার আবার ভাসমান সেই দেহটার উপরে গুলি চালাল কন্দর্পনারায়ণ। আবার দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে শব্দ উঠলো—দুড়ুম!

তারপরই শুরু হল বৃষ্টি। উঃ, সে কি মুষলধারায় বর্ষণ! আর মেঘের হুংকার ও বজ্রপাত!

ফিরে চল্ বদন।

হতভম্ব হতচকিত যেন হয়ে গিয়েছিল দুই নৌকার বারোজন মাল্লা ও দুজন মাঝি। কর্তার ঐরূপ প্রচণ্ড আক্রোশভরা মূর্তি ইতিপূর্বে তো তারা দেখেনি! নৌকার মুখ ফিরাল তারা।

তারপর সমস্তটা দিন ধরে সে কি বৃষ্টি! সেই প্রচণ্ড বারিধারা মাথায় করে, ঘাটে নৌকা লাগাবার পর গৃহে যখন সর্বাঙ্গসিক্ত কন্দর্পনারায়ণ ফিরে

এলো, সমস্ত রায়-ভবন তখন গভীর শোকে যেন স্তব্ধ জমাট বেঁধে আছে।

হতভাগিনী রাজেশ্বরী পরিধের শাড়িটা গলায় বেঁধে ফাঁস দিয়ে তার বিষের জ্বালা নির্বাপিত করেছে গোশালার মধ্যে। অজস্র ফুল দিয়ে রাজেশ্বরীর মৃতদেহটাকে ঢেকে পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় প্রস্তরমূর্তির মতই সম্মুখে বসে আছে রাধারাণী।

উন্মাদের মত বন্দুকটা হাতে কন্দর্পনারায়ণ এসে দাঁড়ালো। পুরাঙ্গনারা, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসীর দল চারপাশে দাঁড়িয়ে নির্বাক।

ক্ষণকাল, মাত্র ক্ষণকাল সেই সিক্তবস্ত্রে উন্মাদের দৃষ্টিতে সেই পুষ্পে ঢাকা শবদেহের দিকে তাকিয়ে কন্দর্পনারায়ণ সোজা গিয়ে প্রবেশ করলো তার জলসাঘরে পুনর্বার। তারপর শুরু হলো আবার বোতলের পর বোতল সুরাপান।

রাত্রি আরও গভীর হতে থাকে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। আকাশ পরিষ্কার তবে মাটি ভিজে। আকাশের কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই যেন আর। ঝকঝক করছে একরাশ তারা কালো রাত্রির আকাশটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত।

বিরাট ধনী রায়বাড়ির ব্যাপার। গোপনেই তাই রাত্রির অন্ধকারে রায়-বাড়ির পশ্চাতে উদ্যানের মধ্যে চিতা সাজিয়ে রাজেশ্বরীর মৃতদেহটা তুলে দেওয়া হলো। পুত্রসন্তান তো নেই, হতভাগিনীর মুখাগ্নি আর হলো না।

তবে মুখাগ্নি না হলেও দেহাগ্নি হলো এবং রাতের অন্ধকারেই রাধারাণীর সাধের স্বর্ণপ্রতিমা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর সেই চিতার আগুন যতক্ষণ না নির্বাপিত হলো, একজোড়া চক্ষু নির্নিমেষে চেয়েছিল সেই ঊর্ধ্ব-মুখী অগ্নির লেলিহান রক্তাভ শিখাগুলির দিকে। সে চক্ষু দুটি রাধারাণীর।

আশ্চর্য! শেষরাতের দিকে আবার আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি নেমে সেই চিতার আগুন দিয়ে গেল নিভিয়ে।

কিন্তু সেই যে কন্দর্পনারায়ণ গিয়ে জলসাঘরে প্রবেশ করেছিল, তিন দিন তিন রাত্রি আর সে ঘর থেকে বেরও হলো না, ঘরের দরজাও খুললো না।

রাধারাণী গেল, হৈমবতী গেল, উমাচরণ গেলেন, কিন্তু কারোর ডাকেই সাড়া দিল না কন্দর্পনারায়ণ। তারপর আরও একটা দিন ও রাত্রি চলে গেল তবু খুললো না সেই জলসাঘরের অর্গলবদ্ধ দ্বার।

শেষ পর্যন্ত উমাচরণ লোক ডাকিয়ে দরজা ভেঙে ফেললেন।

মড় মড় শব্দে দরজার কপাট দুটো ভেঙে যেতেই ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধ উমাচরণ যেন প্রেত দেখার মতই নিজের অজ্ঞাতে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে সভয়ে দু-পা পিছিয়ে এলেন।

কড়িকাঠের সঙ্গে সুমন্তনারায়ণের একমাত্র বংশধর কন্দর্পনারায়ণের বাসি ফুলে-ওঠা মৃতদেহটা যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত ঝুলছে। আর সমস্ত ঘরময় ছড়ানো একরাশ শূন্য মদের বোতল। একপাশে পড়ে আছে বন্দুকটা!

সংবাদটা রাধারাণীর কানে পৌঁছতেও দেরি হলো না। ছুটে এলো

রাধারাণী এবং ছুটে গিয়েই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো। অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো রাধারাণী সেই ঝুলন্ত মৃতদেহটার দিকে। নির্বাক নিস্পন্দ। তারপর সহসা দড়াম করে জ্ঞান হারিয়ে সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল।

চার রাত চার দিন পরে জ্ঞান ফিরে এলো রাধারাণীর। চোখ মেলে চেয়ে কেবল দুটি কথা বললে, আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ নেই, নেই!

রায়বাড়ির ইতিহাস তো এইখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা তো কই হলো না! কেমন করেই বা হবে? রাধারাণী তো তারপরও অনেক দিন বেঁচে ছিল।

সুমন্তনারায়ণ গিয়েছেন, বিধবা কঙ্কাবতী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে প্রাণ দিয়েছে, রূপবতী স্বামী-পুত্র সহ তার নিজ স্বামীগৃহে অকস্মাৎ একদিন অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, রাজেশ্বরী গিয়েছে এবং কন্দর্পনারায়ণও গিয়েছে।

থাক'র মধ্যে রয়েছে তখনও রাধারাণী, বিধবা মেয়ে হৈমবতী—সৌদামিনীর মা। পুরুষজন বলতে অতবড় রায়বাড়িতে বৃদ্ধ নায়েব উমাচরণ, আমলা গোমস্তা কর্মচারী ও ভৃত্যের দল। অন্দরে শুধু মেয়েরা।

অতবড় বিরাট রায়বাড়িটা হঠাৎ যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। নিষ্ঠুর কিন্তু তাতেও কি এ বিষের জ্বালা জুড়াবে? এ অগ্নিদাহ কি নিভবে?

নিশ্চয়ই, এ কলঙ্ক-কালিমা-মাখা মুখ আর সে দিনের আলোয় কাউকে দেখাবে না। এই নিশিরাত পোহাবার আগে—মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে অভাগিনী রাজেশ্বরী।

কাঁদুক রাজেশ্বরী কাঁদুক—রায়বাড়ির শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী অভাগিনী বধূরাণী কাঁদুক।

বিভূতি তার হাতের কলমটা থামিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালো। বাইরের অন্ধকারে ঝোপে ঝোপে জোনাকির বাতিগুলি তেমনি জ্বলছে নিভছে।

রায়বাড়ির ইতিহাস বিভূতিকে সমাপ্ত করতেই হবে। সুমন্তনারায়ণের রোজনামচা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু সৌদামিনীর বর্ণিত কাহিনী।

অসংলগ্ন অসংবদ্ধ কাহিনী, এই পাতার পর পাতা সাজিয়ে চলেছে বিভূতি।

স্পষ্ট—স্পষ্ট যেন বিভূতির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভূলুণ্ঠিতা হতভাগিনী সেই বধূটির ক্রন্দনরতা মূর্তি। দু-কান ভরে তার যেন বাজছে সেই হতভাগিনীর বুক-ভাঙা কান্নার সুরটা।

গত মাস দেড়েক ধরে বিভূতি ক্লাসে যায় না। সুস্মিতা শেষ পর্যন্ত তার ঠিকানা অফিস-ক্লার্কের কাছ থেকে যোগাড় করে তার এই হালিশহরের বাসাতেই এসে হাজির হয়েছিল গতকাল দ্বিপ্রহরে। বাড়িতে কেউ ছিল না।

ও একাই ছিল। সব বাড়িসমেত শান্তিপুরে রাসের মেলায় গিয়েছে।

চৌকির উপর বসে বসে বিভূতি লিখছিল। চপ্পলের শব্দ ও সেই সঙ্গে পরিচিত ইভনিং ইন্ প্যারির সুগন্ধটা নাকে যেতেই চোখ তুলে ও তো অবাক!

এ কি, তুমি!

হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বল তো?

দামী সিল্কের শাড়িটা নিয়েই সুস্মিতাকে চৌকির একপাশে বসে পড়তে দেখে বিভূতি বলে, দাঁড়াও, একটা চেয়ার নিয়ে আসি।

শুধু চেয়ার, একটা সিংহাসন আনবে না! উঃ সত্যি, মহাবীরকে তোমার বাড়ি খুঁজে বের করতে যা নাজেহাল হতে হয়েছে!

সে কি! গাড়িতে করেই সোজা এসেছো নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বললে না? পড়াশুনা ছেড়ে দিলে নাকি? বলতে বলতে পরক্ষণে বিভূতির সামনের খোলা খাতাটার দিকে নজর পড়তে বলে, ও কি লিখছো?

ইতিহাস।

ইতিহাস!

হ্যাঁ—সুমন্তনারায়ণ রায়ের ইতিহাস।

সুমন্তনারায়ণ! কে সে?

সৌদামিনী ঠাকরুনের মাতামহ। শুনবে তাঁর ইতিহাস?

শুনবো।

বিভূতি পড়তে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি।

সুস্মিতা বলেছিল, তারপর?

আর একদিন শোনাবো।

কবে?

শীগ্‌গিরই।

ঠিক তো?

ঠিক।

বিভূতি আবার কলমটা তুলে নেয়। আবার লিখতে শুরু করে।

আলো ফোটেনি সে রাত্রের শেষে। রাত্রিশেষের আকাশটা কালো কালো মেঘে একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া। ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বলিষ্ঠ হাতের চারটি দাঁড় জলের বুকে পড়ছে উঠছে, আবার উঠছে পড়ছে।

যেমন করে হোক বড় পানসিটাকে ধরা চাই-ই! জোরে, আরও জোরে দাঁড় চালা! অস্থির কণ্ঠে বলে কন্দর্পনারায়ণ।

নৌকার মাল্লারা সভয়ে একবার তাদের কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও দ্রুত দাঁড় টানে। আহত বাঘের মতই কর্তার চোখের মণি দুটো যেন জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে। শক্ত মুষ্টিতে বন্দুকের কালো ইস্পাতের নলটা চেপে ধরে পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছে কন্দর্পনারায়ণ।

ভদ্রকালীর কাছাকাছি আগের বড় পানসিটার নাগাল পাওয়া গেল। ঐ দূরে উজান ঠেলে ঠেলে চলেছে বড় পানসিটা।

হুই কর্তা—হুই পানসী যায়।

টান, জোরে দাঁড় টান—অস্থির কণ্ঠে বলে কন্দর্পনারায়ণ।

মাত্র যখন হাত-দশেকের ব্যবধানে দুটো নৌকা, চিৎকার করে কন্দর্পনারায়ণ ডাকে, বদন, পানসি থামা! শুনতে পেয়েছিল বদন সে ডাক নিশ্চয়ই, কারণ প্রথম ভোরের ঝাপসা আলোয় অস্পষ্ট হলেও তারপরই দেখা গিয়েছিল একটা দীর্ঘ মনুষ্যমূর্তি আগের পানসিতে দাঁড়িয়ে।

কড়-কড় করে মেঘ ডেকে উঠলো। বিদ্যুতের একটা অগ্নি-ইশারা কালো আকাশের বুকটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য যেন চিরে দিয়ে গেল। আর সেই ক্ষণিক আলোর চোখ-ঝলসানো দীপ্তিতে স্পষ্ট এবারে কন্দর্পনারায়ণের চোখের দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো চকিতে অদূরবর্তী পানসিতে দণ্ডায়মান করালীশংকরের কষ্টিপাথরের মতই কালো দীর্ঘ দেহটা।

চকিতে কন্দর্পনারায়ণ বন্দুকটা তুলে নিল হাতে এবং অগ্রবর্তী পানসির মূর্তিকে লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপলো।

নির্মম হাতে কে যেন সমস্ত প্রাণশক্তির গলা টিপে ধরেছে।

রায়-ভবনের কর্ত্রী—সর্বময়ী কর্ত্রী আজও রাধারাণীই।

রাধারাণী যেন হঠাৎ প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে। দিনেরবেলা ঘর অন্ধকার করে এক কোণে চুপচাপ বসে থাকে, তারপর রাত্রি যখন অন্ধকারে ঘন হয়ে ওঠে, বিরাট রায়-ভবনের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ একাকী কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সবাই ঘুমোয়, কিন্তু রাধারাণীর চোখে ঘুম নেই। না, না—ঘুমোতে পারে না রাধারাণী। চোখ বুজলেই সেই ছায়াটা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মা, মা—কি, কি করেছিলাম আমি মা, যে আমাকে তুমি এমনি করে বিষ দিলে ?

বৌমা—বৌমা—আমাকে তুই ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর--

আবার কখনও বা একটা মশাল হাতে, একটা খুরপি নিয়ে রায়বাড়ির পশ্চাতের উদ্যানে এখানে ওখানে মাটি খুঁড়ে বেড়ায় রাধারাণী।

সেদিন নিশিরাত্রে রাধারাণী বহুকাল পরে আবার গিয়ে প্রবেশ করলো তার স্বামীর শয়নঘরে। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ নয় বৎসর স্বামীর ঐ ঘরে ঢোকেনি রাধারাণী।

ঘরের যেখানকার যেটি ঠিক যেন তেমনি আছে। ঐ ঘরের মধ্যে নিজে না এলেও নিয়মিত ঘরটি তার নির্দেশে ধোয়া মোছা ও পরিষ্কার করা হতো এবং ধূপধুনা ও সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হতো। ঘরের মধ্যে একপাশে সুমন্তনারায়ণের বিরাট পালঙ্কটা, তারই পাশে সুমন্তনারায়ণের বিরাট কাঠের সিন্দুকটা। এক কোণে প্রদীপটা জ্বলছে। সারারাত অমনি করেই জ্বলে

প্রদীপটা। ঘরে ঢুকে দ্বারে অর্গল তুলে দিল রাধারাণী।

তারপর ধীর পদে এসে দাঁড়াল সেই বিরাট সিন্দুকটার সামনে। আঁচল থেকে চাবি খুলে সেই চাবির সাহায্যে সিন্দুকের বিরাট তালাটা খুলে সিন্দুকের ডালাটা তুলে ফেললো।

থাকে থাকে ঝাঁপি-ভর্তি বাদশাহী সোনার মোহর, আর্কট-টাকা, সিককা-টাকা, কোম্পানির টাকা আর হীরা, জহরৎ, সোনার তাল ও পাত।

একটা জীবনে প্রচুর জমিয়েছিলেন সুমন্তনারায়ণ। সুমন্তনারায়ণের একমাত্র পুত্র কন্দর্পনারায়ণের ঐ সিন্দুকে হাত পড়েনি, হাত দেবার সুযোগও হয়নি, কারণ সিন্দুকের চাবিটা রাধারাণী স্বামীর মৃত্যুর বহুপূর্বেই তার নিজের আঁচলে বেঁধে ফেলেছিল। আঁচল ভর্তি করে যতটা পারলো রাধারাণী সোনাদানা মোহর বেঁধে নিয়ে আবার সিন্দুকে চাবি দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো।

কালীচরণকে যে রাধারাণীই হত্যা করেছিল, কথাটা কেমন করে না জানি তার বিধবার কানে উঠেছিল। দিবারাত্র তাই সৈরভী কাঁদছিল।

পরের দিন একজন পাইক পাঠিয়ে সৈরভীকে ডেকে পাঠালো সন্ধ্যার দিকে রাধারাণী।

ভয়ে ভয়ে সৈরভী এসে হাজির হলো রাধারাণীর সামনে।

আগের রাত্রির সেই আঁচলভর্তি সোনা-দানা সৈরভীকে আঁচল পাততে বলে সেই আঁচলে ঢেলে দিয়ে রাধারাণী বললে, এই নে, তোর ছেলে বড় হলে ব্যবসা করাস, আর পাইকের কাজে দিস না।

অত সোনা-দানা একসঙ্গে দেখে সৈরভী সত্যি যেন কেমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। মুখ দিয়ে তার শব্দ বের হয় না।

আর যদি কখনও শুনি যে তুই কেঁদেছিস তো জ্যান্ত তোকে আর তোর ছেলেকে মাটিতে পুঁতে ফেলবো। যা—

কর্ত্রীঠাকরুণের মুখের দিকে চেয়ে সৈরভী তখন পালাতে পারলে বাঁচে। ছুটে সে রায়বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। আর কখনও তার বা তার ছেলের ছায়া পর্যন্ত কেউ রায়বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখেনি।

আর সৈরভীকে ছুটে পালাতে দেখে রাধারাণী খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। হাসি তো নয়, যেন প্রেতিনীর হাসি—রায়বাড়ির প্রেতিনী হাসছে।

শুধুই কি হাসি! প্রেতিনী কখনও হাসে কখনও কাঁদে।

দিনমানে ঘরের বাইরে ভুলেও আসে না। অন্ধকারে এক কোণে গুম হয়ে বসে থাকে আর কি যেন বিড়বিড় করে আপনমনে বলে। আর রাত্রে ছায়ার মত প্রেতিনীটা সুবিশাল রায়-ভবনের চত্বরে অলিন্দে উদ্যানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

তারপর একদিন দুটি নবাগতের পরিবারবর্গসহ পদার্পণ ঘটলো রায়-বাড়িতে। কন্দর্পনারায়ণের দুই জ্ঞাতিভ্রাতা। সূর্যনারায়ণ রায় ও চন্দ্রনারায়ণ রায়। সূর্য রায় ও চাঁদ রায়।

সূর্য রায়ের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে, আর কনিষ্ঠ চাঁদ রায়ের বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। সর্বাঙ্গে ও বেশভূষায় দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। সূর্যনারায়ণ—সঙ্গে তাঁর বধূ যোগমায়া ও চারটি কঙ্কালসার সন্তান—দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা এবং সর্বদেহে তার পঞ্চম সন্তানের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

চন্দ্র রায় মৃতদার, সঙ্গে তার একমাত্র অষ্টমবর্ষীয় মাতৃহারা বালক বীরভদ্র।

হাটখোলার ঘাটে এসে নৌকা ভিড়িয়ে কোনরূপ সংবাদ দেবার অপেক্ষা মাত্রও না করে আগে সূর্যনারায়ণ ও তার পশ্চাতে আর সকলে এসে একটা যেন ছোটখাটো ভুখা মিছিলের মতই রায়বাড়ির কাছারী ঘরে এসে একের পর এক প্রবেশ করলো।

বৃদ্ধ উমাচরণ কাছারী ঘরে নিজের নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে গত সনের বাকী বকেযাটা খতিয়ে দেখছিলেন, সামনে দাঁড়িয়ে খাজাঞ্চী হরিহর।

ওদের ঐসময় কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে পুরু কাচের চশমার অন্তরাল থেকে দৃষ্টি তুলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, আপনারা?

সূর্যনারায়ণ তাঁর সে কথার কোন জবাব না দিয়েই কনিষ্ঠের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, চন্দ্র, তাহলে ওদের নিয়ে তুমি ভিতরে যাও—

চন্দ্র রায় সকলকে নিয়ে অন্দরের দিকে পা বাড়ালো।

ওরে কে আছিস! এক ছিলিম তামাক দে—একটু কড়া করে আনিস বাবা—বলে উমাচরণের সামনেই বিনা আহ্বানে ফরাসের উপর জুত করে বসে নিজের গোঁফের প্রান্তভাগটা দুই আঙুলের মাথায় পাকাতে পাকাতে উমাচরণের দিকে তাকিয়ে এবার সূর্য রায় বললেন, নায়েব কে?

আমি। উমাচরণ বললেন, কিন্তু আপনারা?

আমরা!

হ্যাঁ—মানে—

কিন্তু নায়েবমশাই, উচিত কর্তব্য কি আপনারই ছিল না একটা সংবাদ দেওয়া যে কন্দর্প রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়েছে—তা যাক—আমি কে, তাই না?

হ্যাঁ, আপনি—

নবগ্রামের বিষ্ণুনারাযণের এক ভ্রাতা ছিলেন, মানে সহোদর কীর্তিনারায়ণ—তারই পৌত্র আমি সূর্যনারায়ণ—

ও—

একটা বুঝি ঢোক গিললেন উমাচরণ।

রায়বাড়ির নতুন প্রভু। পরিচয় পেতে সকলের দেরিও হলো না।

জ্যেষ্ঠ সূর্যনারায়ণ কেবল যে মাতাল তাই নয়, উচ্ছৃংখলতায় ও স্বৈরাচারের দম্ভে বুঝি সুমন্তনারায়ণকেও ডিঙিয়ে যেতে পারেন।

আর কনিষ্ঠ চন্দ্রনারায়ণ বা চাঁদ রায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নির্ঝঞ্ঝাট দিলদরিয়া মানুষ। মাথায় লম্বা বাবরী চুল, গাল পর্যন্ত নামানো

জুলপি। মদ নয়—তার গঞ্জিকার নেশায় সর্বদাই দুটি চক্ষু রক্তাভ ও ঢুলু ঢুলু। এবং কণ্ঠে সর্বদাই সঙ্গীতের সুর গুনগুনিয়ে চলেছে।

কিন্তু মাতাল ও উচ্ছৃংখল হলেও সূর্য রায় রায়বাড়িতে পা দিয়ে জাঁকিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-আশয় টাকাকড়ির একটা চুল-চেরা হিসাব আদায় করে তবে উমাচরণকে নিষ্কৃতি দিলেন। এবং একমাস পরে সেই হিসাব-নিকাশের যেদিন শেষ হলো সেই দিনই উমাচরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখা গেল অনেক কারচুপিই আপনি করেছেন নায়েব মশাই, কিন্তু এ বাড়িতে বহুদিন আছেন আপনি—পুরোনো লোক তাই ফৌজদারী করলাম না আপনার বিরুদ্ধে। তা এবারে আপনি যেতে পারেন। আজ থেকেই আপনার ছুটি—

সূর্য রায় ছুটি না দিলেও উমাচরণের ছুটির সত্যই প্রয়োজন হয়েছিল সেদিন। বয়স তো কম হলো না। প্রশস্ত কপালে জেগেছে বয়সের সুস্পষ্ট বলিরেখা। মাথার চুলও শুভ্র হয়ে গিয়েছে। পঁয়ত্রিশটা বছর কেটে গিয়েছে তাঁর রায়বাড়িতে। তাঁরই চোখের সামনে সুমন্তনারায়ণের ঐশ্বর্যের দেউল ধীরে ধীরে একদিন গড়ে উঠেছিল। সেই দেউলে আজ ফাটল ধরেছে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল, সুমন্তনারায়ণের মৃত্যুর পর বারোটা বছরের মধ্যেই সব যেন বিষাক্ত হাওয়ায় শুকিয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে দেখতে দেখতে।

তথাপি বিকৃতমস্তিষ্কা সুমন্তনারায়ণের বিধবা স্ত্রী রাধারাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝি সেদিনও উমাচরণ রায়বাড়ির ফটকটা আগলে বসে ছিলেন।

আজ আর তাঁর প্রয়োজন নেই, তাঁর ছুটি।

সেদিন বৈকালে উমাচরণ গিয়ে রাধারাণীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। রাধারাণীকে উমাচরণ বরাবর রাণীমা বলেই সম্বোধন করে এসেছেন, আজও এসে শেষবারের মত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন, রাণীমা!

কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া এলো না।

সাড়া দেবে কে? অন্ধকার ঘরের এককোণে বসে আপনমনে বিকৃতমস্তিষ্কা রাধারাণী তখন বিড়বিড় করে বকে চলেছে।

হৈমবতী ঐ সময়ে ঐ ঘরের দিকে আসছিল, দরজার গোড়ায় উমাচরণকে দেখে প্রশ্ন করলে, উমা কাকা, এখানে দাঁড়িয়ে?

আজই আমি সন্ধ্যায় এখান থেকে চলে যাচ্ছি হৈম।

চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ মা, সূর্যবাবু সব বুঝে নিলেন, আমাকে ছুটি দিলেন।

সে কি!

হ্যাঁ মা, তাই রাণীমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছিলাম মা।

আপনিও তাহলে চলে যাচ্ছেন উমা কাকা!

বৃদ্ধ হয়েছি মা, তাছাড়া তোমাদের আপনার জন সূর্যবাবু, ওঁরাও যখন এলেন—

কিন্তু আজও মা বেঁচে আছেন। মার হুকুম ছাড়া আপনাকে তিনি ছুটি

দেনই বা কোন্ অধিকারে ?

কিন্তু মা, কর্তার খুল্লতাত পুত্র তাঁরা, তাঁরাই তো এখন এ সবকিছুর একমাত্র ন্যায্য ওয়ারিশান—উত্তরাধিকারী—

উত্তরাধিকারীই বটে ! বাপ বেঁচে থাকতে এবং যতদিন দাদা বেঁচে ছিল, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পর্যন্ত যাদের সাহস হয়নি—

চল মা, রাণীমার সঙ্গে এইবেলা দেখাটা সেরে বেলাবেলি না বেরিয়ে পড়তে পারলে আবার—

হৈমবতী একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, আসুন—

ঘরে ঢুকতে হলো না, হৈমবতীই মাকে ধরে বাইরে নিয়ে এলো।

অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় রাধারাণীর দিকে তাকিয়ে উমাচরণের চক্ষু জলে ভরে যায়। মাত্র এক মাসের মধ্যেই কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না হয়েছে রাধারাণীর ! সেই তপ্তকাঞ্চননিভ গাত্রবর্ণে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। মাথায় সেই কালো কুঞ্চিত কেশ প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে বুঝি রাতারাতিই।

এই কি সেই রাজেন্দ্রাণীর মত সুমন্তনারায়ণ-গৃহিণী !

আমি আজ যাচ্ছি রাণীমা।

যাচ্ছেন—কোথায় ?

নিজের ভিটায়।

কেন ?

আমার যে জবাব হয়ে গিয়েছে রাণীমা।

ও—আচ্ছা !

রাধারাণী আর দাঁড়ালো না। ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করলো গিয়ে।

উদ্গত অশ্রু কোনমতে রোধ করতে করতে উমাচরণ বহির্মহলের দিকে পা বাড়ালেন।

॥ ৯ ॥

নয়া দিন

কলিকাতার কি নিছনি
বলিতে অশক্ত বাণী
আর চলে না লেখনী
সংক্ষেপে ভনি ॥

॥ ১ ॥

ইতিমধ্যে কলকাতা শহরের শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ! এখন আর কলকাতা শহরকে চেনাই যায় না। শহরের পূর্ণ যৌবনকাল এখন। হাস্যে লাস্যে সৌন্দর্যে মনোহরা এক নয়া নগরী যেন।

কত সব নয়া নয়া রাস্তা, কত বাজার, কত ঘাট, কত বাগান, কত বিচিত্র সব তাদের নাম। এমন কি হোটেল পর্যন্ত। 'হার্মোনিক ট্যাভান'' ও 'হোটেল লণ্ডন'।

বিশাল রায়বাড়িটার আশপাশও আর ক্রমশ এখন চিনবার উপায় নেই। কারণ গোটা শহরটারই যে রূপ বদলে গিয়েছে। সেই যে চিৎপুরের রাস্তাটা, এখন আর চতুর্দিকে ছড়ানো নেই। এখন কেবল দুদিকে অর্থাৎ উত্তরে আর দক্ষিণে—আপার আর লোয়ার চিৎপুর। আর বিস্তৃতকলেবর চিৎপুরকে ছুঁয়ে আছে ব্যারাকপুরে যাবার পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা একদিকে, অন্যদিকে চৌরঙ্গী।

সেই পুরাতন জলাগির চৌরঙ্গীই কি আর আছে ! না সেই গভীর জঙ্গলে ঘেরা, চোর ডাকাত দস্যুদের গোপন আড্ডা, শ্বাপদ হিংস্র জন্তুদের নির্ভর বিচরণক্ষেত্র সেই চৌরঙ্গীই আছে !

এখন কত সাহেব-মেমদের সেখানে বসবাস। জঙ্গল সব কেটে সাফ হয়ে গিয়েছে। ময়দানের একপাশে বিরাট ক্যাথিড্রাল চার্চ। তার মাথায় ঘড়িটা সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি তুলে বাজে ঢং ঢং ঢং।...

ভারতের শাসনকর্তারাও কত এসেছে কত গিয়েছে। জর্জ বার্লোর পর লর্ড মিণ্টো, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড আমহার্স্ট, তারপর লর্ড বেণ্টিঙ্ক।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—আর এখন শুধু বাংলারই রাজ্যপাল বা ভাগ্য-বিধাতা নন তিনি, নতুন সনদের জোরে তিনি হলেন গোটা তামাম ভারত-বর্ষেরই গভর্নর জেনারেল বাহাদুর।

আর সেদিনকার সেই বৈদেশিক শাসনের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে কেবল যুদ্ধজয়, রাজ্যবিস্তার, ধনিক-গোষ্ঠীর বিকাশ, যন্ত্রযুগের অভ্যুদয়ই নয়, সেই সঙ্গে আরো, আরো অনেক কিছু—বৃহৎ ও ব্যাপক।

কারণ সেই ইতিবৃত্তের পাতায় পাতায় তখন ভাঙছে আর ভাঙছে বাংলার গ্রাম, তার শিল্প, রীতিনীতি, পুরাতন পচা ভাবাদর্শ, জীবনধারা আর সেদিনকার জীবনধারার কোণে কোণে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের উপর হচ্ছে নয়া দিনের আলোকসম্পাত।

গড়ে উঠছে এক নয়া কলকাতা শহর ভাগীরথীর তীরভূমিতে।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটতে শুরু করেছে পুরাতন পচা সামাজিক কৌলীন্যের এবং সামাজিক কৌলীন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই কবরের মাটিতে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে এক নতুন সমাজ।

বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী সমাজ, কায়স্থ সমাজ—ঐ কলকাতা শহরের বুকে। যার প্রতিষ্ঠা কোন ধর্মের উপর নয়। যেখানে কোন কুলীন বা অকুলীনের ভেদাভেদ নেই। তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী বৈশ্য ইংরাজদের আনুকূল্যে পুষ্ট এক নতুন ধনিক বা ধনতান্ত্রিক সমাজ।

অজ্ঞানতা অবিদ্যা আর অকল্যাণ ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশে যে জ্ঞান তা তখন রাজা রামমোহন রায়ের কল্যাণে এক নতুন মঙ্গলের পথ খুলে দিয়েছে।

কিন্তু অবিদ্যা আর অকল্যাণের নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ সেদিনও খোঁজেননি সূর্যনারায়ণ রায়। সমন্তনারায়ণ যে বিষের হাওয়া ছড়িয়ে গিয়েছিলেন রায়-ভবনের প্রতি ইষ্টকে ইষ্টকে, তা থেকে বুঝি তাদের রেহাই ছিল না—মুক্তি ছিল না। সূর্যনারায়ণ—রায়বাড়ির নতুন প্রতিভূ, বুঝি তাই সেই বিষচক্রের মধ্যেই আবর্ত রচনা করে ফিরতে লাগলেন অন্ধ ঐশ্বর্য আভিজাত্যেরই মোহে।

অনায়াসলব্ধ প্রচুর ঐশ্বর্য। তারই বিষচক্রে পড়ে সূর্যনারায়ণ ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগলেন। রাধারাণী বিকৃতমস্তিষ্কা। কোন দিকেই আর তার নজর নেই, নজর দেবার সামর্থ্যও নেই। তাই প্রতিবন্ধকতাও তার দিক থেকে বুঝি কিছুমাত্রও ছিল না।

সত্যিই কেমন যেন জবুথবু হয়ে গিয়েছিল রাধারাণী। যার সদাসতর্ক দৃষ্টি একদা সমগ্র রায়-ভবনকে ঘিরে এবং প্রতিটি ব্যাপারে সর্বক্ষণ সজাগ হয়ে থাকতো, যার দাপটে রায়বাড়ির সকলে সদা সতর্ক থাকতো, আজ আর কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

রায়বাড়ির গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর, এত সাধের তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরূপা—সেদিকে ভুলেও পা বাড়ায় না রাধারাণী। নিজ শয়নকক্ষে বিরাট পালঙ্কটার উপরে বেশির ভাগ সময়ই বসে থাকে। আর আপন মনে বিড়বিড় করে বকে: ওরে আমার সোনার প্রতিমা, নিজ হাতে তাকে বিষ দিলাম! আবার কখনও হয়তো বিড়বিড় করে বলে, ওরে হতভাগা, নিবিয়ে দে, মশালটা নিবিয়ে দে!

মস্তিষ্কের ঐ বিকৃত ভাবটা অবিশ্যি একটানা থাকে না। মধ্যে মধ্যে বেশ শান্ত ধীর মনে হতো রাধারাণীকে। তখন আহারাদিও করতো, এটা ওটা

সংবাদও নিত সংসারের। বাড়ির ছোট ছোট বাচ্চাগুলো সন্ধ্যার পর তার চারপাশে এসে ঘিরে বসতো। বলতো, কত্তামা, গপ্প বলো।

নিদারুণ শোকে ও দুঃখে অকালে শরীরটা ভেঙে যাওয়ায় বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বৃদ্ধা মনে হতো রাধারাণীকে। সাদা চুলগুলোর উপর আলো পড়ে চিক চিক করে। লোল চর্ম, সাদা শণের মতো চুল, রাধারাণীকে যেন মনে হয় বুঝি সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি।

মৃদু হেসে রাধারাণী শুধায়, কি গল্প শুনবি?

সেই রাজার গপ্প বলো, সেই রাণীর গপ্প!

রাজার গল্প রাণীর গল্প নয়, রাধারাণী বলে তারই নিজের গল্প। সেই পুরুষসিংহ সুমন্তনারায়ণের গল্প। হার্মাদের গল্প। বর্গীর গল্প।

হীরা মানিকের খোঁজে যারা একদিন সাত সাগর পেরিয়ে এদেশে এসেছিল বাণিজ্যের লোভে, তারপর তাদের সেই যুদ্ধ-বিগ্রহ, অত্যাচার, হত্যালীলা—সেদিনকার জলদস্যুদের জোর-জবরদস্তি, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ, ছোট ছোট শিশুদের ধরে নিয়ে এসে ক্রেস্তান করা, নরনারীদের ক্রীতদাস হিসাবে হাটে হাটে বিক্রয় করা।

সৌদামিনী তখন মা হয়েছে।

সৌদামিনীর কন্যা সর্বাণী। বালিকা সর্বাণীর বয়সই তখন ছয়-সাত বৎসর। সেও ঐ দলে এসে বসে বসে গল্প শুনতো।

সৌদামিনী মেয়েকে ডাকতে এসে আর যেন সেখান থেকে নড়তে পারতো না। একপাশে ওদের মধ্যে বসে পড়তো। সেই গল্প-কাহিনীর মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতো।

ছোটবেলাও কর্ত্রীঠাকরুনের মুখে কত শুনেছে ঐসব গল্প, তবু আজও মনে হয় বুঝি নতুন গল্প, নতুন কাহিনী। শুনতে তার শুধু ভালই লাগতো না, নেশা ধরে যেতো যেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়তো। সর্বাণীও ঘুমিয়ে পড়তো তাদেরই সঙ্গে মায়ের কোলে মাথাটি রেখে নিশ্চিন্তে। একা জেগে জেগে শুনতো কেবল রাধারাণীর সেই কাহিনী তখন ঐ সৌদামিনী আর বলতো, কত্তামা—তারপর?

সহসা রাধারাণী যেন চমকে উঠতো সেই প্রশ্নে। বলতো, কে, সদু?

হ্যাঁ, কত্তামা।

রাত কত হলো রে সদু? নারায়ণ এখনও ফিরলো না?

বুঝতে পারতো সদুঠাকরুন, কত্তামা রাধারাণী খেই হারিয়ে ফেলেছে। বিকৃত চিন্তার কুয়াশা তার স্মৃতিশক্তিকে আবার গ্রাস করছে।

বৌমা—বৌমাকে একটিবার ডেকে দিবি সদু?

সৌদামিনী ধীরে ধীরে উঠে পড়তো।

স্বামী মন্মথ এবারে ফিরবে। ঘরজামাই মন্মথ শ্বশুরবাড়িতেই থাকে আর

সারা রাত দিন মদ্যপ, লম্পট সূর্য রায়ের মোসাহেবি করে। ছিঃ, ছিঃ—

এত করেও রাধারাণী তার মতিগতি ফিরাতে পারেনি। কত সাধ করে মাতৃহারা পৌত্রী নির্মলার বিবাহ দিয়েছিলেন রাধারাণী, সে কালামুখী তো স্বামীর ঘরের চৌকাঠই মাড়াল না কোনদিন, তেমনি কন্দর্পের মতো চেহারা দেখে হৈমবতী একমাত্র সন্তান সৌদামিনীর বিবাহ দিয়েছিল ঐ মন্মথের সঙ্গে। কিন্তু মানুষটার যে কেবল ঐ বাইরের রূপটাই সম্বল, আসলে মানুষটা একটা একেবারে অপদার্থ সেটাই বুঝতে পারেনি রাধারাণী। তাই রাধারাণী ও মা হৈমবতীর আক্ষেপের বুঝি অন্ত ছিল না।

মন্মথর পিতাঠাকুর একদা স্বদেশের ভিটে-বাটি জমি-জমা ফেলে অন্যান্য আরো দশজনের মতই সমৃদ্ধি আর সৌভাগ্যের খোঁজে ছুটে এসেছিলেন কলকাতা শহরে এবং দালালি করে বছর পাঁচেকের মধ্যেই সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির চাকাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জীবন-প্রদীপটা দপ করে মাঝখানে অকালে নিভে যাওয়ায় ভোগের সময়টা পাননি।

তবে তিনি ভোগের সময়টা না পেলেও ছেলে শ্রীমান মন্মথ চুটিয়েই ভোগ করে বছর-পাঁচেকের মধ্যেই পিতৃ-অর্জিত সম্পত্তিটা নিঃশেষ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু ভোগের তৃষ্ণা এমনি যে সে তৃষ্ণার আগুন একবার যার বুকে জ্বলে তা বুঝি আর নিভেও নিভতে চায় না। তাই নতুন বাবু সূর্য রায়ের সঙ্গটি ধরেছিল মন্মথ। সূর্য রায়ের সঙ্গে বুলবুলি ওড়ানো, মদ ও মেয়েমানুষ নিয়েই সে সর্বদা ব্যস্ত।

কনিষ্ঠ চাঁদ রায় ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এবং নেশাটিও ছিল তার সম্পূর্ণ ভিন্ন। মদের নয়, গাঁজার ভক্ত সে ছিল, এবং দিবারাত্রই নয়, সাধারণত সন্ধ্যার দিকে তার গঞ্জিকা সেবন চলতো। গঞ্জিকা ছাড়াও তার আর একটি নেশা ছিল। ঘরে বসে পড়াশুনা করা ও মধ্যে মধ্যে কবি-গান করা, কবিয়ালদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরা।

বেশীর ভাগই সে রায়বাড়ির বাইরে একটা ঘরে থাকতো। রায়বাড়ির কর্ত্রী এখন যোগমায়া। রায়বাড়ির অন্ন কয়েক মাস পেটে পড়তেই যোগমায়ার চেহারাটা খোলতাই হয়ে উঠেছিল।

বিধবা হৈমবতী সুমন্তনারায়ণের একমাত্র জীবিতা কন্যা হলেও যোগমায়া তাকে পাত্তা দেয়নি।

রাধারাণীর মস্তিষ্কবিকৃতির পর হৈমবতীই সংসারটা দেখাশোনা করছিল, কিন্তু সূর্যনারায়ণ যেমন বহির্মহলে উমাচরণকে কৌশলে ছুটি দিয়ে সরিয়ে দিলেন, যোগামায়াও তেমনি কৌশলে অন্দরমহলের কর্তৃত্বটা হৈমবতীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

বিধবা মানুষ, এই তো ধম্ম-কম্ম করবার সময়! পুজো-আর্চা ধম্ম-কম্ম করো সংসারের ঝামেলা তুমি পোহাতে যাবে কোন্ দুঃখে! এতগুলো সন্তান যদি প্রতিপালন করতে পারি তো ঐটুকু ঝমেলাও সংসারের সইতে পারবো!

তা তো সত্যিই। ঝামেলা আবার কি! তা বেশ তো বৌ, তোমাদের সংসার তোমরা যদি দেখতে পার তো আমাদের কি বলবার আছে! কথাটা বড় দুঃখেই বলেছিল হৈমবতী।

তারপর নিঃশব্দে সরে গিয়েছিল হৈমবতী।

সত্যি, সন্তান-প্রতিপালনের কথাটার মধ্যে যোগমায়ার কোন অত্যুক্তি ছিল না। নিয়মিত বছর বছরই প্রায় বলতে গেলে যোগমায়া ঠাকরুনের একটি করে সন্তান-প্রসবের কোন ত্রুটিই ছিল না। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে আঠারোটি সন্তানের জননীত্বের দাবি নিয়ে একদা যোগমায়া ঠাকরুন ইহসংসারের দেনা মিটিয়েছিল।

যৌবনে সংসারের আর দশজনের মতই চাঁদ রায়ও বিবাহ করেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তার স্ত্রী নিস্তারিণী একটিমাত্র সন্তানের জন্ম দিয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে। চাঁদ রায় আর বিবাহ করেনি।

॥ ২ ॥

পাড়া-প্রতিবেশীরা বলতো রায়-গোষ্ঠী তো নয়, রাবণের গোষ্ঠী।

কথাটা শুনে হৈমবতীর দু-চোখের কোণ জলে ভরে উঠতো। একটিমাত্র সন্তানের কামনায় তাদের অভাগিনী জননী রায়বংশের কপালে এমনই দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপে দিলেন যার জন্য এমনি করে আজও তাঁকে বিকৃতমস্তিষ্কের গুরু-বেদনা বহন করে যেতে হচ্ছে। আর আজ সেই রায়-বংশেরই রাবণের গোষ্ঠীর মতো একপাল সন্তান।

কিন্তু এদের কে চেয়েছিল? দিবারাত্র চেঁচামেচি খেয়োখেয়ি লেগেই আছে। কান পাতবারও যেন জো নেই। বিকৃতমস্তিষ্কা রাধারাণীর আর কি, সহ্য করতে পারে না হৈমবতী।

ঐসব দেখেশুনে আর দুর্নিবার একটা আক্রোশের জ্বালায় বুকের ভিতরটা তার যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে থাকে সর্বক্ষণ।

শুধু কি তাই, নিজের পিতৃগৃহে হৈমবতীই যেন আজ চোর হয়ে আছে।

সুনন্দনারায়ণ, কন্দর্পনারায়ণ, রাধারাণী কারোর কীর্তিকলাপই আজ আর জানতে কারো বাকী নেই। দাস-দাসীদেরই ফুস-ফুস গুজ-গুজ থেকে, এ কান থেকে ও কান হতে হতে যোগমায়ার কানে সবই পৌঁছেছিল।

সেই সব নিয়ে সুযোগ পেলেই নিষ্ঠুর বাক্য বলে যোগমায়া হৈমবতীকে বিদ্ধ করতো। শুনিয়ে শুনিয়ে যোগমায়া বলতো, সাধে কি আর সোয়ামী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন! যেমন গর্ভধারিণী, তেমনি স্ত্রী বোন! ঘেন্নায় তিনি বিরক্ত হয়ে লজ্জায় গলায় দড়ি দিয়েছেন!

আর কেউ জবাব না দিলেও এবং জবাব দেবার সাহস না পেলেও সৌদামিনী কিন্তু রেহাই দিত না যোগমায়াকে।

বলতো, তাই বুঝি যোগমায়া ঠাকরুন সেই বিষ থেকে এদের উদ্ধার করতে তোমরা এখানে এসেছো!

সৌদামিনী কখনও যোগমায়াকে মামী বলে সম্বোধন করেনি।

থাম্ থাম্ মুখপুড়ী—মুখ নেড়ে আর কথা বলিসনি!

কেন, কেন বলবো না শুনি? আমি তো তবু বলে থামছি, দাদু আর মামা বেঁচে থাকলে বাঁশ-পেটা করে যে এ রায়বাড়িতে ঢোকবার আগেই চৌকাঠ পার করে দিতো তোমাদের!

তবে রে হারামজাদী! চোখ পাকিয়ে এগিয়ে আসতো যোগমায়া।

মারবে নাকি গো যোগমায়া ঠাকরুন! কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়াতো সৌদামিনী।

মুখে আগুন জেবলে দেবো।

আয় না, দেখি কে কার মুখে আগুন জবালে!

চাঁদ রায় সে সময় আশেপাশে থাকলে সে-ই উভয়ের ঝগড়াটা মিটিয়ে দিত। সৌদামিনীকে চাঁদ রায় সত্যিই স্নেহ করতো।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি যে তোমরা নীচ লোকের মতো ঝগড়া করো বৌঠান!

কেন গো গেঁজেল ঠাকুর, পিরীত হয়েছে বুঝি সদু ঠাকরুনের সঙ্গে? তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠতো যোগমায়া।

কি যে বলো, ও আমার সন্তানতুল্য নয়?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—একেবারে গর্ভের! মরণ হয় না তোমার, হাড়-হাভাতে গেঁজুড়ে মিনসে! ছ্যা, ছ্যা—মুখ-ঝামটা দিয়ে যোগমায়া ঠাকরুন স্থানত্যাগ করতো।

যোগমায়া ঠাকরুন বর্ণিত গেঁজুড়ে বা গঞ্জিকাসেবী হলেও সত্যিই চাঁদ রায় ঐসব পছন্দ করতো না। কারণ আসলে প্রকৃতিটাই যে ছিল তার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তন্ত্রমন্ত্রের বিকৃত গুপ্তপথে সেদিনকার কালচার বা ব্রাহ্মণ্যধর্মটা বিকৃত কদাকার বিষাক্ত হয়ে উঠলেও সমাজের প্রাণের মধ্যকার যে সত্যিকার আগুন তা একেবারে কোনদিনই নির্বাপিত হয়ে যায়নি। অর্থের লালসা আর কদাচারে সাময়িক ভাবে ছাইচাপা পড়েছিল মাত্র।

রাজা রামমোহন রায়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিল বিদ্যা ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশে এক নতুন জ্ঞান। খুলে দিল এক নতুন দৃষ্টি। নতুন এক আলো যেন সমাজের উপর এসে পড়লো নতুন এক সংস্কৃতির ইঙ্গিত নিয়ে। সেই আলো রায়বাড়ির চোখ-ধাঁধানো অন্ধকারকে এতটুকু দূরীভূত করতে না পারলেও চাঁদ রায়ের মনটাকে আলোকিত করে তুলেছিল নিঃসন্দেহে।

অর্থ, সম্ভোগ ও কদাচারের যে বিষক্রিয়াটা সে যুগে মানুষের মনকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল, সেই নেশাটা যে চাঁদ রায়ের মনকে কেন আচ্ছন্ন করতে পারেনি সেটাই আশ্চর্য।

তবে এটা ঠিকই, রুচিটা ছিল তার ভিন্ন প্রকৃতির। আর সেটা যেন আশ্চর্য রকম ভাবেই পরবর্তীকালের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিপন্থী ছিল। তাই গাঁজার

নেশার ফাঁকে ফাঁকে মনটা তার যেদিকে আকর্ষিত হতো নতুন এক রসের সন্ধানে, সে হচ্ছে সে যুগের কবিয়ালদের কবিগান।

আর সেই কবিগানের আকর্ষণ থেকেই বিদ্যাচর্চার একটা নেশা তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল ধীরে ধীরে। বাংলা ব্যাকরণ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, চণ্ডীচরণ মুনসীর তোতা ইতিহাস। হরপ্রসাদের পুরুষ-পরীক্ষা ইত্যাদি চাঁদ রায় পড়ে পড়ে একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছিল। তাছাড়া জয়গোপাল তর্কালংকারের সমাচার দর্পণও নিয়মিত পাঠ করতো চাঁদনারায়ণ রায়।

চাঁদ রায় নিজের যত্নে ও চেষ্টায় উর্দু ও ফারসী ভাষাটা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিল। নিয়মিত সে রাজা রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত মীরৎ-উল-আখবারেরও একজন পাঠক ছিল।

ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন জাতের মানুষ চাঁদ রায়ের সঙ্গে সেই কারণেই বোধ হয় রায়বাড়ির কারো বড় একটা যোগাযোগ ছিল না। একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিটি তাই রায়বাড়ির বহির্মহলে নিভৃত একটি কক্ষে নিজের স্থানটি করে নিয়েছিল।

একমাত্র পুত্র বীরভদ্র। তার সম্পর্কেও চাঁদ রায় যেমন নিরাসক্ত তেমনি উদাসীন ছিল। দিনান্তে একটিবারও বীরভদ্রর খোঁজ নিত কিনা সন্দেহ। বীরভদ্র যোগমায়ার সন্তানসন্ততির সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার কাছেই মানুষ হতো।

রায়বাড়ির কেউ ঐ মানুষটির দিকে ফিরে না তাকালেও আশ্চর্যরকম ভাবেই কিন্তু একটি মানুষের দৃষ্টিপথে চাঁদ রায় পড়ে গিয়েছিল।

সে হচ্ছে বিধবা হৈমবতী। হৈমবতীর বয়স তখন ত্রিশের কোঠা ছুঁই-ছুঁই করছে। চাঁদ রায়েরই বয়সী প্রায়। গান শুনতে বড় ভালবাসতো হৈমবতী।

সন্ধ্যার পর নিত্যনৈমিত্তিক হৈমবতী বাড়ির পশ্চাতের উদ্যানে দীঘিতে স্নান করতে যেতো। সেদিনও সন্ধ্যায় স্নান করতে গিয়েছে। বৈশাখের তাপদগ্ধ সন্ধ্যারাত্রি।

হৈমবতী আকণ্ঠ দীঘির শীতল জলে নিমজ্জিত। সহসা মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনি তার কর্ণে এসে প্রবেশ করলো।

পিরীত কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায়॥
পিরীতের গুণাগুণ করে যে জন জানে সেজন।
অন্য জন বৃথা কেন, তাহারে বুঝতে চায়॥

সঙ্গীত তো নয়, যেন সুধা—কানের ভিতর দিয়ে যেন হৈমবতীর একেবারে মরমে পশে। চাঁদ রায় একাকী রানার উপর অন্ধকারে বসে গান গাইছিল।

নির্জন উদ্যানে ঐ নির্জন রানাটি চাঁদ রায়ের বড় প্রিয় স্থান ছিল। মধ্যে মধ্যে ঐখানে এসে একা একা দীর্ঘসময় বসে থাকতো চাঁদ রায়।

সংবাদটি অবশ্য হৈমবতীর জানা ছিল না। তাছাড়া রায়বাড়ির পশ্চাতের উদ্যান-মধ্যস্থিত ঐ দীঘিতে কোন পুরুষের আসবার অধিকারও কোন দিন ছিল না।

কিন্তু সে সুমন্তনারায়ণ বা কন্দর্পনারায়ণও নেই, সেই কাননও আজ আর নেই। সূর্য রায়ের রাজ্যপাট চলেছে এখন।

হঠাৎ কথাটা খেয়াল হতেই শশব্যস্তে জল থেকে উঠে পড়ে হৈমবতী এবং সিক্তবস্ত্রেই অন্ধকারে রানার উপর দাঁড়িয়ে সক্রোধে প্রশ্ন করে, কে—কে ওখানে ?

আমি।

কে তুমি ? জান না এটা মেয়েদের ঘাট, কোন পুরুষের এখানে প্রবেশাধিকার নেই ?

ক্ষমা করবেন, আমি দুঃখিত, জানতাম না কথাটা।

অনুতপ্ত নম্র ভদ্রোচিত কণ্ঠস্বর।

কণ্ঠের ক্ষমার সুরটিই যেন হৈমবতীর মনের আক্রোশটা অনেকটা প্রশমিত করে।

কে আপনি ?

আমি চাঁদনারায়ণ।

ও—

বাড়ির বর্তমান কর্তার ভাই চাঁদ রায়।

আমার এখানে আসাটা অন্যায় হয়েছে বুঝতে পারছি। তাছাড়া বিশ্বাস করুন, অন্ধকারে সত্যিই টের পাইনি যে আপনি ঘাটে এসেছেন।

শুনুন—

যেতে যেতে হৈমবতীর ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ায় চাঁদ রায়, কিছু বলছিলেন ?

হ্যাঁ, আমার কাজ হয়ে গিয়েছে, আমি চলে যাচ্ছি, আপনি থাকতে পারেন এখানে।

না, না—আপনি যাবেন কেন ? আমার তো হয়ে গিয়েছে, আপনি চলে যাবেন কেন, আপনি বসুন।

অন্ধকারে কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পায় না।

কেবল অস্পষ্ট আবছা দুটি ছায়ামূর্তি।

দিনসাতেক বাদে আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে দুজনার দেখা হলো ঐ দীঘির ঘাটে।

সেদিন দূর থেকেই চাঁদ রায়ের গান কানে এসেছিল হৈমবতীর।

চাঁদ রায় সেদিন গাইছিল :

মোর পরাণ পুতলী রাধা
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়।

নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত সব ধাঁধা ॥

সুরমুগ্ধ কুহকিনীর মতই হৈমবতী কখন যে পায়ে পায়ে একেবারে রানার উপর উপবিষ্ট চাঁদ রায়ের সামনেটিতে দাঁড়িয়েছিল নিজেই জানে না।

সহসা চাঁদ রায়ের প্রশ্নে চমকে ওঠে।

কে!

আমি। আমি হৈম—কিন্তু থামলেন কেন? ভারি চমৎকার গান করেন আপনি। শেষ করুন না গানটা।

আপনি—আপনি শুনবেন?

হ্যাঁ, গান—

চাঁদ রায় আবার গান ধরে:

রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণ পদে বাঁধা ॥

চমৎকার! ভারি সুন্দর তো!

আপনি বুঝি গান ভালবাসেন খুব?

হ্যাঁ—

যাবেন আজ রাত্রে বাগবাজারে, কবি-গানের আসর বসবে সেখানে।

বাগবাজার?

হ্যাঁ, মিত্তির বাড়িতে। রাম স্বর্ণকারের দলের সঙ্গে অ্যাণ্টুনী ফিরিঙ্গীর দলের আজ কবি-গানের লড়াই।

যাবো। শুনেছি ঐ ফিরিঙ্গী কবিয়াল নাকি ভারি সুন্দর গায়।

হ্যাঁ—কে বলবে যে ও ফিরিঙ্গী-বাচ্চা!

শুনেছি ঐ অ্যাণ্টুনী ফিরিঙ্গী নাকি হিন্দু বাঙালীর এক বিধবাকে বিয়ে করেছে!

হ্যাঁ।

দূরে ঐ সময় পদশব্দ শোনা যায়।

হৈমবতী তাড়াতাড়ি বলে, কে যেন এদিকে আসছে, আমি যাই। রাত আটটার পর আমি ঠাকুরদালানে থাকবো।

হৈমবতী দ্রুতপদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাত আটটায় ঠিক হৈমবতী আসতে পারেনি, একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল আসতে। সর্বাঙ্গ একটা সাদা চাদরে আবৃত, মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন। দুজনে নিঃশব্দে দেউড়ি দিয়ে বের হয়ে গেল।

রাস্তায় তখনও বেশ লোকচলাচল। মাঝে মাঝে ল্যাণ্ডো ও ব্রুহাম হাঁকিয়ে

কলকাতা শহরের নব্য ধনী বাবুরা স্ফূর্তি করতে চলেছেন তাদের মেয়েমানুষের ঘরে।

অনেকটা দূর থেকেই ঢোলের বোল শোনা যায়—ডুম্, ডুম্, ডুম্ ··

কবির লড়াইয়ের বিরাট জমজমাটি আসর বসেছে বিস্তৃত ঠাকুরদালানের চত্বর জুড়ে। লোকে একেবারে লোকারণ্য। আলোয় আলোয় চারিদিক যেন ঝলমল করছে। ঝাড়লণ্ঠন, মশাল ইত্যাদি চারিদিকে জ্বলছে। ঢোলে যেন খোলের খই ফুটছে।

ভিড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্যি! অগণিত কেবল কালো কালো মাথা আর মাথা!

ও মশাই, একটু রাস্তা দেবেন? মিনতি জানায় একজনকে চাঁদ রায়।

কে আমার পিরিতের নাগর এলো রে, পথ দেবেন!

বিশ্রী অশ্লীল ভঙ্গিতে টিপ্পনী কেটে ওঠে একজন।

আহা সরুন না মশাই, একটু রাস্তা দিন না, দেখছেন সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে!

আসরে তখন রাম স্বর্ণকার হেসে দুলে দরাজ গলায় গাইছে ঃ

পড়ে গোকুলবাসী অকূলে, ডাকে কৃষ্ণ বলে
তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান।
এ জ্বালা কৃষ্ণ বিনে কে করে নিবাণ।

দয়াপরবশ হয়ে একজন পথ করে দেয় ওদের যাবার জন্য।

রাম স্বর্ণকারের গানের শেষে ওদিকে অ্যাণ্টুনী ফিরিঙ্গী তালে তাল দিয়ে হেলে দুলে সুললিত বিরাট কণ্ঠে গান ধরে ঃ

এখন ভ্রান্তি পরিহরি বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শোনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

॥ ৩ ॥

আহা মরি মরি—কিবা রূপ ফিরিঙ্গী কবি এ্যাটুনীর!

হৈমবতীর চেয়ে চেয়ে যেন চোখের পলক পড়ে না।

গরদের ধুতি-চাদর পরিধানে। গলায় গোড়ের মালা।

অ্যাণ্টুনী গায় ঃ

লহিলে যার নামে বিপদ যায় প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়,
রাধার প্রাণ যায়, যায় গোকুল ভাসে দুঃখসলিলে।

হৈমবতীর দুই চক্ষুর কোল বেয়ে নিঃশব্দে গড়ায় অশ্রুর ধারা। প্লাবিত করে তার চিবুক ও গণ্ড।

বাহবা! বাহবা কবিয়াল!

তারপর অনেক রাতে গান শেষ হলে আসর ভাঙলে ওরা দুটিতে ফেরে। জনহীন নির্জন পথ। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী যেন তন্দ্রাতুরা সেই ম্লান চন্দ্রালোকে। পাশাপাশি হেঁটে চলে।

কেমন লাগলো হৈমবতী কবিগান ? শুধায় চাঁদ রায়।

ভাল। ভারি মিষ্টি, ভারি চমৎকার।

ফিরে এলো যখন ওরা দুটিতে রায়বাড়িতে, জলসাঘরে তখনও জ্বলছে আলো।

বোঝা গেল বর্তমানে বড়কর্তা সূর্য রায়ের মদের আসর তখনও ভাঙেনি।

অন্দরমহলে ঢুকবার মুখে মৃদুকণ্ঠে ডাকে চাঁদ রায়, হৈমবতী !

কেন ?

কাল সন্ধ্যায় আবার দীঘির ধারে এসো।

আসবো।

দিনের পর দিন অমনি করে সাঁঝের অন্ধকারে পশ্চাতের উদ্যানে দীঘির ধারে, কখনও রানায়, কখনও বকুল বৃক্ষতলে ওদের গোপন সাক্ষাৎ চলে। আর সেই নিভৃত দেখা-শোনার মধ্য দিয়েই ক্রমশ কখন যে দুটি মন পরস্পরের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে কেউ বোঝে না।

কিন্তু বেশী দিন ব্যাপারটা গোপন থাকে না। একদিন রায়বাড়ির এক দাসীর চোখে পড়ে যায় ব্যাপারটা।

যোগমায়ার কানেও কথাটা ওঠে। গালে হাত দিয়ে সে বলে, সত্যি বলছিস লা ! ও মা মা—কোথায় যাবো মা, কি ঘেন্না কি ঘেন্না ! মুখে আগুন, কড়ে-রাঁড়ীর—মুখে আগুন !

শুধু যোগমায়াই নয়—অন্তঃপুরিকার দল একযোগে সবাই করে ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! একটানা কেবল ছিঃ ছিঃ আর ছিঃ ছিঃ !

হৈমবতী কিন্তু নির্বিকার। শুনেও যেন শোনে না। কানে বুঝি যায় না তার সেই ছিঃ ছিঃ।

মেয়ে সৌদামিনী পর্যন্ত লজ্জায় ঘেন্নায় মায়ের—বুড়ী মা-মাগীর কীর্তি দেখে মাটিতে সঙ্গে মিশিয়ে যায়। মেয়ে সর্বাণীর পর্যন্ত তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সৌদামিনী মাকে বলে, তুই মর মর, গলায় দাঁড় দিয়ে মর। বিষ খেয়ে মর, গঙ্গায় ডুবে মর।

তবু হৈমবতী নির্বিকার। যৌবন তো তার কবেই পার হয়ে গিয়েছে ! বয়স তো কম হলো না !

চাঁদ রায়েরই বা কম বয়স কি ? বুড়ো ধেড়ে মিনসে। এ কি জঘন্য কেলেঙ্কারি ! এ কি জঘন্য ব্যভিচার !

কিন্তু সেও বুঝি নির্বিকার ছিল প্রথমটায়। কিন্তু একটানা ছিঃ ছিঃ শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত চাঁদ রায়ও বিচলিত হয়ে ওঠে।

বকুলতলায় দীঘির ধারে অন্ধকারে পরের দিন দেখা হলে চাঁদ রায় বলে, এ আর সহ্য হচ্ছে না হৈম !

কি সহ্য হচ্ছে না গো ?

তোমার নামে এ কলঙ্ক আমার যে আর সহ্য হয় না।

কি তবে করবে ?

চল এখান থেকে চলে যাই।

চলে যাবো ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

জানি না, দূরে, অনেক দূরে—

না, না—ছিঃ—

ছিঃ কেন হৈম ?

তা নয় তো কি, এ বয়সে ঘর ছেড়ে যাবো ?

হ্যাঁ চলো, নতুন করে আমরা ঘর বাঁধবো ।

ঘর !

হৈমবতী যেন চমকে ওঠে ।

হ্যাঁ—ঘর যে তার বাঁধাই হয়নি। কটা বছরও গেল না—বিধবা হয়ে ঘর ভেঙে চলে এসেছিল সে এই বাড়িতে।

তবু বলে হৈমবতী, না, না—তুমি আর আমাকে লোভ দেখিও না।

চোখের জল চাপতে চাপতে দ্রুতপদে অন্দরের দিকে চলে যায় হৈমবতী যেন এক প্রকার ছুটেই ।

অন্ধকারে ভূতের মত বকুলবৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে চাঁদ রায়।

সারাটা রাত ঘুম নেই চোখে রাধারাণীর। একে একে বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। কেবল ঘুম আসে না রাধারাণীর দুই চোখে।

ইদানীং আবার আফিমের নেশা ধরিয়েছে যোগমায়া রাধারাণীকে। কারণ একমাত্র ঐ রাধারাণীকেই যা সামান্য ভয় করে যোগমায়া রায়বাড়িতে।

তাছাড়া আরো একটা লোভ ছিল বৈকি যোগমায়ার রাধারাণীর প্রতি। রাধারাণীর আঁচলে বাঁধা চাবির তোড়াটা আজও যোগমায়া যে হস্তগত করতে পারেনি। বিরাট যে কাঠের সিন্দুকটা সুমন্তনারায়ণের শয়নঘরে ছিল, সেটা হৈমবতীই লোকজন দিয়ে রাধারাণীর ঘরের মধ্যে এনে রেখেছিল। ঐ বিরাট সিন্দুকটার উপরে প্রচণ্ড লোভ যোগমায়ার। না জানি সুমন্তনারায়ণের কত বহুমূল্য ধনদৌলত জমা আছে আজও ঐ সিন্দুকটার মধ্যে গোপনে! তাই ঐ সিন্দুকের চাবিটা না হাতাতে পারা পর্যন্ত যোগমায়ার মনে যেন এতটুকুও শান্তি নেই, এতটুকু সোয়াস্তি নেই।

কিন্তু রাধারাণীর ঘরে ঢুকে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই ভয় হতো যোগমায়ার। বুড়ীর চোখে কি ঘুম আছে ? সারাটা রাত যেন দুটো পাথুরে চোখের দৃষ্টি মেলে ঐ সিন্দুকটার প্রতি চেয়ে বসে থাকে বুড়ী। বিড়বিড় করে আপন মনে কি সব বলে। কেমন যেন ভয় করতো যোগমায়ার।

তাই বুঝি যোগমায়া ভেবেছিল বুড়ীকে আফিমের নেশা ধরিয়ে ঘুম পাড়াতে পারলে অনায়াসেই সে তার আঁচল থেকে চাবির তোড়াটা খুলে নিতে

পারবে কোন এক সুযোগে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। কোথায় ঘুম রাধারাণীর চোখে? এখন চেয়ে থাকে না আগের মত সর্বক্ষণ, চোখ বুজে ঝিমোয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ পা ফেলেছে কি অমনি প্রশ্ন করবে, কে রে?

বিড়বিড় করে চোখ বুজে আপন মনে বকছে, ঘরে কেউ ঢুকেছে কি অমনি প্রশ্ন করবে, কে রে?

কিন্তু যোগমায়া ঠাকরুন জানতো না রাধারাণীর ঘরের ঐ সিন্দুকটা ক্রমশ খালি হয়ে যাচ্ছে। সৌদামিনীর স্বামী মন্মথ সৌদামিনীর সাহায্যে ঐ সিন্দুক ক্রমশ খালি করে আনছিল দিনের পর দিন।

সূর্য রায়ও নিষ্কর্মা হয়ে বসে ছিল না। দিবারাত্র মদ্যপান ও মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করতে করতে সুমন্তনারায়ণের বিরাট সম্পত্তিটা ক্রমশ ক্ষয় করে আনছিলেন। উমাচরণকে তাড়িয়ে দেবার পর দুর্লভরাম নামে একজন শয়তান মোসাহেবকে জমিদারি ও ব্যবসা দেখাশুনা করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন সূর্য রায়।

কায়েতের সন্তান দুর্লভরাম বোস ভাল করেই সব দেখাশোনা করছিল। একটু একটু করে সে তার নিজের আখেরটা গুছিয়ে নিচ্ছিল।

আরও একজন রায়েদের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাধারাণীর দানে ক্রমশ নিজের ভাগ্যটাকে গড়ে তুলছিল ঠিক ঐ সময়—কালীচরণের ছেলে কানাইলাল।

ভাগ্যের এমনি খেলা, কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর মাত্র বারো বৎসরের মধ্যেই ঐ পাড়াতেই কানাইলাল তার ইমারতের ভিত গেঁথেছিল।

সৈরভী কালীচরণের স্ত্রী হলে কি হবে, বুদ্ধি ছিল তার। তাই সে রাধারাণীর দেওয়া টাকায় লগ্নী কারবার ফেঁদে বসেছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে সেই বিধবা ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলের সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল এবং ছেলেকেও পাকাপোক্ত ভাবে ব্যবসাটা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

তস্য পুত্র রামলাল পিতার ব্যবসার দৌলতেই ক্রমশ ধনী হয়ে ধরেছিল লোহার ব্যবসা। পরবর্তীকালে যা বিখ্যাত হয়েছিল 'নন্দন আয়রন ওয়ার্কস' নামে। রামলালের লোহা হয়েছিল সোনায় পরিণত। পরশ পাথরের সন্ধান বুঝি সে পেয়েছিল।

কিন্তু যাক সে কথা। সে তো আরো অনেক পরের কথা। রায়বাড়ির কথাই এখনও শেষ হয়নি।

কারিতকর্মা দুর্লভরামের সৌজন্যে একে একে সুমন্তনারায়ণের মহাল, জমিদারী ও ব্যবসা ধীরে ধীরে ভাঙতে ভাঙতে মাত্র পনেরটি বৎসরের মধ্যেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর অতবড় রায়বাড়িটাও ক্রমশ সংস্কারের অভাবে ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানে ফাটল ওখানে ফাটল।

এখানে বালি পলেস্তারা ঝরছে, ওখানে দেওয়ালে ফাটলে ফাটলে বট অশ্বত্থ গজাচ্ছে, কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে। কারই বা মাথাব্যথা রায়বাড়ির জন্য! কে তারা রায়বাড়ির!

সৌদামিনীও আঘাত কম পায়নি। সর্বাণীর বিবাহ দিয়েছিল পাত্রকে ঘরজামাই করেই, কিন্তু বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যেই সর্বাণী দেড় বৎসরের পুত্র সুরথকে রেখে স্বামীর স্বৈরাচারে একদিন বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলো। বিকৃত-মস্তিষ্কা রাধারাণী ঘরের মধ্যে বসে বিড় বিড় করে আপনমনে বকে বা আফিমের নেশায় ঝিমোয়।

জলসাঘরে সূর্য রায় বোতলের পর বোতল মদ নিঃশেষ করে চলে।

অন্দরে যোগমায়ার রাবণের গোষ্ঠী কেবল খাই খাই করে।

রায়বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন অভিশাপ লেগেছে।

রাধারাণী মিথ্যা বলতো না। শনি, শনি—সেই শনিই সব গ্রাস করলো। যাবে না, যাবে. নিশ্চয়ই যাবে। নিজ হাতে আমি যে তাকে বিষ দিলাম। যাবে, যাবে—সব যাবে। সব ঐ শনির গ্রাসে যাবে। কেউ—কেউ থাকবে না। এ বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে না।

শেষের দিকে বড় একটা কেউ রাধারাণীর ঘরে ঢুকতো না, একমাত্র সৌদামিনী—সদু ঠাকরুন ব্যতীত। সবাই ঐ বুড়ীকে ত্যাগ করলেও কি জানি কেন সৌদামিনী ঐ জরাগ্রস্তা বিকৃতমস্তিষ্কা বুড়ীকে ত্যাগ করতে পারেনি। কেমন যেন একটা অহেতুক অনুকম্পায়, ব্যথায় বুড়ীর জন্য সৌদামিনীর বুকটা টনটন করে উঠতো।

আহা রে, তার সেই অমন কত্তামা কি হয়ে গেল! একই ভাবে শয্যার উপর বসে থাকতে থাকতে পিঠের শিরদাঁড়াটা বেঁকে গিয়েছে কেমন যেন ধনুকের মত। মাথার চুলগুলো সব পেকে শণের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা নড়বড় করে সর্বক্ষণ! মুখের কথাও কেমন যেন সব অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কেউ ডাকলে বড় একটা সাড়া দেয় না, একমাত্র সৌদামিনীর ডাক ছাড়া।

তাছাড়া হৈমবতী যতদিন ছিল সে-ই দেখাশোনা করতো রাধারাণীর। হৈমবতী চলে যাবার পর বাকী জীবনটা আরও দশটা বছর সৌদামিনীই ছিল বুড়ীর পাশে পাশে।

॥ ৪ ॥

কথাটা বলতে সৌদামিনীর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঐ বৃদ্ধ বয়সেও।

সন্তান হয়ে মায়ের সেই কলঙ্কের কথা।

সৌদামিনী বলত, সে যে কি লজ্জা, কি করে তোকে বোঝাই বিভু!

কিন্তু বিভূতির মনে হয় চাঁদ রায় আর হৈমবতী যেন ঐ রায়বাড়ির বিষচক্র থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

বিভূতি শুধিয়েছিল, তাদের আর কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি, না ?

না। তারা যে কোন্ চুলোয় গিয়েছিল তারাই জানে।

কিন্তু বিভূতি যেন আজ এতকাল পরেও স্পষ্ট চোখে দেখতে পায়, চুলোয় নয়, রায়বাড়ির অভিশাপ থেকে তারা কোন মুক্ত আকাশের তলাতেই গিয়ে নীড় বেঁধেছিল। মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিল। রায়বাড়ির বিষ মন্থন করে নিশ্চয়ই তারা পেয়েছিল কোন এক দুর্লভ অমৃতের সন্ধান।

যে অমৃতের আশীর্বাদী দৃষ্টি শুধু হৈমবতী ও চাঁদ রায়ের উপরেই নয়, সেদিনকার নতুন সত্তায় সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে এসে পড়তেও শুরু করেছিল।

যে জ্ঞানের আলোক ও আত্মসচেতনতার ধাবক ছিলেন সেদিন রাজা রামমোহন রায়। কুশিক্ষা, অজ্ঞানতা, স্বৈরাচারের ঘৃণিত ব্যাধিদুষ্ট মানুষগুলো যে শিক্ষার আলোয় ক্রমশ সেদিন অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন করতে শুরু করেছিল।

একদিন প্রাতে উঠে হৈমবতী আর চাঁদ রায়ের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সকল কলঙ্ক সকল লজ্জা তারা মাথায় নিয়ে সেই যে রায়বাড়িব চৌকাঠ ডিঙিয়ে চলে গিয়েছিল, আর তাদের কোন সন্ধান কেউ কোনদিন পায়নি।

সন্ধান না পেলেও এবং তাদের চলে যাবার ব্যাপারটা কেউ জানতে না পারলেও বিভূতি যে আজও স্পষ্ট চোখে সে দৃশ্যটা দেখতে পায়। রাত্রির মধ্যপ্রহর নিশ্চয়ই ছিল সেটা। বায়বাড়ির সবাই অচেতন নিদ্রায়। দুজনে হাত ধরাধরি করে অভিশপ্ত ভগ্ন রায়বাড়ির দেউড়ি দিয়ে বের হয়ে গেল। হৈমবতী আর চাঁদ রায়।

নিশ্চয়ই তারা কোথাও গিয়ে নীড় বেঁধেছিল। একটি ছোট্ট শান্তির নীড়। যেখানে অর্থের দম্ভ নেই, ঐশ্বর্যের কদাচার নেই, লালসার রেষারেষি নেই, নেই ঘৃণিত যৌন-ব্যাধির নরক-যন্ত্রণা, আর নেই দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির তিলে তিলে অসহ মৃত্যু-যন্ত্রণা।

সুমন্তনারায়ণের সাক্ষাৎ বংশধর আর কেউ ছিল না বটে তবে তাঁরই রক্ত যা হৈমবতীর দেহের ধমনী ও শিরায় প্রবাহিত, সেই রক্ত ও চাঁদ রায়ের আদি-পুরুষের রক্ত যা ছিল চাঁদ রায়ের দেহে, নতুন এক সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হয়তো তা নতুন করে আবার বেঁচেছিল। যা হয়তো আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। গৌরবে মাথা তুলে আজও বেঁচে আছে।

কিন্তু কোথায় ? সন্ধান কি পাওয়া যায় না আর তাদের ?

যাক্ সে কথা। রায়বাড়ির ধ্বংসস্তূপে আবার ফিরে আসা যাক। সৌদামিনীর হাত ধরে আবার নিঃশব্দে প্রবেশ করা যাক রাধারাণীর সেই অন্ধকার শয়নঘরে। যেখানে বিরাট পালঙ্কটার উপরে বসে বসে আফিমের

নেশায় ঝিমোচ্ছে অশীতিপরা বৃদ্ধা অথর্ব রাধারাণী—সৌদামিনীর কত্তামা, সুমন্তনারায়ণ-গৃহিণী।

সত্যি, রাধারাণী যে অক্ষয় আয়ু নিয়ে এসেছিল সংসারে! সেই নববধূ—যে একদিন মহাজনটুলীর ঘাটে এসে নেমেছিল সুমন্তনারায়ণের হাত ধরে, তাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ঐ অশীতিপরা বৃদ্ধা বিকৃতমস্তিষ্কা রাধারাণীর মধ্যে। শুধু মাত্র যেন অতীতের কঙ্কাল।

ওদিকে দিনের পর দিন রায়বাড়ি যেন জীর্ণ হচ্ছে, তার জীর্ণ কক্ষে কক্ষে মানুষের ভিড়ও যেন তেমনি বাড়ছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে কুৎসিত লালসার হানাহানি সেই সব মানুষগুলোর মধ্যে এবং ক্রমশ শুরু হয় স্বার্থের রেষারেষিতে ভাগ-বাঁটোয়ারা।

রাধারাণী বেঁচে থাকতে থাকতেই রায়-ভবন ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল পাঁচ ভাগীদারের মধ্যে। পরস্পরের মধ্যে প্রাচীর তুলে একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

সূর্য রায়ও খুব বেশীদিন বাঁচেনি। যকৃত নষ্ট হয়ে উদরী রোগে শেষ পর্যন্ত তাকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল অত্যধিক মদ্যপানের ফলে।

মূর্খ পাঁচ ছেলে সূর্য রায়ের। তারা পিতার মৃত্যুর আগেই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তখনও অবিশ্যি কলকাতা শহরে অন্নসংস্থানের ব্যাপারটা এত কঠিন হয়ে ওঠেনি। তাই এটা ওটা করে তারা তাদের পেট চালাচ্ছিল! যে এক বিচিত্র ব্যাপার। পরস্পর থেকে সব আলাদা হয়ে গেলে কি হবে, মারামারি ঝগড়া খেয়োখেয়ির তবু বিরাম ছিল না কোনদিন।

সৌদামিনীর জামাই মন্মথকে তার পাপের ও কদাচারের মাশুল শোধ করতে হয়েছিল। জীবনের শেষ কটা বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে মন্মথকে।

আর বাপের পাপ থেকে একমাত্র পুত্র সুরথনারায়ণও নিষ্কৃতি পায়নি।

কারণ রায়বাড়ির নিঃশেষিত-প্রায় স্বর্ণভাণ্ডারে তখনো যা ক্ষুদকুড়া অবশিষ্ট ছিল, সৌদামিনীর দৌহিত্র—অত্যধিক প্রশ্রয় ও আদরে বখে-যাওয়া সুরথনারায়ণও পরম নিশ্চিন্তে সেই লালসার স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। ফলে সে যুগের যৌনব্যাধির আক্রমণ হতে সেও নিষ্কৃতি পায়নি।

সৌদামিনীর কন্যা সর্বাণীকে অবিশ্যি স্বামীর পঙ্গু অবস্থাটা দেখে যেতে হয়নি, কারণ তার পূর্বেই সে আত্মঘাতিনী হয়ে জ্বালা জুড়িয়েছিল।

কিন্তু নিষ্কৃতি পায়নি সৌদামিনী—সদু ঠাকরুন।

অশীতিপরা বৃদ্ধা রাধারাণী, পঙ্গু জামাই ও পৌত্র সুরথনারায়ণকে নিয়ে তার দিন কাটছিল।

এমন সময় একদিন অকস্মাৎ রাধারাণীর জীবন-প্রদীপটা নিভে গেল।

আশ্চর্য মৃত্যু রাধারাণীর।

একমাত্র আফিম ছাড়া কিছুই প্রায় খেতো না রাধারাণী। আর কিবা রাত্রি

কিবা দিন শেষের দুটো বৎসর রাধারাণী শয্যায় কখনও শোয়নি। সর্বক্ষণ বসে বসেই তার কাটতো শয্যায় সেই বিরাট পালঙ্কটার উপরে এবং সেই বসা অবস্থাতেই ঘুম নয়, ঝিমুতো ঐ আফিমের নেশায় বুঝি বুঁদ হয়ে। বেঁচে আছে না মরে গিয়েছে বোঝবার উপায় ছিল না।

কেবল মধ্যে মধ্যে আপন মনে বিড়বিড় করতো যখন, তখন বোঝা যেতো যে রাধারাণী বেঁচে আছে। কিন্তু সেও কি বাঁচা বা বেঁচে থাকা! সে তো মৃত্যুরই নামান্তর!

তাই একদিন প্রত্যুষে নিত্যকার মতো দুধের বাটি হাতে সৌদামিনী যখন সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকল, কত্তামা, তোমার দুধ এনেছি! এবং কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না, তখনো বুঝতে পারেনি সৌদামিনী যে রাধারাণীর মৃত্যু ঘটেছে—রাধারাণী আর নেই।

শেষ পর্যন্ত অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে রাধারাণীর গায়ে হাত দিতেই যেন চমকে ওঠে সৌদামিনী! বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা রাধারাণীর দেহটা।

কত্তামা! কত্তামা! বলে চেঁচিয়ে দেহটা নাড়া দিতেই মৃত্যুশীতল শক্ত কঠিন দেহটা দীর্ঘ দুই বৎসর ঠায় একই ভাবে বসে থাকবার পর শয্যার একপাশে সেই অবস্থাতেই গড়িয়ে পড়লো।

সৌদামিনীর চেঁচামেচিতে ছুটে এল পাশের ঘর থেকে সুরথনারায়ণ।

কি, কি হলো?

পূর্ববৎ চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শুধু সৌদামিনী বললে, নেই!

কি—কি নেই?

কত্তামা—কত্তামা আর নেই রে! কত্তামা আর নেই!

কে নিয়ে যাবে শ্মশানে দাহ করতে মৃতদেহ? সবাই যে যার কাজ আছে বলে সরে পড়লো! সুরথনারায়ণই তখন পাড়া থেকে লোকজন ডেকে নিয়ে দ্বিপ্রহরের দিকে মৃতদেহ ঘর থেকে বের করলে।

হাতের গিঁটগুলো রাধারাণীর এমনভাবে শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে সেই উপবিষ্ট অবস্থায়ই দেহটাকে শেষ পর্যন্ত চিতায় দাহ করতে হয়েছিল।

বিভূতি শুধিয়েছিল, তারপর?

তারপর আর কি! সব শেষ হয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

আরও দিন পনেরো পরে কলেজের কমনরুমে বিভূতির সঙ্গে দেখা হল সুস্মিতার।

বিভু!

বিভূতি বেঞ্চটার এক পাশে একটা মোটা খাতা হাতে নিঃশব্দে বসেছিল। সুস্মিতার ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকায়, কে! ও সুস্মিতা!

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বল তো? সত্যিই তুমি পরীক্ষা দেবে না

নাকি ?

না।

না মানে ?

বিভূতি আর সুস্মিতার কথার কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেঞ্চ থেকে উঠে সোজা কমনরুম থেকে বের হয়ে গেল। সুস্মিতা রীতিমত যেন বিস্মিত হয়েই বিভূতির গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বিভূতির আকস্মিক ঐ ব্যবহারটা যেন আদৌ বুঝে উঠতে পারে না সে। এবং বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে কমনরুমের বাইরে এসে লবিতে বা আশেপাশে কোথাও বিভূতির সন্ধান পায় না।

সত্যি, বিভূতি যেন কেমন হয়ে গিয়েছে কিছুদিন যাবৎ! বিশেষ করে যেদিন থেকে সুস্মিতা বিভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছে সেই দিন থেকেই!

কিন্তু কেন? বিভূতি কি সত্যিই বুঝতে পারে না কিছু? নাকি বুঝতে পেরেই ইদানীং তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ?

চোখের কোল দুটি সুস্মিতার সহসা যেন উদ্‌গত অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি কোনমতে উদ্‌গত সেই অশ্রুকে চাপতে চাপতে সুস্মিতা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় এবং আরো দুটো ক্লাস থাকা সত্ত্বেও সুস্মিতা সোজা গিয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভার মহাবীরকে বলে, মহাবীর কোঠি চল!

হনহন করে নীচে নেমে এসে বিভূতি একেবারে গেট দিয়ে বের হয়ে ট্রাম-রাস্তায় পড়লো। কয়েকদিন থেকেই চোখ দুটো যেন কেমন টনটন করছে। কেমন যেন সব কিছু ঝাপসা ঝাপসা মনে হয়।

হালিশহরের পরমানন্দ ডাক্তার বলেছেন বিভূতিকে, যৌন-ব্যাধির বিষ নাকি বংশানুক্রমে রক্তে রক্তে সংক্রামিত হয়। এবং সে বিষের ক্রিয়ায় কখনও মানুষকে চিরতরে দৃষ্টিহীন অন্ধ, কখনও পঙ্গু, কখনও একেবারে উন্মাদ—ঘোর উন্মাদ করে দিতে পারে। সুমন্তনারায়ণেরই রক্তের যতই ক্ষীণতম ধারা হোক বংশানুক্রমিক ভাবে তারও দেহে যে আছে সে কথা তো অস্বীকার করতে পারে না বিভূতি। পরমানন্দ ডাক্তার বলেছেন, সেটা হওয়া নাকি খুবই স্বাভাবিক। গত কিছুদিন ধরে ঐ চিন্তাটাই অদৃশ্য একটা কীটের মত তার দেহ ও মনকে কুরে কুরে চলেছে। আশ্চর্য, এ কথাটা তার একবারও মনে হয়নি কেন ?

পা দুটোও মধ্যে মধ্যে কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে চায় আজকাল, বেশ বুঝতে পারছে বিভূতি। মাথাটার মধ্যেও কেমন যেন ঝিমঝিম করে, থেকে থেকে সব যেন গোলমাল হয়ে যেতে চায়।

এ কি তবে মস্তিষ্ক-বিকৃতি উন্মাদের পূর্ব লক্ষণ ? না, আবার একজন বড় ডাক্তারকে দেখাতে হবে। খুব বড় নামকরা ডাক্তার। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। সামনের একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে প্রবেশ করে বিভূতি।

টেলিফোন গাইডটা একবার দেখতে পারি ?

কম্পাউণ্ডার বিভূতির মুখের দিকে তাকিয়ে পাশ থেকে মোটা টেলিফোন গাইডটা তুলে ঠেলে দেয় কাউণ্টারের উপরে বিভূতির দিকে। পাতা উল্টে উল্টে ডাক্তারের নাম খোঁজ করে বিভূতি। দেখতে দেখতে একজন বড় ডাক্তারের নাম-ঠিকানা টুকে নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে বিভূতি।

লাউডন স্ট্রীটে ডাক্তারের বাড়ি। নাম নীলরতন সরকার।

ডাক্তার সরকার অতীব যত্নসহকারে বিভূতিকে নানা প্রশ্ন করে তার ইতিহাস শুনে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন, কোন রোগের চিহ্নই তো পাচ্ছি না আপনার মধ্যে !

পাচ্ছেন না ?

না।

কিন্তু রক্তের মধ্যে তো সাংঘাতিক কোন দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ থাকতে পারে ডাঃ সরকার !

না, তা আপনার রক্তে নেই বলেই আমার ধারণা।

তাহলেও রক্তটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হতো না ?

আপনার মনের শান্তির জন্য করে দেখতে পারেন। তবে আমার মনে হয় কোন প্রয়োজন নেই।

আছে ডাক্তার সরকার, নিশ্চয়ই আছে। বংশের কেউ রেহাই পায়নি, আর আমি কখনও পেতে পারি ! আমার বাবার দেহও যে ঐ বিষই ক্ষয় করেছিল স্বচক্ষে আমার দেখা ! তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ বুঝতে পারছি।

বেশ একটা ঠিকানা দিচ্ছি, এখানে গিয়ে রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে আসুন।

ডাঃ সরকার একটা ঠিকানা কাগজে লিখে বিভূতিকে দিলেন।

ঠিকানাটা নিয়ে ফি দিয়ে বিভূতি ডাঃ সরকারের চেম্বার থেকে বের হয়ে গেল। ডাঃ সরকার যাই বলুন, বিভূতির দেহে ঐ বিষাক্ত ব্যাধির বীজ আছেই।

চিন্তান্বিত আচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলে তাকালো একবার বিভূতি চারপাশে। আলোকোজ্জ্বল মহানগরী। হাস্যেলাস্যে যেন প্রাণ-প্রাচুর্যে উপচে পড়ছে। অস্তিত ভাগীরথী তীরের কলকাতা নয়, নয়া কলকাতা শহর। অগণিত মানুষ যে যার পথে চলে যাচ্ছে। ট্রাম, গাড়ি, রিক্সা কত কি।

কেউ কি ওদের মধ্যে তার মত অভিশপ্ত, তার মত দুঃখী !

কিন্তু কেন, কেন সে অভিশপ্ত ? কেন মুকুলেই তার জীবনটা এমনি করে বিষের ক্রিয়ায় শুকিয়ে যেতে বসেছে ? কেন এই পৃথিবীর এই কোটি কোটি সুখী মানুষের মত সুখী হতে পারলো না সে ? কেন তার ভালবাসা পাবার বা দেবার অধিকার নেই ? কার অপরাধে, কার পাপে ? চারিদিকে যখন জীবনের পাত্র সুধারসে উথলে উঠছে, মরুতৃষ্ণার হাহাকারে তার সমস্ত বুকটা কেন তখন শূন্য হয়ে থাকবে ?

মনে পড়ে জ্ঞান হওয়া অবধি তার জন্মদাতা পিতার যৌনব্যাধিতে পঙ্গু অসহায় দৃশ্যটা ! সর্বাঙ্গে সেই দুর্গন্ধময় ঘা। ঘরের বাতাসটা দুর্গন্ধে যেন নরকের মতই মনে হতো।

তাছাড়া পরমানন্দ ডাক্তার—সেই বা মিথ্যে বলবে কেন ? তার সঙ্গে তো তার শত্রুতা নেই !

রক্ত—হ্যাঁ, রক্তটা তার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে। সুমন্তনারায়ণের বিষকে তার দেহ-রক্ত থেকে মন্থন করে সন্ধান করতেই হবে তা কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা ! সে যুগের ধনীর ঘরে ঘরে সেই ফিরিঙ্গী ব্যাধি !

কিন্তু সত্যিই যদি সে বিষ তার রক্তে থেকে থাকে ? তারপর ? তারপর কি ? আর চিন্তা করতে পারে না বিভূতি। সমস্ত চিন্তা এলোমেলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

হাতের শিরা থেকে দশ সি. সি. রক্ত টেনে নিলেন একটা টেস্ট্‌টিউবে প্যাথলজিস্ট। 'ভাসারমান' ও 'খান' টেস্ট করতে হবে।

রক্ত-পরীক্ষার ফিয়ের টাকা গুনে দিয়ে বিভূতি ল্যাবরেটারী থেকে বের হয়ে এলো।

দিন তিনেক বাদেই পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে।

উঃ, চোখ দুটো কি বিশ্রী টনটন করছে ! বিভূতি ক্লান্ত শিথিল পদে স্টেশনের দিকে হেঁটে চলে। রাত্রি সাড়ে আটটার ট্রেনটা ধরতে হবে।

সুস্মিতা !

সুস্মিতাকে স্পষ্ট খোলাখুলি ভাবে সব কথা আজ বলে দিলেই পারতো বিভূতি। বললেই পারতো, আমার কাছে এসো না সুস্মিতা, ভয়াবহ রোগের বীজ আমার দেহ-রক্তে।

না, না—ছিঃ ছিঃ, ভাগ্যিস সে কথাটা বলেনি সুস্মিতাকে !

কি ভাবতো তাহলে সুস্মিতা ? ঘৃণায় হয়তো মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে চলে যেতো। মনে মনে ভাবতো, এই তাহলে বিভূতির সত্যকারের পরিচয় ! এমনি করেই অতীতের এক ধনৈশ্বর্যের অভিশাপের গোপন বীজ সে তার দেহ-রক্তে তার বর্তমান সভ্যতা, কৃষ্টি ও রুচির আড়ালে বহন করে চলেছে !

তার চাইতে এই—এই ভাল হল।

ভাগ্যে সে পরমানন্দ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল তার ক্রমশ দৃষ্টিহীনতা ও মস্তিষ্কের দুর্বলতার জন্য পরামর্শ নিতে ! নাহলে তো এসব কোন দিনই ধরা পড়তো না ! ধরা পড়বে কি, দৃষ্টিশক্তি যে তার ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে আসছে, কোন কিছু স্থিরভাবে চিন্তা করতে গেলেই সব গুলিয়ে যায়, এসব তো সে আগে তেমন করে বুঝতে পারেনি !

দীর্ঘ দুই মাস ধরে রায়-বংশের অভিশপ্ত ইতিকথা লিখতে লিখতেই তো সে সর্বপ্রথম ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

ডাঃ সরকার অবশ্যি বললেন, এ তার দীর্ঘ দু মাস ধরে একটানা পরিশ্রম

ও দিবারাত্র দীর্ঘদিন ধরে সুমন্তনারায়ণ ও তার বংশাবলীর ইতিহাস চিন্তা করে করেই তার এই ক্ষণিক ডিপ্রেসন এসেছে। সেই থেকেই এই 'ইলিউসনে'র সৃষ্টি। এ কিছুই নয়। সময়ে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস করে না বিভূতি। ডাঃ সরকার যা বলেছেন তা নয়, এ সেই সুমন্তনারায়ণের হৈমবতী ও সৌদামিনীর রক্তের বিষের ক্রিয়া। সেই বিষই শরীরে আজ তার ফুটে বের হচ্ছে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

গৃহে পৌঁছতেই অধিক রাত্রে দরজার গোড়াতেই অবনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিভূতির।

এই যে বিভূতি, তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, বিকালের দিকে বুড়ী হঠাৎ মারা গিয়েছে—

বুড়ী মানে সৌদামিনী ঠাকরুন।

সংবাদটা শুনে বিভূতি কেমন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

কয়েকদিন থেকেই সৌদামিনী ঠাকরুনের শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল—রক্ত-আমাশয়ের মত হয়েছিল।

আর তো দেরি করা যায় না, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, লোক-জনও ডাকতে পাঠিয়েছি, এবারে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়তে হয়!

আঙ্গিনার তুলসী-মঞ্চের সামনেই সৌদামিনীর মৃতদেহটা শুইয়ে রাখা হয়েছিল। নিঃশব্দে বিভূতি এসে মৃতদেহের শিয়রে দাঁড়ালো।

মৃতের শিয়রে একটা হ্যারিকেন বাতি জ্বলছে টিম টিম করে। এবং মৃতদেহের অনতিদূরে কে একটি যুবক কোমরে গামছা বাঁধা বসে আছে। শ্মশানযাত্রী কেউ হবে।

কেউ কাঁদছে না। আর কেউ কাঁদবেই বা কেন? সৌদামিনী ঠাকরুনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কি? সুমন্তনারায়ণের দৌহিত্রী, রাধারাণীর দৌহিত্রী, হৈমবতীর একমাত্র কন্যা!

অবনীদের সে কে? কি সম্পর্ক তাদের সঙ্গে?

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে চিতায তুলতে তুলতে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর হয়ে গেল। গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশান। মণে মণে ঘি বা ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ নেই। সাধারণ, অতি সাধারণ সৎকার।

উঃ, অনেক বছর বেঁচে ছিল বুড়ী। অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে।

তীরভূমি যেখানে ঢালু হয়ে একেবারে গঙ্গার জলে মিশেছে, সেই ঢালু জায়গায় একাকী বসে ছিল বিভূতি।

ভাগীরথী আজও তেমনি বয়ে চলেছে। ঘোলাটে জলে বোধ হয় জোয়ারের টান লেগেছে, পায়ের কাছে ঢেউ এসে ছল-ছলাৎ শব্দ তুলছে। চিতাগ্নির লাল একটা আভা গঙ্গার ঘোলাটে জলে এসে পড়েছে।

শেষ হয়ে গেল। সুমন্তনারায়ণের রক্তের শেষ চিহ্নটিও ধরণীর বুক থেকে মুছে গেল আজ।

এখন শুধু ক্ষীণ হতেও ক্ষীণতম সামান্য একটু বাকী—এই বিভূতি, বিভূতির সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

ব্যস্। তারপর? তারপর কি?

॥ ৬ ॥

রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টটা হাতে করে বিভূতি বের হয়ে এলো ল্যাবরেটারী থেকে।

খান টেস্ট নেগেটিভ হলেও ভাসারমান টেস্ট পজিটিভ। তিনের চার পজিটিভ।

আচ্ছন্নের মতই বিভূতি মেসে তার ঘরে ফিরে এলো। সৌদামিনীর মৃত্যুর পরই সে হালিশহর থেকে চলে এসে মেসের ঐ ঘরটি নিয়েছিল। অবনীর কোন অনুরোধেই সে কান দেয়নি। অবনীর গৃহ থেকে না হয় সে এই কলকাতার মেসে চলে এসেছে, কিন্তু এইবারে—এইবারে সে কোথায় যাবে?

উঃ, মাথাটাব মধ্যে কি একটা অসহ্য যন্ত্রণা! কি অসহ্য যন্ত্রণায় চোখ দুটো টনটন কবছে। না, না—সত্যিই কি বিভূতি উন্মাদ হয়ে যাবে? কে! সুস্মিতা! না, না—কে, কে? কে ঐ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিরাট পুরুষ!

সুমন্তনারায়ণ, তাঁর পাশেই কন্দর্পনারারণ, পাশে রাধারাণী, রূপবতী, কঙ্কাবতী, সৌদামিনী, রাজেশ্বরী, নির্মলা।…কেন, কেন তোমরা এসেছো, কি চাও?

আর—আর তাদের পাশে কে, কে ঐ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ? করালীশঙ্কর? হ্যাঁ, হ্যাঁ—করালীশঙ্কর!

না, না—যাও, যাও তোমরা, এখান থেকে যাও যাও—আমার দৃষ্টির সামনে থেকে যাও! চিৎকার করে ওঠে বিভূতি।

তারপরই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

সুস্মিতা আর অবনীবাবুই চেষ্টা করে বিভূতিকে রাঁচির মেণ্টাল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল।

প্রথমটায় ঘোর উন্মাদের অবস্থা ছিল বিভূতির। ক্রমশ সেটা চলে গেল বটে, কিন্তু মনের সেই দুস্বঃপ্নজনিত ব্যাধিটা আর গেল না।

কর্নেল সেন অবিশ্যি বলেন, বিভূতি শেষ পর্যন্ত সুস্থ হতেও পারে। কিন্তু সুস্মিতা বুঝি আর সে কথা বিশ্বাস করে না।

দেখতে দেখতে তো দীর্ঘ আট মাস হয়ে গেল, আর কবে বিভূতি সুস্থ হবে?

কবে?

ঘট ঘট ঘটাং, ঘট ঘট ঘটাং—ট্রেনটা ছুটে চলেছে।

—শেষ—